**KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA**
**18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009**

| | |
|---|---|
| Record No : KLMLGK 2007 | Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩ |
| Collection : KLMLGK | Publisher মীর ওসমান |
| Title চতুরঙ্গ | Size 7"x 9.5" 17.78x24.13 c.m. |
| Vol. & Number : ৫৮/১<br>৫৮/2<br>৫৮/৩ | Year of Publication বৈশাখ ১৪০৬<br>ভাদ্র ১৪০৬<br>পৌষ ১৪০৬ |
| | Condition : Brittle Good ✓ |
| Editor আবদুর রউফ | Remarks : |

C.D. Roll No : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

# চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫৬ সংখ্যা ২ ভাদ্র ১৪০৩

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

রবীন্দ্রনাথ আর ইকবালের 'দুই আত্ম-র' আপাত সাদৃশ্য এবং 'বহুদূরবর্তিতা', নিয়ে শঙ্খ ঘোষের সন্দর্ভ 'আত্মশক্তির দুই কবি'।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তুলে সারা ভারতের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পন্থানির্দেশকারী প্রবন্ধ লিখেছেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ অমলকুমার মুখোপাধ্যায়।
বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বৃত্তিশিক্ষার ভালমন্দ নিয়ে অধ্যাপক ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা।

ইতিহাসবিদ বিনয় চৌধুরীর ধারাবাহিক রচনা 'ঔপনিবেশিক পূর্বভারতে হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক'। অসমে জনবিন্যাস এবং জাতিসত্তার সংকট নিয়ে একটি তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধ লিখেছেন সঞ্জিত চক্রবর্তী।

সাহিত্যে একই রচনার ভিন্ন ভিন্ন পাঠের মধ্যে সঠিক পাঠনির্ণয়ের সমস্যা নিয়ে ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতিমান অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরীর আলোচনা।

তিনখানি বিশেষ গ্রন্থকে কেন্দ্র করে তিনটি সমালোচনা নিবন্ধ : 'ইতিহাসের প্রেক্ষিতে নায়কের সন্ধান', 'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম' এবং 'প্রসঙ্গ হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক'।

শিবনারায়ণ রায়ের সাম্প্রতিক একটি বাংলা বই নিয়ে অধ্যাপক সৌরীন ভট্টাচার্যের আলোচনা 'বুদ্ধিচর্চার দুই মহল'। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা করেছেন 'অন্য পাকিস্তানের কণ্ঠস্বর'।

আধুনিক বাংলা নাটকের হাল-হকিকত নিয়ে অশোক মুখোপাধ্যায়, উৎপল ঝা প্রমুখের আকর্ষণীয় আলোচনা।

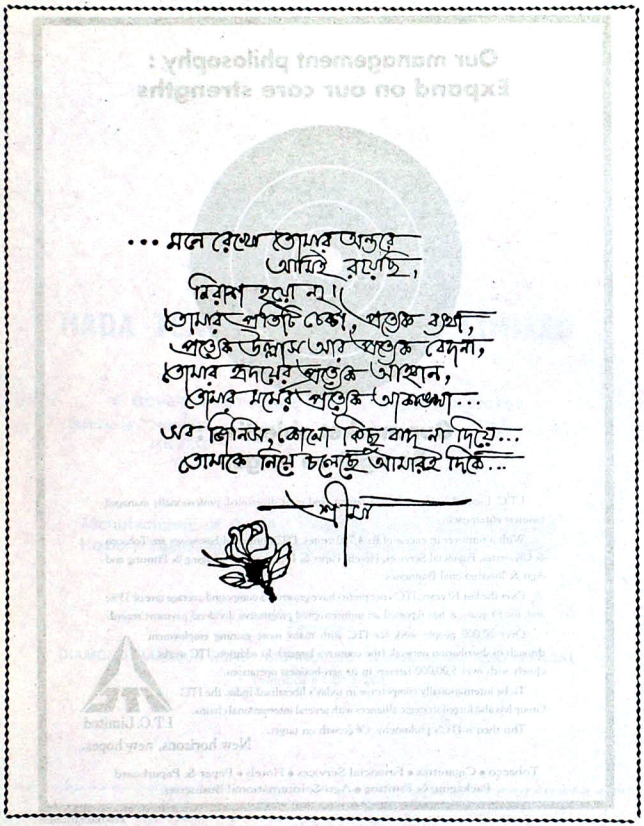

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক কথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

শ্রীমা



রেজি: নং
S 83128
95-96

বর্ষ ৫৬ সংখ্যা ২
ভাদ্র ১৪০৩


| | | |
|---|---|---|
| ■ আত্মশক্তির দুই কবি | শঙ্খ ঘোষ | ১১৭ |
| ■ কিছু প্রজাপতি | নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | ১২৬ |
| শিল্পসম্মত | সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত | ১২৭ |
| অগ্নি তোমার হিরণ্যকেশ... | আনন্দ ঘোষ হাজরা | ১২৮ |
| ধ্বংস | কালীকৃষ্ণ গুহ | ১২৯ |
| স্মৃতি, আত্মস্মৃতি | পরিমল চক্রবর্তী | ১৩০ |
| এবং তুমি | শান্তিকুমার ঘোষ | ১৩১ |
| রক্তাভ বিকেলে | দেবী রায় | ১৩২ |
| মনখারাপের গাছ | মতি মুখোপাধ্যায় | ১৩৩ |
| ■ শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা ও পশ্চিমবঙ্গ | অমলকুমার মুখোপাধ্যায় | ১৩৪ |
| বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বৃত্তিশিক্ষা: কিছু ভাবনা | ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | ১৪৩ |
| ■ শঙ্খবালা | কিন্নর রায় | ১৫০ |
| ■ ঔপনিবেশিক পূর্বভারতে হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক | বিনয় চৌধুরী | ১৫৬ |
| অসমে জনবিন্যাস ও জাতিসত্তার সঙ্কট—একটি পর্যালোচনা | সজ্জিত চক্রবর্তী | ১৬৬ |
| ■ থিয়েটারের জনপ্রিয়তা: দর্শকরুচির রূপান্তর অশোক মুখোপাধ্যায় ও উৎপল ঝা-এর সাক্ষাৎকার | মেঘ মুখোপাধ্যায় | ১৭২ |
| ■ পাঠনির্ণয় | সুকান্ত চৌধুরী | ১৮৫ |
| ■ নায়কের সন্ধান—ইতিহাসের প্রেক্ষিতে | শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় | ১৯৪ |
| বিষয়: 'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম' | অজিত দাস | ২০০ |
| প্রসঙ্গ: 'হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ভাল করার উপায়' | শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ | ২০৪ |
| গ্রন্থসমালোচনা | | ২১৪ |
| সৌরীন ভট্টাচার্য ● সুরজিৎ দাশগুপ্ত ● অশোকেন্দু সেনগুপ্ত ● শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ● ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় | | |
| ■ কবি হরপ্রসাদ সম্পর্কে কিছু কথা | কান্তি গুপ্ত | ২৩১ |
| ■ স্মরণে বলাইকৃষ্ণ রায় | আবদুর রউফ | ২৩৫ |


শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক গুপ্তপ্রেস কল-৯ থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩ থেকে প্রকাশিত
অফিস: ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩ দূরভাষ: ২৭ ৬৩২৭
শিল্প পরিকল্পনা: রণেন আয়ন দত্ত সম্পাদক: আবদুর রউফ

ভারতীয় যোগদর্শনে ঈশ্বরের ধারণা করা হয়েছে 'অখিলাবরণভঙ্গ' রূপে— যিনি সব বাধা দূর করে দেন, আবরণ ভেঙ্গে দেন।

বাঙালি মানস দেবীদুর্গার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের সমগ্ররূপ কল্পনা করেছে। একদিকে তিনি জগন্মাতা, অন্যদিকে তিনি কন্যা। একদিকে তিনি কল্যাণরূপিণী, অন্যদিকে তাঁর সংহার মূর্তি।

শরতের নির্মল প্রভাতে বাঙালি তাই অকুণ্ঠচিত্তে তাকে আহ্বান জানাতে পেরেছে!

ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারহেতু-
র্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

**কে. সি. দাশ প্রাইভেট লিমিটেড**

আবিষ্কারক : রসোমালাই এবং চিনি বর্জিত মিষ্টান্ন

**কলিকাতা** ★ **ব্যাঙ্গালোর**

(১) ১১, এসপ্লানেড ইস্ট
ফোন-২৪৮ ৫৯২০

৩, সেন্ট মার্কস রোড
ফোন : ৫৫৮ ৫৬৭২
৫৫৮ ৭০০৩

(২) ২০ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ)
(ঢাকুরিয়া বাসস্টপ)
কলিকাতা-৭০০ ০৩১
ফোন : ৪৭৩-২৬৮৮

# আত্মশক্তির দুই কবি

শঙ্খ ঘোষ

ইকবালের লেখা টুকরো একটা কবিতার বাংলা হতে পারে এ-রকম : 'তোমার হাতে তুমি গড়েছ রাত, ছেলেছি আলো আমি তাতে / দিয়েছ মাটি শুধু, তা দিয়ে আমি পেয়ালা গড়েছি এ হাতে। / দিয়েছ তুমি শুধু পাহাড় বন, দিয়েছ শুধু মরুভূমি / বাগিচা করে তাকে গড়েছি ফুলে, গোলাপ হাতে পেলে তুমি।'

শুনে, আমাদের মনে খুবই পরিচিত একটি লেখার অনুরণন জেগে ওঠা সম্ভব। 'বলাকা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান / তার বেশি করে না সে দান / আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান, / আমি গাই গান।' কিংবা 'তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার / ...দিয়েছ আমার 'পরে ভার / তোমার স্বর্গটি রচিবার।'

অসম্পূর্ণ সৃষ্টিকে তার নিজেরই সাধনায় পূর্ণতর করে তোলে মানুষ, বিশ্বাসের এই জোর থেকে এ-ধরণের কথা কেউ লিখতে পারেন, লিখেওছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বা ইকবাল। কিন্তু ভারতবর্ষের দুই প্রান্তের প্রায়-সমকালীন এই দুই কবি — কচিৎ-কখনো এভাবে একইরকম কথা বলছিলেন যাঁরা — পরস্পরকে তাঁরা লক্ষ করছিলেন ঠিক কতটা? ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' অনুবাদের পর আর ১৯২০ সালে ইকবালের 'আসরার-এ-খুদি'র নিকলসন-কৃত ইংরেজি অনুবাদের পর, এই দুই-কবিরই তৈরি হয়েছিল এক আন্তর্জাতিক ভূমিকা। দেশীয় রাজনীতির জগতেও, অন্তত ১৯৩০ থেকে ৩৮ সালের মধ্যে, একই ধরণের সংকটসমস্যা নিয়ে কথা বলতে হচ্ছিল দুজনকেই। তখনও কি পরস্পরকে ঠিকমতো জানতে পারছিলেন তাঁরা?

ইকবাল বিষয়ে কিছুই প্রায় বলেননি কখনো রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৮ সালের ৯ জানুয়ারি ইকবাল-দিবস পালনের একটা আয়োজন চলছিল বলে ডিসেম্বর মাসেই রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত একটা শুভেচ্ছাবার্তা ছাপা হয়েছিল বিভিন্ন পত্রিকায়, তাতে লিখেছিলেন তিনি : 'উর্দুভাষা না জানায় তাঁহার কবিতার মাধুর্য উপভোগে রঞ্চিত বলিয়া আমি সর্বদাই দুঃখানুভব করিয়া থাকি' (যুগান্তর ১৮ ডিসেম্বর ১৯৩৭)। জানি না ঠিক সেই কারণেই কি না, জানুয়ারিতেই লাহোর থেকে অমিয় চক্রবর্তী লিখছিলেন তাঁকে : 'কবি ইকবালের একটি বই আপনাকে পাঠালাম।' ইংরেজিতে ততদিনে ছাপা হয়ে গেছে তাঁর কোনো কোনো লেখা, অনুমান করা যায় তেমনই কোনো বই তাঁকে পাঠিয়েছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, আর এ-বিষয়ে তাঁর নিজের বেশ কিছু ধারণা জানাবার পর হয়তো কোনো প্রতিক্রিয়াও আশা করছিলেন উলটো দিক থেকে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন না কিছু। কেবল, কয়েকমাস পরে, ইকবালের মৃত্যুতে আরেক সংক্ষিপ্ত বার্তায় জানান তিনি : 'India, whose place in the world is too narrow, can ill afford to miss a poet whose poetry has such universal value' । ডিসেম্বরে-বলা কথাটার থেকে অবশ্য বোঝা যায় যে তাঁর নিজস্ব কোনো উপলব্ধি থেকে বলছেন না এই universal value-র কথা, বলছেন অন্যের ধারণালব্ধ কোনো বিচার।

অন্যদিকে, ইকবালও কি তেমনকিছু ভাবছিলেন রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে? ১৯৩৫ সালে এই দুই কবির দেখা হবার একটা সম্ভাবনা হয়েছিল লাহোরে। কিন্তু হতে পারেনি, কেননা রবীন্দ্রনাথ আসছেন জেনে ইকবাল ছেড়ে গিয়েছিলেন সেই শহর, আর মুখে না কি বলেছিলেন : এক শহরে দুই কবি থাকতে পারে না। এ অবশ্য নিছক হালকা চালের মন্তব্য। এর চেয়ে গুরুতর কথা একবার বলেছিলেন ইকবাল, মৌখিক আলাপের সূত্রেই। বলেছিলেন : রবীন্দ্রনাথ কবিতায় লেখেন ধ্যানের কথা, কিন্তু

ব্যক্তিজীবনে তিনি কর্মী। আর আমি কবিতায় লিখি কর্মশক্তির কথা, কিন্তু ব্যক্তিজীবনে আমি ধ্যানী।

কথাটার ভার আছে, কথাটা সাজানোয় মুনশিয়ানা আছে, তবে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্যতা নেই। বোঝা যায়, অন্য অনেক বিদেশী পাঠকের মতো, রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে ইকবালের ধারণাও ছিল খণ্ডিত, হয়তো-বা তা কেবল গীতাঞ্জলি বা *Sadhana*-কেন্দ্রিক। অবশ্য, শুধু বিদেশীই বা বলব কেন, তাঁর গোটা রচনাজগৎটা সামনে পড়ে থাকা সত্ত্বেও, বাঙালি পাঠকদের মধ্যেও অনেকে কেবল তাঁর ধ্যানটাকেই দেখেন, দেখেন শুধু গুরুমূর্তি। কিন্তু ইকবাল কি জানতেন, যে-আত্মশক্তির উদ্‌বোধনের কথা তাঁর সমস্ত কবিতার মূল সুর, রবীন্দ্রনাথেরও লেখার একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে তেমনই এক আত্মশক্তির ভাবনা? এমন নয় যে সর্বতোভাবে এক তাঁদের সেই ভাবনা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই দিকটাকে লক্ষ করলে ইকবাল হয়তো একথা বলতে পারতেন না যে তাঁর সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন শুধু ধ্যানেরই কথা।

আবার, ইকবালের ব্যক্তিজীবনকেও শুধু ধ্যানী বলে বিশেষিত করা মুশকিল। রবীন্দ্রনাথের তুলনায় অনেক বেশি ঈশ্বরাচ্ছন্ন তাঁর দৈনন্দিন, এ নিয়ে সংশয় নেই। তাঁর বিদেশজীবনের বান্ধবী আতিয়া ফৈজির বর্ণনা থেকে জানি, জার্মানিতে গবেষক হিসেবে জীবনযাপনের সময়ে কীভাবে তিনি স্তব্ধ আত্মস্থ থাকতেন মাঝে মাঝে, লোকে ঠাট্টা করবে ভেবে বিড়ম্বিত থাকতেন আতিয়া। সেই থেকে শুরু করে, তাঁর মৃত্যুত্তর মুখচ্ছবিতে যে ঠোঁটে লেগে ছিল এক চিলতে হাসি, সেই সবকিছুকেই মনে করা হয়েছে ধ্যানী বিশ্বাসীর লক্ষণ। কিন্তু সেই ধ্যানীও, ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক, নিজেকে যুক্ত করেছিলেন সঙ্ঘের সঙ্গে, সংগঠনের সঙ্গে; কখনো দিকনির্দেশ দিচ্ছিলেন সেই সংগঠনকে, আর গোটা একটা দেশের ভাগ্য পালটাবার কাজে কখনো-বা বেশ প্রত্যক্ষ ভূমিকাই নিতে হচ্ছিল তাঁকে। ব্যক্তিজীবনে তিনিও কি তাই কর্মীই নন শেষ পর্যন্ত?

বস্তুত, এই দুই-কবির ক্ষেত্রেই, তাঁদের অন্তর্জীবন আর বহির্জীবনের মধ্যে সাবলীল একটা সংযোগই আমরা দেখতে পাই। ধ্যান আর কর্মের একটা সামঞ্জস্য খোঁজে তাঁদের রচনা, তাঁদের জীবনেও থাকে তার প্রতিফলন। প্রভেদ যেটা ঘটে সেটা মাত্রার। প্রভেদ যেটা ঘটে সেটা স্বরূপের। দুজনেরই ক্ষেত্রে, অন্তর্জীবন আর বহির্জীবনের সেই ঐক্যসূত্রটাকে এক-শব্দে বলতে গেলে বলা যায় 'আত্মশক্তি'। যদিও, দুস্তর একটা দূরত্বও আছে এই দুই আত্মশক্তির বোধে, কিংবা বলা যায়, এই দুই আত্ম-র বোধে।

২.

১৯১৫ সালে ছাপা হয়েছিল ইকবালের কাব্যগ্রন্থ 'আসরার-এ-খুদি', আত্মবোধের গূঢ়কথা। টুকরো অনেক কবিতা এর আগে লিখেছেন তিনি, তবু বলা যায়, এই-ই হলো তাঁর সেই বই যার প্রবলতায় পাঠক অভিভূত হলো প্রথম, যার অভিঘাতে বলতে শুরু করল তারা 'Iqbal has come amongst us as a Messiah and had stirred the dead with life'। আর, এই বই থেকেই সূচিত হলো তাঁর খুদিতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব, যার বিকাশ চলবে ১৯৩২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'জাভেদনামা' পর্যন্ত।

কী বলতে চেয়েছিলেন ইকবাল তাঁর ওই আত্মতত্ত্বে?

প্রশ্ন তুলেছিলেন ইকবাল: গোটা একটা জাতির অধঃপতন বা ধ্বংস দেখা দেয় কখন? ঠিক তখনই, যখন সে ইহবিমুখ হয়। যখন সে মনে করে যে বস্তুজগৎ এতটাই মায়া যে তার থেকে নিষ্কৃতি নিয়ে পরম নির্বাণেই আছে মুক্তি, তখন সে দুর্বল হয়ে পড়ে, অন্য যে-কেউ এসে প্রভুত্ব করতে পারে তার উপর। প্লেটোর মায়াবাদ আদির পিথাগোরাসের ব্রহ্মবাদ বা সুফিদের আত্মবিলয়তত্ত্ব এইভাবে নষ্ট করে দিতে পারে একটা জাতিকে, একটা দেশকে। ইকবালের বিচারে, ওইসব জীবনদর্শনের সবক্ষেত্রই আছে একটা 'negation of self'। এর থেকেই আসে নিষ্ক্রিয়তা, আর নিষ্ক্রিয়তা থেকে ধ্বংস। *'The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam'* বক্তৃতাবলিতে লিখেছেন তিনি: 'Greek mysticism, Persian mysticism, Indian mysticism—all are signs of decline of these nations; the same is true of Islamic mysticism'। আর সেইজন্যে তাঁর বিবেচনায় 'Any philosophy or religious teaching that prevents the blossoming of the human personality is worthless'।

কাজেই ইকবালকে ভাবতে হলো এমন এক দর্শনের কথা, যেখানে এই 'human personality'র, এই মানবিক ব্যক্তিত্বের ফুটে উঠবার প্রশস্ত উপায় হতে পারে। জাতি তো তৈরি হয়ে ওঠে ব্যক্তিকে নিয়ে। বিশ্বজীবনের কোনো অর্থ নেই, যদি-না ব্যক্তিজীবন থাকে। ব্যক্তির আত্মকে ঠিকমতো গড়ে তোলা, এইটেই তবে প্রধানতম কাজ।

কীভাবে গড়ে উঠতে পারে সেই আত্ম? সেটা নির্ভর করে মানুষের আকাঙ্ক্ষার ওপর। নিজেকে নিবৃত্তির দিকে না নিয়ে গিয়ে আকাঙ্ক্ষার তীব্রতায় নিজেকে যদি বাড়িয়ে চলে মানুষ অবিরত কোনো হয়ে-ওঠার দিকে, আত্মপ্রকাশের একটা যথার্থ ভূমি পায় সে। এই তীব্রতায় তার সহায়ক হলো ভালোবাসা। আত্মকে শক্তি দেয় ভালোবাসা। তাকে দুর্বল করে ভিক্ষা।



এই শক্তির জন্য নিজেকে দীক্ষিত করে তুলতে গেলে— আসরার-এ-খুদির নবম সর্গে তিনি দেখাবেন— তিনটে স্তরের মধ্য দিয়ে এগোতে হবে তাকে। প্রথম, নিয়মের অনুবর্তিতা; দ্বিতীয়, আত্মশাসন; আর তৃতীয়, ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব। আসরার-এ-খুদির সতেরো বছর পরে, জাভেদনামার মধ্যে এই তিন স্তরের কথা বলা আছে একটু ভিন্ন ভাষায়, আর সেইটেকেই হয়তো বলা যায় তাঁর স্বচ্ছতর আর পরিণততর কল্পনার প্রকাশ। ঊর্ধ্বারণের পথপ্রদর্শক জালালুদ্দিন রুমিকে যখন জিজ্ঞেস করলেন কবি: 'কাকে বলি আছে? কী-বা নেই? / ভালো বলি মন্দ বলি, তার ঠিক মানে আছে কোনো?' রুমি তখন 'বললেন— আছে তা-ই আবির্ভূত হতে যে চেয়েছে

সত্তার আবেগ শুধু অবিরাম আত্মপ্রকাশন—
জীবন মানেই হলো আত্মবোধে নিজেকে সাজানো
নিজের সত্তার কাছে সত্য হতে চাওয়াই জীবন।
প্রথম আদির দিনে মিলেছিল সমস্ত যেখানে
নিজেরই সত্তার কাছে সত্য হতে চেয়েছিল তারা।
মৃত না জীবিত তুমি? না কি জীবন্মৃত হয়ে আছো?
সেকথা জানার জন্য তিন-সাক্ষ্য তোমার সাহায্য।
প্রথম সাক্ষ্যটি হলো আত্মসচেতন হয়ে ওঠা
নিজের আলোয় তুলে দেখে নেওয়া যথার্থ নিজেকে
এবং দ্বিতীয় সাক্ষ্য আমি ছাড়া অন্যের চেতনা
যেখানে নিজেকে দেখি অন্যের আলোর পাশে রেখে।
তৃতীয় সাক্ষ্যের নাম নিত্য চেতনা ঈশ্বরের
ঈশ্বরের আলো দিয়ে নিজেকে যেখানে দেখা যায়
সে-আলোর সামনে এসে যদি তুমি স্থির হতে পারো
তবে জেনো, আছো তুমি, বেঁচে আছো ঈশ্বরের প্রায়।
জীবন মানেই হলো সেই পরিণাম ছুঁতে চাওয়া
জীবন মানেই হলো নিরাবৃত পরমকে পাওয়া।

নিজের সামনে, অন্যের সামনে আর ঈশ্বরের সামনে নিজেকে প্রকাশ করা, নিজেকে প্রতিপন্ন করা— এরই মধ্যে আছে ইকবালের আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা। এরই বিকাশের মধ্য দিয়ে কেবলই এগিয়ে চলতে পারে মানুষ, তার সেই চলার বা বিকাশের যেন কোনো শেষ নেই। না, শেষ আছে, বিকাশের চূড়ান্ত মুহূর্তে সে হয়ে উঠতে পারে প্রায় ঈশ্বরোপম, অসীম শক্তিময়, ইকবালের ভাষায় তখন সে হয়ে ওঠে মর্দ-এ-মোমিন বা মর্দ-এ-কামিল।

জার্মান দেশে দর্শনচর্চার সময়ে বের্গসঁ আর নীটশে তাঁর বিশেষ অভিনিবেশের বিষয় হয়েছিলেন বলে, প্রায়ই এই দার্শনিকদের কথা বলতেন এবং, এমনকী এঁদের নিয়ে পরে কবিতাও লিখেছিলেন বলে ইকবালের এই মর্দ-এ-মোমিন ধারণার মধ্যে নীটশের Superman-কে দেখতে পেয়েছেন অনেকে। ইকবাল অবশ্য মানতে চাননি সেটা। নীটশেকে জানবার আগেই ১৯০২ সালে প্রকাশিত এক ইংরেজি প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর Perfect Man-এর ধারণা, ইকবাল মনে করিয়ে দেন আমাদের। এই হয়তো হতে পারে যে নীটশের লেখা তাঁর ভাবনাকে আরো জোর দিয়েছিল। কিন্তু Superman থেকেই Perfect Man-এর সৃষ্টি হোক বা না হোক, ইকবাল বুঝতে পারছিলেন যে আসরার-এ-খুদির আত্মতত্ত্বে একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে, থেকে যাচ্ছে একটা বিপদেরও সম্ভাবনা। ব্যক্তির এই বিকাশের ফলে আত্মশক্তিতে গরীয়ান ব্যক্তি তো হয়ে উঠতে পারে স্বেচ্ছাচারীও? নিয়মের অনুবর্তিতা আর ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্বর কথা বলা হয়েছিল বটে, কিন্তু একটা জাতিগঠনের পক্ষে সেইটুকুই কি যথেষ্ট?

যথেষ্ট যে নয়, সেটা বলবার জন্যই তিন বছরের মধ্যে তাঁর পরবর্তী বই হলো 'রুমুজ-এ-বেখুদি'। খুদি আর বেখুদি, আত্ম আর নৈরাত্ম্য, এই দুই নিয়ে তৈরি হতে পারল ইকবালের আত্মশক্তি। বেখুদির মধ্যে তিনি দেখান ব্যক্তি কীভাবে আত্মবিসর্জন করে মিলে যায় সঙ্ঘে, সঙ্ঘ কীভাবে সাহায্য করে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে।

আর এই সমস্ত-বিশ্লেষণেই মূল কথা হলো, ইহলোককে পরম পরিণাম বলে না জানলেও ইহলোকের উপর নির্ভর করা, বাস্তব জীবনকে হাতের মুঠোয় ধরা। আর তারই জন্য দরকার অবিরাম কর্মৈষণার, অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে চলবার বিশ্বাস এবং শক্তি: 'কী তার আনন্দ? হয়ে-ওঠার আনন্দ, শুধু এই / এই তার অবস্থান, এই তার সত্তাপরিচয়।'

ব্যক্তির কর্মশক্তি মিলেই জাতির কর্মশক্তি। আর সেই শক্তিতে সম্পন্ন কোনো জাতি কখনো অধঃপতিত হতে পারে না। আসরার-এ-খুদির একটা সর্গে বাঘ আর ভেড়ার এক গল্প শুনিয়েছেন ইকবাল। বাঘের শাসনে অতিষ্ঠ ভেড়ার দলের মুক্তির একটা উপায় ঠাওরান প্রবীণ এক ভেড়া। সে প্রচার করতে শুরু করল জ্ঞানের মহিমা, যে-জ্ঞানের মানে হলো নিজেকে ভুলে থাকা, চোখকান বন্ধ করে ধ্যান করা আর এইটে বলা যে চোখে দেখা এই পৃথিবীটা কিছুই নয়। এর নাম দেওয়া হলো নৈতিক শিক্ষা। সে-শিক্ষায় অনুপ্রাণিত বাঘেদের তখন এমন দশা হলো যে ওই নৈতিকতার আওতায় একেবারে নিস্তেজ হয়ে এল তারা। শাসন করত যারা, তারাই এবার হয়ে গেল শাসিত।

গল্পের তাৎপর্য খুব সরল। এইরকমই ভুল নৈতিকতায় আমাদের আচ্ছন্ন করেছেন অনেকে, আর এইভাবেই একটা হীন জাতিতে অবসিত হয়েছি আমরা। প্লেটো ছিলেন সেইরকম ভুল শিক্ষক, আসরার-এর গোটা এক সর্গ জুড়ে যাঁকে আক্রমণ

করেন ইকবাল, কেননা 'তিনি ছিলেন তন্দ্রাতুর, আনন্দ ছিল না তাঁর কাজে' 'তিনি পাখা মেলে দিয়েছিলেন আকাশের বিস্তারে / ফিরে এলেন না আর নীড়ে'। আসরার-এর প্রথম সংস্করণে হাফিজকেও তিনি বলেছিলেন মেষতুল্য। প্রতি-আক্রমণের ফলে পরে যদিও বর্জন করেছিলেন সেটা, কিন্তু তবু বলতে ছাড়েননি এই কথা যে 'সতর্ক থাকো ওই মাতালটির বিষয়ে, মৃত্যুর বিষে ভরে আছে ওর পাত্র।' এঁদেরই প্রভাবে জীবনশক্তি বা আত্মশক্তি হারিয়েছে আমাদের জাতি, আর

আত্মশক্তিমন্ত্র তারা হারিয়েছে বলে
নিজদেশে পরবাসী তারা কালে কালে
তাদেরই বেতন আজ অন্যদের হাতে
তাদেরই নদীর মাছ অন্যদের জালে।

ইকবালের কবিতা কেবলই এই জাল খুলবার আবেগ। এই আবেগে, তাঁর সামনে আদর্শ হয়ে এসে টিপু যেন বলেন তাঁকে স্বর্গলোকে, জাভেদনামায়:

আমি আর তুমি, আমরা জীবননদীর নানা ঢেউ
প্রতিমুহূর্তেই বিশ্ব পরিবর্তমান দিকে দিকে
জীবন, সে অবিরাম আবর্তনে আবর্তনে ধায়
কেননা সে খুঁজে ফেরে কেবলই নতুন পৃথিবীকে।
এই প্রবাহই হলো জীবনের টানা ও পোড়েন
এই প্রবাহেরই থেকে সৃষ্টির আনন্দ ওঠে ভেসে
পথিকের মতো সব রাজপথও চলেছে কেবলই
স্থিরও যাকে মনে হয়, ভিতরে ভিতরে চলেছে সে।

এই চলমানতার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার আহ্বান জানান ইকবালের টিপু:

জ্বালাও পাহাড়পাখি জ্বালাও বাগান মরুভূমি
জ্বালাও সাগরতল মাছেরা যেখানে ভাসমান
পাঁজরের নিচে যদি থাকে কোনো শায়কের তেজ
বাজপাখি হয়ে বাঁচো বাজপাখি হয়ে দাও প্রাণ।
অমরতা? সে তো আছে জীবনেরই যথার্থ প্রসারে—
শুধু কি দীর্ঘায়ুলাভে ঈশ্বরের দিকে চেয়ে আছি?
কাকে বলে ধর্ম, নীতি, কাকে বলে জীবনের বিধি?
শতজীবী মেষ নয়, মুহূর্তের সিংহ হয়ে বাঁচি।

৩.

শক্তিমান মানুষের একটা সাধারণ ধারণার কথা ১৯০২ সালে বললেও, এটা ঠিক যে আত্মশক্তির পূর্ণ কল্পনাটা ইকবালের মধ্যে গড়ে উঠছিল ১৯০৯ থেকে ১৫ সালের মধ্যে, প্রবাস থেকে ফিরে আসবার পরে। দর্শনচর্চার জন্য কেম্ব্রিজে আর মিউনিখে তিন বছর সময় কাটাবার পর ১৯০৮ সালে দেশে ফিরলেন যখন, তখন তিনি অনেকটা ভিন্ন মানুষ। ১৯০৪ সালে 'তরানা-ই-হিন্দি' রচনার সময়েই তিনি লিখেছিলেন 'তসবির-ই-দর্দ'এর মতো কবিতাও, অর্থাৎ এদেশকে 'সারে জাহাঁসে আচ্ছা' বলবার সময়েই মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি যে 'ন সমঝোগে তো মিৎ জাওগে অয়ি হিন্দুস্তাঁ হামারা': এখনো যদি না বোঝো, হে আমার ভারত, ক্ষয়ে যাবে তবে। তোমার ইতিহাস বলবে না আর-কোনো ইতিহাস; প্রকৃতির নিয়ম হলো এই: সেই মানুষকেই পছন্দ করেন ঈশ্বর, নিজেকে যে ছড়িয়ে দেয় কাজে।

বলেছিলেন এসব কথা, বলেছিলেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলবার কথা। কিন্তু তখনও তাঁর কাছে খুব স্পষ্ট ছিল না সেই অত্যাচারের সামগ্রিক পটভূমি। ইওরোপবাস যেন তাঁকে সেই স্পষ্টতা এনে দিল। ইওরোপীয় সভ্যতার মাঝখানে ঘনিষ্ঠভাবে থাকতে থাকতে, আর পুরোনো পারস্যের অধিবিদ্যা বিষয়ে পড়াশুনো করতে করতে তাঁর সামনে প্রখর একটা প্রতিতুলনা এসে দাঁড়াল। ইওরোপের জীবনাকাঙ্ক্ষা আর কর্মৈষণায় মুগ্ধ হলেন তিনি, কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি দেখলেন তার সাম্রাজ্যবাদ আর সর্বৈব ঐহিক টান। ঐহিকতার বিশেষ ওই ছাঁচটা যেন ঈশ্বরকে থাকে ভুলে, অস্বীকার করে তাঁকে। সাম্রাজ্যের বিস্তার আর অত্যাচারের প্রবলতা সত্ত্বেও (কিংবা সেইজন্যেই) তাঁর মনে হলো ওই সভ্যতা এসে দাঁড়িয়েছে এক ধ্বংসসীমায়। বিজ্ঞান আর কর্মৈষণা ছাড়া কিছুই আর আমাদের পাবার নেই তার কাছে। অথচ উপনিবেশের চাপে, আজও আমরা পড়ে আছি ভুল এক অনুকরণের মোহে:

প্রাচ্যকে ভুলিয়ে দেয় পশ্চিমের মোহানুকরণ;
তাকে তো বিচার করা এসব জাতির সমুচিত!
পশ্চিমের শক্তি তার বাঁশিবীণা থেকে তো আসেনি
অনাবৃত নারীদের নাচগানও নয় তার ভিত।
অথবা আনেনি তাকে পলাশকোমল মোহময়ী
নগ্ন পা বা ছাঁটাচুল—তারও থেকে আসেনি ক্ষমতা;
অধার্মিকতারও থেকে এমন দৃঢ়তা পায়নি সে
লাতিন অক্ষরও নয় তার মহিমার মূল কথা।
ক্ষমতা এসেছে তার বিজ্ঞান বা কারিগরি থেকে
ওই একই শিখা থেকে উজ্জ্বল হয়েছে দীপ প্রাণে
পোশাকের কাটছাঁটে প্রজ্ঞা এসে যাবে তা তো নয়
পাগড়ি কোনো বাধা নয় কারিগরি-বিজ্ঞানের ধ্যানে।

এসব জাভেদনামার লাইন। আসরার থেকে জাভেদনামা পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে ইকবাল দেখতে পাবেন বিশ্বযুদ্ধ, সমাজতন্ত্রের উত্থান, ফ্যাসিবাদ। ইওরোপীয় সভ্যতার সম্ভাব্য অনেকগুলি গতিপথই যেন খোলা হয়ে যাচ্ছে তাঁর সামনে। কিন্তু কোনোটারই মধ্যে—এমনকী সাম্যবাদেও—মানুষের কোনো মুক্তি দেখছেন না তিনি। এখানে 'এমনকী' শব্দটা বলবার একটা মানে আছে। মার্ক্সীয় চিন্তাকে অনেক সময়েই প্রশ্রয়যোগ্য বলে ভেবেছেন তিনি, এক সময়ে এমন একটা সমীকরণও জানিয়েছিলেন যে সাম্যবাদের সঙ্গে ঈশ্বরকে যুক্ত করে দিলে তারই নাম হয় ইসলাম। ঈশ্বরহীনতাই ও-তত্ত্বের বড়ো-একটা স্খলন, একথা ঘোষণা করে 'সাম্যবাদ আর পুঁজিবাদ' উপশিরোনামে জাভেদনামায় লিখেছিলেন তিনি:

'ডাস কাপিটাল' লিখেছেন যিনি, ইব্রাহিমের গোত্র তাঁর,
জানেননি সেই মহামনীষীও জিব্রাইলের ডানা;
এমনকী তাঁর ভুলেরও মধ্যে সুপ্ত ছিল-বা সত্যসার
বিশ্বাস তাই ছিল তাঁর মনে, মেধায় ছিল না জানা।
প্রতীচীবাসীরা হারিয়ে ফেলেছে স্বর্গলোকের প্রজ্ঞাচোখ
শুদ্ধ শক্তি খুঁজছে কেবল অন্নের সংস্থানে।
জীবন তো শুধু শরীর থেকেই পায় না গন্ধবর্ণলোক—
অথচ এই-যে সাম্যতন্ত্র, এ শুধু শরীরই মানে।
এই-যে ধর্ম, মোহন্ত যার জানেননি ঠিক সত্যসার,
উদরান্নের সাম্যেই শুধু সে-ধর্ম বাঁধা রয়
ভ্রাতৃত্বের বন্ধনডোর সত্য তো শুধু হৃদয়ে, তার
শিকড় লুকোনো হৃদয়মধ্যে, স্থূল মাটিজলে নয়।

ওইদিকে দেখো সেই শরীরেরই ভালো চায় ধনতন্ত্রবাদ
তারও বিকশিত বুকের ভিতর হৃদয়ের নেই ঘর;
যেন মৌমাছি ফুলের উপরে ঘুরে ঘুরে নেয় গন্ধ স্বাদ
পাপড়ি এড়িয়ে মধুকেই শুধু নিয়ে যায় মধুকর,
গোলাপ তো তবু বোঁটায় পাতায় গন্ধ বা রং সব নিয়ে
সেই রূপেরই তো শোভায় বিভোর বুলবুল মাতে গানে।
ছাড়ো এ গন্ধ ছেড়ে যাও রং ছাড়ো ভাগোর ভঙ্গি এ—
বিদায় জানাও ও-রূপরেখাকে, খুঁজে দেখো মূল মানে।
জানা সহজ না সেই মৃত্যু যা ভিতরে লুকোনো থাকে—
সত্যি শুধু যা একমুঠো মাটি, গোলাপ বোলো না তাকে।

দুজনেই তারা অস্থির তারা সইতে পারে না এ ওর মন,
কারোই তাদের ঈশ্বর নেই, মানুষ ভোলায় তারা।
উৎপাদনেই বাঁচে একজন, শুষ্কে শুষ্কে অনাজন,
কাচের টুকরো মানুষ, দুধারে এ-দুই পাথর খাড়া।
বিজ্ঞান আর শিল্প ধর্ম লুটিয়ে দিচ্ছে একজনে
অন্যটি কেড়ে নিচ্ছে আত্মা কাড়ছে মুখের ভাত।
দুজনেই দেখি ডুবে বসে আছে মাটি ও জলের মন্থনে
দুয়েরই হৃদয় আঁধার, শরীরে হাজার বর্ণপাত।
অথচ জীবন আবেগদহনে সৃষ্টি করার দায়
জীবন ছড়ায় হৃদয়ের বীজ ও-মাটির প্রতিমায়।

পশ্চিমের সভ্যতা থেকে মুখ ফিরিয়ে তাই ইকবাল রূপ দিতে চেয়েছিলেন এক প্রাচ্য দর্শনের, যে-দর্শন বস্তুতন্ত্রকেই শেষ কথা বলে মানবে না, আবার অবজ্ঞাও করবে না বস্তুকে। চাইছিলেন তিনি সেই দর্শন, যা প্রাত্যহিকের মুখোমুখি হবার জন্য শক্ত করে গড়ে তুলতে পারে নিজেকে। আর এইভাবে, তাঁর এই দর্শন, এই আত্মশক্তির দর্শন, হয়ে দাঁড়াবে আমাদের পশ্চিমমুখিতার বিরুদ্ধে, আমাদের পশ্চিমনির্ভরতার বিরুদ্ধে, এমনকী আমাদের পরাধীনতার বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ। এই দর্শনেই হবে জাতি-হিসেবে আমাদের মুক্তি। এইরকমই ভাবছেন ইকবাল।

৪.

সময়ের যে ব্যাধিলক্ষণগুলি দেখে এইভাবে ভাবছিলেন ইকবাল, আমাদের মনে পড়বে যে একই সেই লক্ষণের কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথও। ইকবালের 'সারে জাহাঁসে আচ্ছা' লিখবার এক বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও লিখবেন 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'। ইকবাল লিখেছিলেন 'ন সমঝোগে তো মিৎ জাওগে অয়ি হিন্দুস্তাঁওয়ালে' আর রবীন্দ্রনাথ বলছিলেন 'আপনি অবশ হলি তবে বল দিবি তুই কারে'। সামনে একটা প্রতিরোধ দেখে এই অবশতার থেকে রবীন্দ্রনাথ জাগিয়ে তুলতে চাইছিলেন তাঁর দেশকে 'উঠে দাঁড়া উঠে দাঁড়া ভেঙে পড়িস না রে।' ইকবাল ইওরোপে গিয়ে তাকে চিনতে পারছিলেন তাঁর উনত্রিশ বছর বয়সে। সেই একই বয়সে যখন দ্বিতীয়বার ইওরোপ ভ্রমণ করেন রবীন্দ্রনাথ, ডায়েরিতে প্রশ্ন করেন 'তোমাদের উন্নতি তোমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?' ষোলো বছর পর, ইকবালেরও মনে উঠবে ওই একই প্রশ্ন, একই সংশয়। ইকবাল যখন Perfect Man-এর কথা তুলছেন ১৯০২ সালে, বাংলাভাষায় রবীন্দ্রনাথ তখন লিখছেন 'উন্নতির মূল্য সর্বনেশে হইতে পারে', লিখছেন যে 'য়ুরোপের সংঘাত সমস্ত সভ্য এশিয়াকেই সজাগ করিতেছে', দেখতে পাচ্ছেন যে ইওরোপের সাম্রাজ্যগুলি পরস্পর পরস্পরকে লঙ্ঘন করবার চেষ্টা করছে। ইকবালের Perfect Man-এর মতো, তাঁর অনেক আগে থেকেই তাই, রবীন্দ্রনাথও তাঁর উপন্যাসে নাটকে কবিতায় পূর্ণ মানুষের একটা আদল তৈরি করে তুলছিলেন বৌঠাকুরানীর হাট বা রাজর্ষিতে, রাজা ও রানী বা বিসর্জনে, কথা ও কাহিনী বা কাহিনীতে। তৈরি করে তুলছিলেন তিনি এমন-কিছু আদর্শ মানুষ যারা রাজপ্রতাপের ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে একটা আত্মস্বতার শক্তি নিয়ে, এবং/অথবা দেখিয়ে দিতে পারে রাজকীয়তারও কোনো ভিন্ন সংজ্ঞার্থ। ইওরোপীয় সভ্যতার—বিশেষত ইংরেজ রাজত্বের—সংঘর্ষের সামনে রেখে ভারতবর্ষকে বুঝতে চাইছিলেন তিনি, আর প্রতিষেধক হিসেবে কল্পনা করছিলেন কোনো-একটা পদ্ধতির। তখন, মনে হচ্ছিল তাঁর, 'নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত করা

চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়।' ফলে, এটা যেন অনিবার্য ছিল যে ১৯০৫ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধের বইটির নাম হবে 'আত্মশক্তি'। ১৯০১ থেকে ৮ সাল পর্যন্ত মুদ্রিত তাঁর প্রায় চল্লিশটি প্রবন্ধে কোনো-না-কোনো ভাবে এসে যায় এই প্রতিস্পর্ধিতার কথা। 'সমস্যা'ও তাঁর প্রবন্ধের নাম, 'সদুপায়'ও তাঁর প্রবন্ধের নাম। সেই সদুপায় হিসেবে তিনি জানান: 'অদ্য বারবার দেশকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, অধ্যবসায়ই শক্তি এবং অধৈর্যই দুর্বলতা; ...একটা কিছুকে গড়িয়া তুলিলে কতকটা কৃতকার্য হইবামাত্র সেই আনন্দে আমাদের শক্তি অচিন্তনীয় রূপে নব নব সৃষ্টি দ্বারা নিজেকে চরিতার্থ করিতে থাকে। এই মিলনের পথ, সৃজনের পথই ধর্মের পথ।'

অর্থাৎ, একইরকম রাষ্ট্রীয় পটভূমির সামনে দাঁড়িয়ে, ইওরোপ বিষয়ে একইরকম বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় কোনো এক প্রতিরোধের কথা ভাবছিলেন এই দুই কবি। সেই প্রতিরোধের নাম আত্মশক্তি। রবীন্দ্রনাথ সে-আত্মশক্তির কথা তাঁর প্রবন্ধগুলিতে বলছিলেন এক ভাষায়, নৈবেদ্য থেকে গীতাঞ্জলি পর্যন্ত কবিতাগুলিতে অন্য ভাষায়, কিন্তু প্রায় একই তার অন্তঃসূত্র। অনেক সময়ে আমরা ধরে নিই যে শতাব্দীর প্রথম ওই দশকটা জুড়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতাচর্চায় যেন সমকালের সমাজ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন এক অধ্যাত্মসাধনার পর্বই শুধু আছে। কিন্তু আত্মশক্তির এই পটভূমিতে দেখলে তাকে আর তত বিচ্ছিন্ন এক পর্ব বলে মনে করবার বিশেষ কারণ থাকে না। নৈবেদ্যর কবিতাগুলির একটা বড়ো অংশেই যে প্রার্থনা, সে তো কেবল 'দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর / বেদনায়' নিজেকে দায়বদ্ধ করে নেবার প্রার্থনা। 'এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে / সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার / মনুষ্যমর্যাদাগর্ব চিরপরিহার— / এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে / চূর্ণ করি দূর করো'—এই হলো সেখানে প্রার্থনা। জাতিপ্রেম নাম নিয়ে প্রচণ্ড অন্যায় যে মৃত্যুর সন্ধানে ছুটে চলেছে, পশ্চিমের রক্তরাগরেখায় যে চিতার আগুন দেখা যাচ্ছে, তার সর্বনাশ থেকে বেরিয়ে আসবার আহ্বান নিয়ে নৈবেদ্য; যে-ভক্তি 'সর্ব কর্মে দিবে বল / ব্যর্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সফল / আনন্দে কল্যাণে' তার দিকে যাবার পথ চিহ্নিত হয়ে থাকে সেখানে। সেইখান থেকে গীতাঞ্জলি পর্যন্ত, ব্যক্তির তৈরি হয়ে উঠবার একটা আহ্বান আছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গানে, আর শেষ পর্যন্ত, 'যখন তোমার শক্তি হবে / উঠবে ভরে প্রাণ / আগুনভরা সুধা তাঁহার করবি যখন পান— / বাইরে তখন যাস্ রে ছুটে / থাকবি শুচি ধুলায় লুটে / সকল বাঁধন অঙ্গে নিয়ে / বেড়াবি স্বাধীন—'। যতদিন তা না হয়, 'অন্তরেরই অন্তঃপুরে / থাক্ রে ততদিন'।

এইসব কবিতাগানে আত্মপ্রস্তুতির যে কথা আছে, তার প্রস্তুত চরিত্ররূপটা আমরা দেখতে চাই উদয়াদিত্য বা গোবিন্দমাণিক্যে, গুরুগোবিন্দে বা ধনঞ্জয়ে, গোরায় বা নিখিলেশে। আর এইসব চরিত্রের সামনে এসে বুঝতে পারি রবীন্দ্রনাথ কীভাবে ব্যক্তি থেকে সমাজের দিকে আমাদের টান দেন, কীভাবে ইকবালের মতোই তিনি বলতে পারেন সেখানে, ব্যক্তি তার সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য পৌঁছয় গিয়ে সঙ্ঘে। শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালার একটি লেখায় তিনি বলেছিলেন যে তিনটে অবস্থার মধ্য দিয়ে এগোয় আমাদের মন। তার প্রথম অবস্থান প্রাকৃতিকতায়, সত্যকে তখন দেখি নিছক বাইরের চেহারায়। তার দ্বিতীয় অবস্থান অন্তর্জগতে: 'যে-বাহিরকে একদিন রাজা বলে মেনেছিলুম, তাকে কঠোর যুদ্ধে পরাস্ত করে দিয়ে ভিতরকেই জয়ী বলে প্রচার করলুম।' কিন্তু এই জয়েই আমাদের শেষ পরিণাম হতে পারে না। আধ্যাত্মিকতার তৃতীয় স্তর পাব তখন, যখন 'অন্তরের নিগূঢ় কেন্দ্র থেকে নিখিল বিশ্বের অভিমুখে ছড়িয়ে পড়তে পারি আমরা', যখন বলতে পারি '...ভেদ নয় তখন মিলন, তখন আমি নয় তখন সব।'

বাহিরকেই রাজা বলে মানবার ভুল, ভিতরকেই জয়ী বলে প্রচার করবার স্বস্থতা, আর নিখিল বিশ্বের অভিমুখে ছড়িয়ে পড়বার মুক্তি: সঙ্ঘ বা সমাজের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগের কথা বললে সব কি ঝাপসা হয়ে যাবে? কেনই-বা তা যাবে? রাষ্ট্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না থেকে নিজেদের অভ্যন্তরীণ একটা সামাজিক শক্তি তৈরি করে তুলবার যে কর্মসূচি সেদিন সাজিয়ে দিচ্ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার মধ্যে তাঁর ওই ত্রিস্তরের ভাবনাকে একটা প্রত্যক্ষ রূপ দেবার আয়োজন বেশ স্পষ্ট। 'ব্যবস্থাতন্ত্র' শব্দটিরই ব্যবহার করেছিলেন তিনি, তাঁর পরিকল্পনায়। 'নিজের শক্তিকে আপনারা অবিশ্বাস করিবেন না' এই আবেদন জানিয়ে কেবলই সেখানে বলেছেন : 'কাজ করিয়া যাওয়াই পৌরুষ'।

কিন্তু কোন্‌টা আমাদের কাজ? 'বিচ্ছিন্নতার মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করা, জড়ত্বের মধ্যে জীবনসঞ্চার করা, সংকীর্ণতার মধ্যে উদার মনুষ্যত্বকে আহ্বান করা' : তাঁর এই কথাগুলিকে মনে হতে পারত আপ্তবাক্য শুধু, যদি-না সুনির্দিষ্ট রূপরেখায় একটা পদ্ধতিরও কথা বলে যেতেন তিনি সেইসঙ্গে। সেইখানেও, সেই পদ্ধতিতেও, তিনটে ধাপের কথা বলবেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথম, জনসমাজের সঙ্গে শিক্ষিতসমাজের যোগ। দ্বিতীয়, কেবল উপদেশ-আলোচনায় নয়, সে-যোগকে সকলের কর্মপ্রয়াসের সচেতনতার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। আর তৃতীয়, এই ছড়ানোর ফল হিসেবে গ্রামগুলির মধ্যে একটা জোট বা organization গড়ে তোলা। গড়ে তুলতে হবে প্রাদেশিক প্রতিনিধিসভা, শাখা থাকবে তার গ্রামে গ্রামে। সমগ্র জেলা জুড়ে এইভাবে তৈরি



হবে একটা পল্লীমণ্ডলী, যেখানে থাকবে আমাদের নিজস্ব পরিচালনার পাঠশালা শিল্পশিক্ষালয় ধর্মগোলা সমবেত-পণ্যভাণ্ডার আর কৃষিব্যাঙ্ক। থাকবে নিজেদেরই সালিশির ব্যবস্থা, আর মুক্ত আনন্দের মেলা। কৃষি শিক্ষা আর স্বাস্থ্য : এই তিন মৌলিক সমস্যার দিকে নজর রেখে গ্রামগুলিকে স্বনির্ভর করে তুলবার এই একটা কল্পনা ছিল তাঁর মনে।

অনেকে হয়তো মানতে পারেননি এসব পরিকল্পনার বাস্তবিক সম্ভবপরতার কথা। কিন্তু শুধুমাত্র পরিকল্পনার স্তরে না রেখে, তাঁর নিজস্ব জমিদারিতে গ্রামগুলির কোথাও কোথাও রবীন্দ্রনাথ যে গড়ে তুলেছিলেন এমনকিছু পল্লীসমাজ, তার নজির তো আমাদের অজানা নয়। আর, এই ভাবনাকে প্রতিধ্বনিত করবার মতো আরো দু-একজন মনস্বীকেও সে-আমলে যে দেখা গিয়েছিল, তাতেও সন্দেহ নেই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের এক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী সমাজের ভাবনাকে আরো একবার পেশ করবার প্রায় একযুগ পরেও—১৯২০ সালের সম্মেলনে—অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে অশ্বিনীকুমার দত্তও বলেছিলেন অনুরূপ এক সূচির কথা, 'আত্মপ্রতিষ্ঠা' নামের সেই বক্তৃতা শুরু হয়েছিল এই কথায় : 'স্বরাজলাভ বলিতে কী বুঝি? বুঝি আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া।' আর, কীভাবে হতে পারে সেই প্রতিষ্ঠা? তার 'জন্য প্রধানতঃ চারিটি বিষয়ে সর্বাগ্রে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া কর্তব্য—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বদেশী, সালিশি।' এখানে স্মরণীয় যে অশ্বিনীকুমারের ওই 'স্বদেশী' শব্দের মধ্যেই আছে একযোগে কৃষি আর শিল্পের কথা। রবীন্দ্রনাথের ভাবনার প্রভাব এখানে অস্পষ্ট নয়।

অশ্বিনীকুমার যখন এই আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা বলছেন, তার অল্প কমাস পরেই রবীন্দ্রনাথকে লিখতে হচ্ছিল 'সত্যের আহ্বান'। অশ্বিনীকুমারের এই পুনঃপ্রস্তাব সত্ত্বেও খানিকটা হতাশ স্বরেই বলছেন রবীন্দ্রনাথ, 'যে দেশে জন্মেছি কী উপায়ে সেই দেশকে সম্পূর্ণ আমার আপন করে তুলতে হবে' তার প্রচার করায় একদিন 'দেশের লোক বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল'। 'নিজের সৃষ্টিশক্তি দ্বারা দেশকে নিজের করে তোলবার যে আহ্বান', তার তাৎপর্য সকলে বুঝতে পারেননি সেদিন। আর সেই আহ্বানের কথাই একদিন রবীন্দ্রনাথ বলছিলেন, কেবল তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে নয়, ১৯০১ থেকে ৮ সালের সেই চল্লিশটি প্রবন্ধেও শুধু নয়, স্তরান্তরে রূপান্তরে সেই আহ্বানেরই কথা ছড়ানো আছে তাঁর অনেক উপন্যাস-নাটক-কবিতায়, আর বলা যায় যে তারই এক অন্তঃসার আছে শতাব্দীসূচনায় নৈবেদ্য বইখানির মধ্যেও। ইকবালের কাছে আসরার-এ-খুদির যে ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথের কাছে—খানিকটা বীজাকারে—নৈবেদ্যরও ভূমিকা সেইটেই।

৫.

কিন্তু 'নৈবেদ্য' (১৯০১) থেকে 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যেভাবে পৌঁছন তাঁর পাঠকের কাছে, আর 'আসরার-এ-খুদি' (১৯১৫) থেকে 'জাভেদনামা' (১৯৩২) পর্যন্ত ইকবালকে যেভাবে পান তাঁর পাঠকেরা, সেটা কি ঠিক একরকম? না কি আত্মশক্তির এত পুনরাবর্তনময় উচ্চারণ সত্ত্বেও একেবারে বিপরীতমুখী হতে পারে পাঠকের প্রতিক্রিয়া, এই দুই কবির লেখা থেকে? এটা ঠিক যে এঁরা দুজনেই পশ্চিমের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একটা ভিন্ন ধরণের সমাজ-আদলের কথা ভাবছিলেন, একইরকম সময়-পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেটা ভাবছিলেন তাঁরা, কিন্তু ঠিক একইরকম হতে পেরেছিল কি তাঁদের যাত্রাপথ? না, উৎসে আর লক্ষ্যে, দুটো বড়ো মাপের স্বাতন্ত্র্য তাঁদের চলনকে সরিয়ে রাখে পরস্পর থেকে দূরে। রবীন্দ্রনাথ আসছেন শুনে লাহোর থেকে ইকবালের চলে-যাওয়াটা তাই যেন একেবারে প্রতীকী হয়ে দাঁড়ায়।

ঊনত্রিশ বছর বয়সে এঁদের দুজনেরই ইওরোপ-অভিজ্ঞতার কথা আগে একবার বলেছি। সে-অভিজ্ঞতায়, রবীন্দ্রনাথ লিখছিলেন : 'আমরা যে বিশ্বসংসার মায়া বলে বসে আছি এবং তোমরা যে একে ধ্রুব সত্য বলে খেটে মরছ, তোমরা কি আমাদের চেয়ে বেশি সুখী হয়েছ?' এই প্রশ্নের মধ্যে যে-মনটা কাজ করে, সে-মন থেকে এইসব কথাও এসে পৌঁছতে পারে যে 'খুব সম্ভবত সহিষ্ণুতা এবং নম্রতা ছাড়া আমাদের বাঁচবার কোনো উপায় নেই' অথবা, ইওরোপের সুখ আছে আর আমাদের আছে সোয়াস্তি, অর্থাৎ সন্তোষ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : 'য়ুরোপ বলে, এই সন্তোষই, এই জিগীষার অভাবই, জাতির মৃত্যুর কারণ।'

শেষ এই উদ্ধৃতিতে আমরা কিন্তু 'য়ুরোপে'র বদলে স্বচ্ছন্দে বসিয়ে দিতে পারি ইকবালেরও নাম। কেননা ইকবালও বলবেন ঠিক তা-ই। এই সহিষ্ণুতা নম্রতা সন্তোষ, এই জিগীষার অভাব—এইসবই যে এক-একটা জাতিকে আত্মভ্রষ্ট করে দিয়েছে, ইকবালের দেখাবার বিষয় তো ছিল সেইটেই।

আত্মশক্তির ধারণায় উৎসগত এই প্রভেদের সঙ্গে এসে মিলে যায় লক্ষ্যেরও একটা প্রভেদ। একথা বলেছি যে ব্যষ্টির আত্মকে সমষ্টির আত্মার দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন দুজনেই, কিন্তু ঠিক একইরকম নয় এই দুই সমষ্টির ধারণা। ইকবাল যখন বলেন 'আমাদের অধঃপতন' 'আমাদের উন্নতি' 'আমাদের দায়িত্ব'—তখন সেই 'আমাদের' শব্দের আত্মতাবোধ কার সঙ্গে? ইওরোপ থেকে ফিরে আসবার পর, পশ্চিমি জীবনদর্শনের বিপরীতে যে দর্শন ভাবতে চাইছিলেন ইকবাল, তার স্পষ্টতই আছে এক ঐসলামিক রূপ। 'তরানা-ই-হিন্দি' যিনি লিখেছিলেন,

আমরা জানি যে তার অল্প পরেই তাঁকে লিখতে হয়েছিল 'তরানা-ই-মিল্লি'। 'সারে জাহাঁসে' কবিতায় যিনি বলেছিলেন 'হিন্দি হ্যয় হম ওয়তন হৈ হিন্দুস্তাঁ হামারা', তিনিই বলবেন অল্প পরে: 'মুসলিম হ্যয় হম ওয়তন হৈ সারে জাহাঁ হামারা'। হিন্দ থেকে মুসলিম শব্দে এই রূপান্তরের মধ্য দিয়েই নির্ধারিত হয়ে গেল ইকবালের ভাবী জীবনপথ। একাত্মতাবোধের এই বিশেষ দিকটার ক্ষীণ ইঙ্গিত যে 'সারে জাহাঁসে'র মধ্যেও একেবারে ছিল না তা নয়, গঙ্গাকে আহ্বান করে বলা ছিল সেখানে, মনে কি পড়ে সেদিনকার কথা 'উৎরা তেরে কিনারে জব কারাভাঁ হামারা', তোমার কিনারে যখন এসে পৌঁছল আমাদের ক্যারাভান? ছবিটা নিশ্চয় অস্পষ্ট নয়।

মুসলিম বা ইসলামের এই ধারণায় এসে পৌঁছবার ফলে ইকবালের আত্ম হয়ে দাঁড়ায় সম্প্রদায়ের আত্ম, এবং সেইজন্যেই তার কোনোরকম দেশের সীমা মানবার দরকার করে না আর। জাভেদনামায় বলেন তিনি : 'এই একমুঠো মাটি, যাকে তোমরা নাম দাও দেশ/এই যাকে বলে থাকো মিশর পারস্য ইয়েমেন/সেখানে মানুষ আর দেশের বাঁধন শুধু এই :/দেশের মাটির থেকে ওই জাতি জেগে উঠেছেন।' ব্যস, ওই পর্যন্তই। কিন্তু পুবে ওঠে বলে সূর্য কি কেবল পূর্বের? প্রশ্ন করেন তিনি। জ্বলে ওঠে সে তখনই 'যখন সে খুলে যায় প্রাচীপ্রতীচীর বেড়ি ভেঙে/বিভায় বিভোর জাগে পূর্ব দিগন্তের অন্তরালে/যাতে তার অধিকার ছড়াতে সে পারে চক্রবালে।'

এই অধিকার-ছড়ানোর মধ্য দিয়ে, এই জিগীষার মধ্য দিয়ে ঐক্যসূত্র তৈরি করে নিয়ে পুনরুত্থান হতে পারে নতুন এক মানবসমাজের, একথা বলবার সময়ে ইকবালও সাজিয়ে দেন এক কর্মসূচিই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজের মতো নতুন কোনো সূচির সেখানে দরকার হয় না তাঁর, সে-সমাজের রূপরেখা পেয়ে যান তিনি কোরানেরই মধ্যে। ফলে, আসরার-এ-খুদির পর, রুমূজ-এ-বেখুদিতে যখন তিনি 'ব্যষ্টির মিলনে সমষ্টির সৃষ্টি'র কথা বলেন, তখন তাঁর রচনায় কোনো-একটা সর্গের নামই হতে পারে 'ইসলামীয় সমাজের ভিত্তিস্তম্ভ'। তার প্রথম স্তম্ভ 'তওহিদ', দ্বিতীয় 'রিসালাত-পয়গম্বরী'। আর যেহেতু ইসলামীয় সমাজ এইসব স্তম্ভের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তাই দেশবিদেশের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয় আর, ঘোষণা করেই ইকবাল জানাতে পারেন তখন 'ইসলাম ছাড়া নেই আমাদের জন্মভূমি'।

এ-ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার দূরত্ব বেশ স্পষ্ট। ইকবাল যখন সম্প্রদায়ের কথা বলেন, রবীন্দ্রনাথ বলেন তখন মানুষের কথা। জাতীয়তার গণ্ডি ভাঙবার কথা বলেন দুজনেই, কিন্তু একজন বলেন তা মানুষের জন্য, অন্যজন ধর্মের।

এ-প্রভেদের কথা বলবার সময়ে আমাদের অবশ্য মনে রাখতে হবে, ধর্মনিরপেক্ষ সম্প্রদায়নিরপেক্ষ এক মুক্ত চেতনার দিকে অনেকখানি এগিয়ে থাকলেও, তাঁর 'আত্ম'-ধারণায় রবীন্দ্রনাথও সবসময়ে নিশ্চয় এড়াতে পারেননি পিছুটান। ভিন্ন-সম্প্রদায়ের অবস্থানে দাঁড়িয়ে দেখলে, তাঁর ভাবনার মধ্যেও সম্প্রদায়চিহ্ন কখনো কখনো নিশ্চয় দেখতে পাওয়া যায়। ইকবাল যখন আমাদের পশ্চিমমুখিতার বিরুদ্ধে বা আধুনিক পশ্চিমি জীবনের বিরুদ্ধে সাজিয়ে তুলছিলেন ঐসলামিক দর্শন, রবীন্দ্রনাথ তখন তুলে আনতে চাইছিলেন এক তপোবনের কল্পিত ভারতবর্ষ, আর সে-কাজে তিনি অবিরাম আশ্রয় খুঁজেছেন বৈদিক মন্ত্রে বা উপনিষদে। একসময়ে (১৯০২) রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'আমরা ফিরিঙ্গি হইতে চাই না, আমরা দ্বিজ হইতে চাই।' মনে হয়েছিল তাঁর : 'আমাদের সমস্ত সমাজ সেই প্রাচীন দ্বিজত্বকে লাভ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে...।' তবু, সন্দেহ নেই যে আধুনিক ভারতীয়তার সঙ্গে সনাতন হিন্দুত্বকে মিলিয়ে ফেলবার যে জট তৈরি হয়েছিল গত শতাব্দীর শেষ থেকে এই শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত, রাজনৈতিক/দার্শনিক প্রায় সমস্ত মনীষীরই মন যখন জড়িয়ে গিয়েছিল সেই জটে, রবীন্দ্রনাথই তখন অল্পে অল্পে নিজেকে খুলে আনছিলেন তার থেকে, আর তারই একটা ক্রমিক ইতিহাস পাই এই শতাব্দীর প্রথম দশকে লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলির পরম্পরায়, সে-ইতিহাসই দেখা যায় গোরার আত্মবোধের উন্মোচনে। এটা ঠিক যে *The Religion of Man* বা 'মানুষের ধর্ম' বক্তৃতাগুলির সময়েও জীবনসাক্ষ্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ তুলে আনেন উপনিষদের সূত্র, কিন্তু ইকবালের আজীবন কোরান-নির্ভরতা আর রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে এই উপনিষদ-নির্ভরতার একটা প্রভেদ শুধু এই যে রবীন্দ্রনাথ আর উপনিষদের মধ্যেই মুক্তি খোঁজেন না এখন, তাঁর ভাবনার সহায়ক কিছু সূত্র শুধু খোঁজেন সেখানে। তাঁর ভাবনা তাঁকে চালিত করে তখন এই পথে যে 'সব মানুষকে নিয়ে, সব মানুষকে অতিক্রম করে, সীমাবদ্ধ কালকে পার হয়ে এক-মানুষ বিরাজিত।' আর তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে 'প্রত্যেক মানুষের বিস্তার খণ্ড খণ্ড দেশকালপাত্র ছাড়িয়ে', 'যেখানে মানুষের বিদ্যা, মানুষের সাধনা সত্য হয় সকল কালের সকল মানুষকে নিয়ে'।

ইকবালও বলেছিলেন যে ইসলামের জন্য প্রচার করাই তাঁর ফারসি কবিতাবলির প্রধান লক্ষ্য নয়, তিনি শুধু চান উন্নততর এক সমাজব্যবস্থা। কিন্তু তাঁর সেই চাওয়ায়, সেই সন্ধানে, 'it is simply impossible to ignore an actually existing social system' — আর সে-সিস্টেমের কথা বলাই আছে ইসলামে। কার্যত তাই কোরানের মধ্যেই মুক্তি খোঁজেন





ইকবাল, ইকবালের কল্পিত ভবিষ্যৎ সমাজের রূপ তাই প্রায় স্থিরীকৃত হয়ে আছে অতীতেই, সেই সম্বল নিয়ে বর্তমানের মানুষকে সক্রিয় এবং গরীয়ান হয়ে উঠবার জন্য আহ্বান জানান তিনি, কেননা সেইভাবেই ঘটবে তার আত্মশক্তির প্রকাশ। আর, রবীন্দ্রনাথের কল্পিত ভবিষ্যৎ-সমাজের কোনো স্থির রূপ তৈরি হয়ে নেই, সচল বর্তমানের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠছে সে-সমাজের কর্মকল্পনা, সে-কল্পনায় আধ্যাত্মিকতা আছে কিন্তু ধর্মীয়তা নেই, আত্মিকতার সম্পর্কযুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ এক কর্মকাণ্ডের দিকে আহ্বান জানিয়েই রবীন্দ্রনাথ বলেন তাঁর আত্মশক্তির কথা।

ইকবালের মৃত্যুর পর, তাঁর কবিতার এক 'ইউনিভার্সাল অ্যাপিল'এর কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু ইকবালের কবিতা ঠিকভাবে পড়তে পেলে, ইকবালকে সম্পূর্ণভাবে জানতে পারলে, তাঁর গরিমাময় কবিপ্রতিভায় মুগ্ধতা প্রকাশ করলেও ঠিক ওই 'ইউনিভার্সাল' শব্দটাই ব্যবহার করতে পারতেন কি না সন্দেহ হয়। বরং অমিয় চক্রবর্তী যেকথা তাঁকে লিখেছিলেন চিঠিতে, ইকবালের লেখায় 'যথেষ্ট গভীর দৃষ্টির সঙ্গে' 'একটি অস্বাভাবিক সংকীর্ণ উগ্রতার' মিশোল দেখতে পান তিনি, যার ফলে অনেক সময়েই 'একরকমের ফরমাসী ইসলামী ফুল' তৈরি হয়ে ওঠে তাঁর লেখায়, 'ইউনিভার্সাল'-এর বিপরীতে সে-কথাটাই অনেক নির্ভরযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ আর ইকবালের এই দুই আত্ম-র বহুদূরবর্তিতাই আমাদের ইতিহাসের একটা সংকটচিহ্ন তৈরি করে রেখেছিল সেদিন, তৈরি করে রেখেছে আজও। ইতিহাসকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নেবার কাজে, এই দুই কবির ভাবনার সীমাকে আর সেই সীমা ভাঙতে চাওয়ায় তাঁদের প্রক্রিয়া বা ব্যর্থতাকে ঠিকমতো বুঝে নেওয়াও আমাদের একটা দায়িত্ব তাই আজ। □

---

প্রয়াত সুকুমার সেনের জন্মদিবস-স্মরণে আয়োজিত ঘরোয়া সভায় লেখাটি পড়া হয়েছিল এ-বছরের ষোলোই জানুয়ারি।

চতুরঙ্গের পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে আগামী অগ্রহায়ণ মাসে। গত সংখ্যা থেকে চতুরঙ্গের প্রতি সংখ্যার মূল্য ধার্য হয়েছে বারো টাকা। পত্রিকার কলেবরের অনুপাতে এই মূল্য যে খুবই কম, অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই সেকথা বুঝবেন। যাঁদের গ্রাহকচাঁদা শেষ হয়েছে এবং যাঁরা নতুন গ্রাহক হতে চান তাঁদের এখন থেকে মাস কিংবা বৎসরের হিসাবে নয়, সংখ্যা হিসাব করে গ্রাহক হতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অর্থাৎ তাঁরা ৪টি, ৮টি, কিংবা ১২টি সংখ্যার গ্রাহক হতে পারেন। যে কটি সংখ্যার গ্রাহক হবেন সেগুলির মূল্য একত্রে যত দাঁড়ায় ততই গ্রাহকচাঁদা পাঠাবেন। আমরা কেবল ডাকখরচা বহন করব। গ্রাহক চাঁদা মানিঅর্ডার কিংবা ড্রাফটে পাঠানো বাঞ্ছনীয়। কলকাতার বাইরের চেক ব্যাংকের সার্ভিস চার্জ সহ পাঠাতে হবে। যাঁদের গ্রাহকচাঁদা শেষ হয়নি তাঁদের যতগুলি সংখ্যা এখনও প্রাপ্য, যেমন যেমন পত্রিকা প্রকাশিত হবে তাঁরা পেতে থাকবেন।

# কিছু প্রজাপতি

বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কিছু লেখালিখি করবার ছিল,
কিছু প্রজাপতি ধরবার ছিল,
ঝুটি আঁকড়িয়ে চড়বার ছিল
অশ্বমেধের ঘোড়াতে।

শেষ হয়ে আসে লেখালিখিগুলো,
প্রজাপতি নয়, বালি আর ধুলো,
তেলচিটে ফাটা বালিশের তুলো
এখন চায় সে ওড়াতে।

অথচ কথা যে রয়ে গেল বাকি,
সে বলে, 'এখনও তাই চোখ রাখি
সাঁতার কাটছে কয়েকটি পাখি
যেখানে আকাশগঙ্গায়।'

তুমি খুব জানো, কথাগুলি কার,
কেন তার চোখে জ্বলে অঙ্গার,
যদিও পঙ্গু, মন ছিল তার
তবু কাঞ্চনজঙ্ঘায়।

# শিল্পসম্মত

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

এত বন্ধু আছে তোমার, শত্রুর দরকারই পড়ছে না!
যে পথ তোমার কাছে নিজে হেঁটে আসে
সে পথে এখন দেখো ফিরছে যন্ত্রণা!
এই আপাতবিরোধও খুব শিল্প হতে পারে!
গঙ্গার জলভাসি সব জাহাজনিশানে
হাওয়া লেগে নড়ে নানা দেশ,
তাদের দূরত্ব শুধু জেগে থাকবে শব্দের প্রশ্রয়ে
এই সব ভেবে যত প্রতীকই পালটাও
তবু তুমি আর কখনোই পারবে না হতে প্রণয়বয়স্যা রমণীর।
—ঠিক এখানেই কবিতাকে থামানো দরকার মনে হয়।
"বন্ধুরে তুমি বিহনে বন্ধু" বলে তখনো কেন যে তুমি
ধিক্কারধিক্কারে বাতাসকে বিচলিত করো।
সূর্য, জ্যোৎস্না, শিশিরসম্পাত শুধু অভ্যস্তপ্রথায়
তোমার অক্ষর শোনে, তবু তারা প্রকৃত ধরিত্রী ধাত্রী নয়
তাই জয় সম্পূর্ণ হয় না! বিরুদ্ধবাদীও চাই,
ঠিকঠাক কূর্তা কামিজ পড়লেও
অন্তত একজনও বলুক তোমার
শরীর এবং জামা পরিপূরক নয়।

বন্ধু এত আছে তোমার, অন্তত একজন
শত্রুকে না খুঁজে পেলে তুমি কিন্তু
কখনোই পারবে না হতে শিল্পসম্মত।

## অয়ি তোমার হিরণ্যকেশ...

আনন্দ ঘোষ হাজরা

অয়ি তোমার হিরণ্যকেশ হঠাৎ ছড়াও কৃষ্ণ-কাজল মেঘে
মরুৎ-মেয়ের দল মেতেছে তুমুল খেলায়
মাথায় বেঁধে মেঘের ঝুঁটি আকাশ জুড়ে দাপিয়ে বেড়ায়
অয়ি তোমার হিরণ্যকেশ হঠাৎ ছড়াও হাসির মতো।

গাভীর স্তনের মতন স্বাদু শুভ্র দিনের উজ্জ্বলতায়
নামছে ধীরে বিষণ্ণতা; যেন তাকে যেতেই হবে খেলার শেষে
এখন নামছে মরুৎগণের ঘোর কোলাহল; মরুৎ-মেয়ে
খুব সেজেছে, চতুর্দিকের গাছ গাছালি নদী পাহাড়
খুব মেতেছে বজ্র-ধ্বনির ঘোর নিনাদে, চোখ ধাঁধিয়ে দ্বিগুণ সেজে
নাচছে মরুৎ-মেয়ের শিখা; অয়ি তোমার হিরণ্যকেশ
মুক্ত করো, এখন আমার খেলতে যাবার সময় হলো
অন্ধকারে বিদ্যুমৃগের তড়িৎগতি; মরুৎ-মেয়ে
ডাকছে আমায়, অয়ি তোমার সুবর্ণরূপ ঝলসে তোলো
বৃষ্টি নামুক তীব্র ধারায় বিপুল বিশ্বে সান্ধ্যবেলায়।

## ধ্বংস

কালীকৃষ্ণ গুহ

তুমি ধ্বংস চেয়েছো আমার
আমি জানি পথের বন্ধুর
সমগ্রতা নিয়ে আছো তুমি—
সমগ্রতা অনন্য, সুদূর

তুমি আছো নৃতত্ত্বে, পুরাণে
আর সেই সার্বিক নেশায়
যেখানে মৃত্যুর দিক থেকে
হাওয়া আসে, নিঃস্ব দিন যায়

আমি দেখি এই দেশ জুড়ে
বাবলাগাছের সব সারি
রয়ে গেছে পুরাণের মতো—
অদূরে নিদ্রিত ঘরবাড়ি

আজ এই ধ্বংসের সীমায়
তুমিও দাঁড়াও কাছাকাছি
পথের বন্ধুর বার্তা নিয়ে
সলজ্জ নির্বাক আমি আছি

# স্মৃতি, আত্মস্মৃতি

পরিমল চক্রবর্তী

১.

এক-একটা দিন যেন ছন্নছাড়া রূপ নিয়ে আসে।
পরিচিত পরিবেশ, ঘরবাড়ি, দেয়াল কপাট
অদৃশ্য স্বপ্নের টানে দূরে ভেসে যায়।
প'ড়ে থাকে ইতস্তত এলোমেলো মায়াভরা সংসার-কাহিনী।
বড়ো ঘোর জেগে ওঠে আমাদের দূর চেতনায়;
বড়ো মায়া, বড়ো ব্যথা, বড়ো বেদনায়
শৈশবস্মৃতিতে যেন পরিকীর্ণ হ'য়ে ওঠে সমস্ত জীবন।... .

২.

সময়ের ঘেরাটোপ সরালেই সুদূর কৈশোর
পায়ে-পায়ে উঠে আসে ছায়াঘন স্মৃতির সোপানে।
কত যে সহজ সুরে কথা বলে, চুল খুলে বসে—
যেন কোনো ছায়াময়ী মায়াময়ী বয়সিনী নারী।
মুহূর্তে বিগত দিন সিঁড়ি ভেঙে ধীরে উঠে আসে
বর্তমান অস্তিত্বের বিধ্বস্ত সৌধের ভগ্নশিরে;
এবং সমস্ত শোক এক সাথে তীব্র ডুকরে ওঠে
বুকের আঁধারলোকে; যেন কোন নীলকণ্ঠ পাখি
পথ ভুলে এসে ফের উড়ে যায় অনন্ত আকাশে॥... ...

# এবং তুমি

শান্তিকুমার ঘোষ

নদী তোমাকে দিয়েছে নাম,
বাতাস দিল পদবী,
মেঘ গড়ল দেহ,
আর অগ্নিশিখা
দিল জাগিয়ে আত্মা।

তুমি সেই নদী,
মেঘ তুমি,
এবং তুমি অগ্নি,
আর তুমি
আমার স্বপ্নের ছুটে-আসা হাওয়া।

পাহাড়ের ওপারে নদী,
চূড়ার ঊর্ধ্বে মেঘ,
আর হাওয়া সময়ের শুরু থেকে;
এবং ভিতরে জাগরূক অগ্নি।

ছায়া না, নয় প্রতিধ্বনি
ধ্বংসস্তূপে নাচছে অপ্সরী॥

# রক্তাভ বিকেলে

দেবী রায়

ক্রুদ্ধ মৌমাছির গোঁ নিয়ে যে বাতাস ছুটে আসে
তার সর্বাঙ্গে হিংসার আঁচ—
অবিরাম মেঘের কুটিল ঘোরাফেরা, এ সেই লক্ষণ
যাতে বোঝা উচিত—আকস্মিক বিস্ফোরণ
ঐ আসে—ঐ সৌভাগ্যের বৃষ্টি!
আমি টের পাই, সেই শোরগোল—সেই প্রেত-নৃত্যের
মাঝ বরাবর পা চালিয়ে যেতে যেতে দেখি, চোখ তুলে :
মেঘ-বরণ স্বচ্ছ, দুর্লভ সব পরী উড়ছে—জলের ট্যাঙ্ক—
গাছের মাথা ছাড়িয়ে—তবু, কে ঐ রক্তাভ
বিকেলের মুখে
এ্যালমিনিয়াম-ছাই রেখেছে ছড়িয়ে।

# মনখারাপের গাছ

মিতি মুখোপাধ্যায়

কোথায় যেন মনখারাপের গাছ থাকে, যার বীজ
শিমুলতুলোর মতো ফেটে উড়ে যায় বাতাসে
ভাসতে ভাসতে যেখানে পড়ে
সেখানে গজিয়ে ওঠে আরেকটা মনখারাপের গাছ
আবার তার বীজ ফাটতে
অন্য একটা মনে সেরকম গাছ
সেখান থেকে আবার.....

ক্রমে জন্ম নেয় গভীর একটা অরণ্য মনখারাপের
আশেপাশে পাহাড় এবং নদী নয়নাভিরাম থাকাতে
শহর থেকে ছুটে আসে ভিডিও কোচের লাক্সারি বাস
আসে সুবেশ নরনারী
আসে প্রেমিক-প্রেমিকা
পিকনিক চলে উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত একটা দিন
মনখারাপ ভুলে গাছেরা তখন মত্ত হয় ব্রেকডান্সে।

সন্ধ্যের পর চাঁদ উঠলে গাছেরা অবাক হয়ে দ্যাখে
ওদের মনখারাপগুলো শুষে নিয়ে
চাঁদ যেন নীলকণ্ঠ হয়েছে।

# শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা ও পশ্চিমবঙ্গ

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন হয় মানুষের, মনুষ্যেতর প্রাণীর নয়। এর কারণ, প্রাণিজগতে একমাত্র মানুষেরই আছে প্রখর ধীশক্তি, ভাল-মন্দ বিচারের নৈতিক ক্ষমতা এবং উদাম ও অধ্যবসায়। তার এই অনন্য সামর্থ্যের মধ্যেই নিহিত আছে তার মনুষ্যত্ব এবং যত এই সামর্থ্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটে ততই বিকশিত হয়ে ওঠে তার মনুষ্যত্ব। শিক্ষা হল সেই আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া যা মানুষের এই শক্তি ও সামর্থ্যের অনুশীলন ও প্রয়োগের সুযোগ করে দেয়। এইজন্যই শিক্ষাকে গণ্য করা হয় মনুষ্যত্ব অর্জনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসাবে। আবার শিক্ষা নিরন্তর মানুষকে অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোয় নিয়ে আসে যার ফলে তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সামর্থ্য উন্নত হয়ে ওঠে। এইভাবেও শিক্ষা মানুষ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। মনুষ্যত্ব ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম হিসাবে শিক্ষার এই পরিচিতি ব্যাপক স্বীকৃতি পেয়েছে ভারতবর্ষের চিরায়ত ঐতিহ্যে। সনাতন ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে এই বাণী প্রচারিত হয়েছে যে শিক্ষা কোনও বৈষয়িক স্বার্থ পূরণের জন্য নয়, তার মূল উদ্দেশ্য হল মানুষের আত্মোন্নতির ও আত্মবিকাশের পথ প্রশস্ত করা যাতে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ চরিত্রে ও মননে বিশিষ্টতা অর্জন করতে পারে। স্বভাবতই এই শিক্ষার সঙ্গে কোনও আর্থিক লেনদেনের সম্পর্ক ছিল না। শিক্ষার দাতা ও গ্রহীতা উভয় পক্ষই শিক্ষাকে গ্রহণ করতেন এক নিষ্কাম তপশ্চর্যা হিসাবে। তবে এই শিক্ষা স্বাভাবিক কারণেই আবদ্ধ ছিল সমাজের এক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে। সাধারণ মানুষ শিক্ষাকে সম্ভ্রমের চোখে দেখলেও তা ছিল তাদের অনেকেরই নাগালের বাইরে।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার আগে পর্যন্ত এ দেশে শিক্ষার চরিত্র ও চেহারা ছিল মোটামুটি এইরকম। ইংরেজ শাসক এদেশে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন করেছিল মূলত নিজেদের স্বার্থে। তবে এই শিক্ষার পরিণামে দেশের মানুষের সঙ্গে পশ্চিমের উন্নত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পরিচয় ঘটে এবং শিক্ষা সুনির্দিষ্ট এক গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে। এই সুফলের পাশাপাশি ক্ষতি যা হয় তা এইরকম: প্রথমত, ভারতীয় শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্যমুখী হয়ে পড়ে। ফলত ভারতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্য বিদায় নেয় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার পরিণামে উদ্ভব হয় চাকুরিজীবী শ্রেণীর এবং যত এই শ্রেণী স্ফীত হতে থাকে ততই শিক্ষাক্ষেত্রে মনুষ্যত্ব ও বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যটি গৌণ হয়ে পড়ে, অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে বৈষয়িক স্বার্থের দ্বারা। তৃতীয়ত, ইংরেজ প্রবর্তিত ব্যবস্থায় উদ্ভূত শিক্ষিত শ্রেণী সামাজিক কৌলীন্য ও পদমর্যাদার বিচারে নিজেদের ওপরতলার মানুষ বলে ভাবতে শুরু করে এবং এইভাবে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে গড়ে ওঠে এক দুর্ভাগ্যজনক সামাজিক ব্যবধান।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বিদেশি শাসকের স্বার্থরক্ষার দায় থেকে মুক্ত হয়। স্বভাবতই এখন শিক্ষাকে এক স্বতন্ত্র চরিত্র ও কাঠামো দেওয়ার সুযোগ আসে এবং দেশ ও জাতির নিজস্ব ও জরুরি প্রয়োজন মেটানোর কাজে শিক্ষাকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও সমস্ত বাধা অপসারিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে প্রায় উনপঞ্চাশ বছর আগে। এই দীর্ঘ সময় একটা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার নিজস্ব



চরিত্র অর্জনের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের বিষয়গত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং জাতীয় ঐতিহ্যকে যথোপযুক্ত স্বীকৃতি দিয়ে তার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে আমন কথা বলা যায় না। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি শিক্ষা নিয়ে কোনও চিন্তা-ভাবনা করেনি অথবা শিক্ষার উন্নতিকল্পে কোনও ইতিবাচক উদ্যোগ নেয়নি এমন কথাও বলা যায় না। গত পাঁচ দশকে নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এবং গ্রামাঞ্চলও এখন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত নয়। তা ছাড়া দেশে স্ত্রীশিক্ষার হারও এখন বহুগুণ বেড়েছে। দেশে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দুশো বাইশ, কলেজ রয়েছে দশ হাজার এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের সম্মিলিত সংখ্যা কয়েক লক্ষ। আবার শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে উদ্যোগ-আয়োজনও কিছু কম হয়নি। শিক্ষার নীতি ও কাঠামো স্থির করার জন্য একটার পর একটা কমিশন তৈরি হয়েছে এবং তাদের প্রতিবেদনে পরিবেশিত হয়েছে শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক গুরুগম্ভীর মতামত। তথাপি শিক্ষা আমাদের দেশে আজ নিতান্তই এক যান্ত্রিক ও গতানুগতিক প্রক্রিয়া। তার সঙ্গে জীবনের কোনও যোগ নেই, সামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে তার কোনও সঙ্গতি নেই এবং সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ কী সে সম্পর্কে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষানিয়ামক কারুরই কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। এই অবস্থা দেখা দিয়েছে কয়েকটি কারণে। প্রথমত, ইংরেজ আমলে যে পাশ্চাত্যমুখী শিক্ষার প্রচলন ছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তার কোনও মৌলিক পরিবর্তন করা হয়নি। একথা কেউ ভেবে দেখেননি যে পশ্চিমের প্রাগ্রসর দেশের বিষয়গত অবস্থায় যে শিক্ষা সার্থক হতে পারে ভারতবর্ষের মতো এক দরিদ্র, অনুন্নত দেশে তা সাফল্য লাভ করতে পারে না। তা ছাড়া জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যে কোনও গুরুত্ব না দিয়ে পশ্চিমের অনুকরণে শিক্ষাব্যবস্থা নির্মিত হলে তাতে শিক্ষা যে প্রগতির সহায়ক হয় না এ দিকটাও কেউ ভেবে দেখেননি। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমের মতো আমাদের দেশেও শিক্ষাকে এক মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে যার ফলে মনুষ্যত্ব অর্জন যে শিক্ষার অন্যতম অন্তিম লক্ষ্য সে কথাটা আজ ভুলেও কখনও ভারতবর্ষের কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উচ্চারিত হয় না। তৃতীয়ত, যে কোনও বিষয়ের উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনায় সর্বাগ্রে সঠিকভাবে অগ্রাধিকার নির্ধারণ অতীব জরুরি। আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণেতারা এ ব্যাপারেও একেবারে গোড়াতেই মস্ত বড় ভুল করে ফেলেন। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার মূল ভিত হল প্রাথমিক শিক্ষা। এই স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট সবল না হলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোটাই নড়বড়ে হয়ে পড়ে। তা ছাড়া দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিল নিরক্ষর এবং স্বাধীনতার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও দেশবাসীর পঁয়ত্রিশ শতাংশ নিরক্ষর। এই পরিস্থিতিতে দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে বেশি নজর দেওয়া উচিত ছিল শিক্ষার গোড়ার দিকে, অর্থাৎ, প্রাথমিক স্তরে। কিন্তু শিক্ষাপ্রণেতারা হেঁটেছেন উলটো পথে। তাঁরা শুরু থেকেই বেশি জোর দিয়েছেন উচ্চশিক্ষায় যে কারণে যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মতো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গজিয়েছে এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণের হারও অনেক বেড়েছে। কিন্তু এই উচ্চশিক্ষা আজ যে ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা একেবারেই মজবুত নয়। এর ফলে একদিকে যেমন শিক্ষার নিচের দিকটা অবহেলিত রয়ে গেছে অন্যদিকে তেমনই অশক্ত ভিতের কারণে উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত গুণগত মানোন্নয়নও সম্ভব হয়নি। সব শেষে এটাও উল্লেখ করা দরকার যে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত ছিল তা তাঁরা নিতে পারেননি। স্বাধীনতার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ অর্থ মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ৩·৬ শতাংশ।

## দুই

সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে শিক্ষার অবস্থা যখন এই তখন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে শিক্ষার সামগ্রিক ছবিটি একেবারে অন্যরকম হবে এমন আশা করাটা অন্যায়। তথাপি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনার অবকাশ আছে। কারণ শিক্ষা সংবিধানের যুগ্ম তালিকায় থাকায় রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ চরম নয়। স্বভাবতই শিক্ষা সম্পর্কিত পরিবর্তন বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার অধিকার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রয়েছে। এ ছাড়া, শিক্ষাক্ষেত্রে অন্তত একটি ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের সব রাজ্য থেকেই এগিয়ে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষাখাতে বছরে যে টাকা খরচ করেন তা বাজেট-বরাদ্দ অর্থের প্রায় সাতাশ শতাংশ। এর অর্থ এই যে শিক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বরাদ্দ অর্থ মোট জাতীয় আয়ের প্রায় এগারো শতাংশ। এটি শুধু সর্বভারতীয় রেকর্ডই নয়, একই সঙ্গে বিশ্বরেকর্ডও। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের গোটা শিক্ষাব্যবস্থার প্রায় সব আর্থিক দায়-দায়িত্বই নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে আজ প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব শ্রেণীর শিক্ষকেরই বেতন যথেষ্ট ভাল। তাঁদের চাকুরির নিরাপত্তা সুরক্ষিত এবং তাঁদের জন্য অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সব তথ্য এ কথাই প্রমাণ করে যে শিক্ষা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদাসীন নন এবং শিক্ষার উন্নতিকল্পে তাঁরা সাধ্যমতো চেষ্টা করছেন। বস্তুত, এই চেষ্টার ফলে পশ্চিমবঙ্গে গত দুই দশকে যে শিক্ষার

উল্লেখযোগ্য পরিমাণগত উন্নয়ন ঘটেছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। বামফ্রন্ট শাসনের প্রথম পনেরো বছরে নতুন করে স্থাপিত হয়েছে ১০,০৮০টি প্রাথমিক স্কুল, ৫৬৯টি মাধ্যমিক স্কুল, ৮৭৯টি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল, ৮৭টি কলেজ এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয়। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে রাজ্যের আওতায় থাকা ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রায় ৩১৫টি কলেজ, দশ হাজারের ওপর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুল এবং পঞ্চাশ হাজারের ওপর প্রাথমিক বিদ্যালয়। আবার বামফ্রন্ট শাসনের প্রথম পনেরো বছরে ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে প্রাথমিক স্তরে ৮০ শতাংশের বেশি, মাধ্যমিক স্তরে ১৭ শতাংশ, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ৩৭০ শতাংশ এবং কলেজ স্তরে ৫০ শতাংশ। শিক্ষার এই পরিমাণগত উন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানোন্নয়ন সুনিশ্চিত করার উপায় নির্ধারণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯১ সালে শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন এবং এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালের অগস্ট মাসে। অতঃপর পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষা কমিশনের অধিকাংশ সুপারিশই গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষের কোনও লক্ষণ আজও পর্যন্ত দেখা যায়নি। ভারতবর্ষের অন্যত্র যেমন পশ্চিমবঙ্গেও তেমনই শিক্ষা আজও এক রুটিনসর্বস্ব, প্রাণহীন, যান্ত্রিক প্রক্রিয়া।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার এই দুরবস্থার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রথমেই যে কথাটা বলা দরকার তা হল এই যে শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ বজায় রাখার প্রথম শর্ত হল যথোপযুক্ত পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করা। দুর্ভাগ্যক্রমে গত দুই দশকে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রায় কিছুই হয়নি। শিক্ষার পিছনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন বটে, কিন্তু স্কুলশিক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দ অর্থের প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দ অর্থের আশি শতাংশ খরচ হয়ে থাকে শুধু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতন দিতে। অতঃপর যে সামান্য টাকা অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন কতটা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। পরিকাঠামোর ব্যাপারে সবচেয়ে পিছিয়ে আছে প্রাথমিক শিক্ষা। পশ্চিমবঙ্গে যে একান্ন হাজার প্রাথমিক স্কুল আছে তাতে গড় হিসাবে প্রতি স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা দুই-য়ের বেশি নয়। অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, প্রাথমিক শিক্ষকদের আয়ের অন্য উৎস থাকায় শিক্ষকতার কাজটা তাঁরা আংশিক সময়ের কর্মীর মানসিকতা নিয়ে করে থাকেন। এছাড়া স্কুলবাড়ির দৈনাদশা এবং প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের চরম অভাব এ রাজ্যে সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার দুই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই প্রতিকূল পরিবেশে শিশুরা যে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে তার পাঠক্রম তাদের আকর্ষণ করার মতো সহজ, সরল ও আনন্দঘন নয়। বস্তুত, পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সত্তর শতাংশ শেষ পর্যন্ত পড়া ছেড়ে দেয় শুধু দারিদ্র্যের কারণে নয়। শিক্ষার অনুন্নত পরিবেশ ও নিরানন্দ পাঠক্রমের কারণেও। মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থাও প্রায় একই রকম। অধিকাংশ মাধ্যমিক স্কুলেই উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই এবং মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সরকার কোনও দায়িত্বও নিতে পারেন না। এ রাজ্যের কলেজগুলি প্রতি বছরই উন্নয়ন খাতে যৎকিঞ্চিৎ অনুদান পেয়ে থাকে, কিন্তু এ ব্যবস্থা মাধ্যমিক স্কুলের ক্ষেত্রে নেই। ফলে একটি স্কুলবাড়ি ভেঙে পড়লেও তা মেরামত করার জন্য কোনও সরকারি সাহায্য পাওয়া যায় না। মাধ্যমিক স্কুলগুলির ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের অবস্থাও তথৈবচ। এই অবস্থার মধ্যে যে স্কুলশিক্ষা চলছে তার মান যে সন্তোষজনক হবে না এতে আর আশ্চর্য কী?

পরিকাঠামোর পাশাপাশি স্কুলশিক্ষায় দ্বিতীয় গুরুতর সমস্যা হল পাঠক্রম এবং এই পাঠক্রমের ভিত্তিতে যাঁরা শিক্ষা দেন তাঁদের ত্রুটিবিচ্যুতি। প্রাথমিক স্তরে যে পাঠক্রম রয়েছে তার পিছনে বিশেষজ্ঞদের চিন্তা-ভাবনা রয়েছে বিস্তর, তথাপি এই পাঠক্রম শিশু শিক্ষার্থীদের আনন্দিত করে না, উৎসাহিত করে না, তাদের কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে না এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ জাগরণে তার কোনও ভূমিকা নেই। পক্ষান্তরে এই পাঠক্রমের পরিণামে শিক্ষার প্রারম্ভিক ধাপেই শিক্ষার্থীদের মনে এই ধারণা জন্মায় যে শিক্ষা নিছক এক যান্ত্রিক প্রক্রিয়া যার সঙ্গে জীবনের কোনও যোগ নেই, যা শুধু ভয়ের সঞ্চার করে এবং যাকে ভালবাসা যায় না। পাঠক্রমের এই সীমাবদ্ধতা অনেকটাই সামলে নেওয়া যেত যদি শিক্ষকেরা শিক্ষাদানে যথেষ্ট যত্নবান হতেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এক আনন্দের পরিমণ্ডল রচনায় তৎপর হতেন। কিন্তু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে শিক্ষকদের সে মানসিকতা নেই। অবশ্য স্কুলে স্কুলে যে সামান্য-সংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন তাঁদের নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে কখনই একটা আদর্শ ব্যবস্থা করে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু যাঁরা আছেন তাঁদেরও কোনও ইতিবাচক উদ্যম নেই। তাঁরা সকলেই মূলত চাকুরিজীবী, মাসান্তে যথাসময়ে বেতন পাওয়ার ব্যাপারে তাঁদের যতটা আগ্রহ আছে নিজেদের কাজটা যথাসম্ভব ভালভাবে করার ব্যাপারে সে আগ্রহের ভ্যাংশও দেখতে পাওয়া যায় না। ফলত প্রাথমিক শিক্ষার পিছনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বছরে যে প্রায় সাতশো কোটি টাকা ব্যয় করছেন তা দিয়ে এ রাজ্যে শিক্ষার বনিয়াদ মজবুত হচ্ছে একথা কোনও মতেই বলা যাচ্ছে না।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রমের বোঝা ভয়ঙ্কর রকমের ভারি। এই পাঠক্রম দেখলে বোঝা যায় যে পাঠক্রম-প্রণেতারা চেয়েছেন যে মাধ্যমিক স্তরে ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানের



বিভিন্ন শাখা সহ নানা বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটুক যাতে বহুমুখী জ্ঞান অর্জন করে তারা নিজেদের চিন্তাশক্তিকে সমৃদ্ধ করতে পারে। পাশাপাশি উচ্চমাধ্যমিকের পাঠক্রমে তাঁরা ব্যাপকতা এনেছেন এই উদ্দেশ্যে যে এতদ্বারা যেন সাম্মানিক স্তরের কলেজ-শিক্ষার পোক্ত ভিত তৈরি হয়ে যায়। উদ্দেশ্য খুবই মহৎ, সন্দেহ নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পাঠক্রম প্রণেতারা একটা আদর্শ ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখেছেন, তাঁরা বাস্তব, বিষয়গত অবস্থা বিবেচনা করে দেখেননি। তাই দুর্বল প্রাথমিক শিক্ষার গর্ভ থেকে যে স্কুলশিক্ষার্থীরা বেরিয়ে আসে তাদের গ্রহণযোগ্যতা যে খুবই সীমাবদ্ধ এ কথাটা তাঁরা ভেবে দেখেননি। দ্বিতীয়ত, তাঁদের প্রণীত পাঠক্রমের সার্থক রূপায়ণের জন্য যে উন্নত মানের পরিকাঠামোর প্রয়োজন তা যে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ স্কুলে নেই এবং এই পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য অর্থের জোগান দেওয়া যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাধ্যের বাইরে এ কথাটাও তাঁরা মনে রাখেননি। তৃতীয়ত, তাঁরা খেয়াল রাখেননি যে তাঁদের তৈরি পাঠক্রমের সফলতা অনেকাংশেই নির্ভর করে যত্নশীল, দায়িত্বশীল ও নিষ্ঠাবান শিক্ষকদের ওপর, যাদের আজ বড়ই অভাব পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে। বস্তুত, যে ফাঁকিবাজি আজ সমাজের সর্বস্তরের কর্মীদের গ্রাস করেছে স্কুলশিক্ষকেরা তা থেকে মুক্ত নন। কাজেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে প্রচলিত সিলেবাসের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো ইচ্ছা ও আগ্রহ তাঁদের নেই। এই পরিস্থিতিতে যা অনিবার্য তা-ই ঘটেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা এখন স্কুলে যায় নিতান্ত রুটিন মানার জন্য, লেখাপড়ার জন্য তাদের প্রায় একশো শতাংশই নির্ভর করে প্রাইভেট টিউটরের ওপর। আবার প্রাইভেট টিউটরের সাহায্যে তারা নির্ধারিত পাঠক্রম যথাযথভাবে আয়ত্তে আনে এ কথা ভাবাও ভুল। আসলে প্রাইভেট টিউটরের সহায়তায় তারা রপ্ত হয় প্রশ্নোত্তরের দক্ষতায়। অর্থাৎ, পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে সমাক জ্ঞান আহরণ তাদের কাছে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। প্রশ্ন বাছাই করে সেগুলির উত্তর তৈরি করে তার মাধ্যমে পরীক্ষায় ভাল ফল করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গে স্কুলশিক্ষা আজ প্রশ্নোত্তরভিত্তিক শিক্ষায় পরিণত হয়েছে। এই প্রশ্নোত্তরভিত্তিক শিক্ষায় সাফল্যের তকমা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা যখন উচ্চশিক্ষা নিতে আসে তখন তার পরিণাম কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। অতএব সঙ্গতভাবেই বলা যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গে আজ উচ্চশিক্ষার যা কিছু দুর্গতি তার অন্যতম কারণ হল স্কুলশিক্ষার ব্যর্থতা। স্কুলশিক্ষা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত করে তুলতে পারছে না যে কারণে কলেজে কলেজে যারা ডিগ্রি লাভের আশায় ভিড় করছে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশেরই উচ্চশিক্ষা লাভের যোগ্যতা নেই। অবশ্য এই ভিড় শুধু ডিগ্রির মোহে নয়, এর পিছনে রয়েছে আর্থ-সামাজিক কারণও। গত দুই দশক ধরে এ রাজ্যে বেকারের সংখ্যা শুধু বেড়েই চলেছে। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা প্রায় সাতান্ন লক্ষ এবং অদূর ভবিষ্যতে এই ভয়াবহ অবস্থার কোনও পরিবর্তন হবে এমন কোনও আশার আলোও দেখা যাচ্ছে না। এমত্যবস্থায় স্বাভাবিক ভাবেই ছেলে মেয়েরা উচ্চশিক্ষা নিতে আসে চাকুরির আশায়। স্কুলশিক্ষান্তে কোনও না কোনও ধরনের কাজ পাওয়ার সুযোগ যদি তাদের থাকত তাহলে তাদের অনেকেই উচ্চশিক্ষা নেওয়ার জন্য ব্যাকুল হত না। উচ্চশিক্ষা তার নিজের গুণগত উৎকর্ষের জোরে এই চাকুরিজীবী শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতায় পরিবর্তন আনবে সে আশাও অমূলক। কারণ অন্যান্য স্তরের শিক্ষার মতো এ রাজ্যে উচ্চশিক্ষার পরিকাঠামোও সাধারণভাবে খুবই অনুন্নত ও দুর্বল, তার পাঠক্রমের সঙ্গে জীবনের প্রায় কোনও যোগ নেই বলে তা শিক্ষার্থীদের মনে আগ্রহের সঞ্চার করে না, তার প্রাণহীন, উদ্দেশ্যহীন পরীক্ষাব্যবস্থা নিতান্ত এক যান্ত্রিক আচারে পরিণত হয়েছে এবং উচ্চশিক্ষার সঙ্গে জড়িত শিক্ষককুল শিক্ষাব্রত বিস্মৃত হয়ে পেশাজীবীতে পরিণত হয়েছেন।

## তিন

শিক্ষার বিভিন্ন স্তর থাকলেও শিক্ষা মূলত একটি অখণ্ড ব্যবস্থা। কাজেই পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার উন্নয়নে বিচ্ছিন্নভাবে উদ্যোগ নিলে তাতে কখনই সামগ্রিক সাফল্যলাভ সম্ভব নয়। বস্তুত, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে শত চেষ্টা সত্ত্বেও যে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা যাবে না এ ইঙ্গিত আগেই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে রাজ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানোর জন্য যে ব্যাপক পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রয়োজন তার জন্য চাই বিপুল পরিমাণ অর্থ। স্কুলে বছরে একবার উন্নয়ন ফি আদায় করে এই টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব নয় কারণ তা হবে নিতান্তই সিন্ধুতে বিন্দুর মতো। আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষেও এই অর্থের জোগান দেওয়া সম্ভব নয় কারণ শিক্ষাখাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যয়ক্ষমতা সাধ্যসীমার শেষ বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছেছে। কাজেই ইচ্ছা থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের স্কুলশিক্ষায় রাতারাতি পরিবর্তন আনা যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থাগমের নতুন নতুন উৎস খুঁজে বের করা সম্ভব না হচ্ছে এবং স্কুলশিক্ষায় বেসরকারি উদ্যোগের ভূমিকার পুনর্মূল্যায়ন করে নতুন পথের সন্ধান না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত স্কুলশিক্ষা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে, সেখানে নতুন কিছু করা সম্ভব হবে না। তবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, বোধ হয়, শিক্ষাসংস্কারের কাজটা এখনই শুরু করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, স্কুলশিক্ষার সার্বিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন না হলে

এই সংস্কার পূর্ণাঙ্গ হবে না। কিন্তু স্কুলশিক্ষায় স্থিতাবস্থা (given situation) মেনে নিয়েও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব যাতে উচ্চশিক্ষার চরিত্রগত পরিবর্তন আনা যায়। এটা সম্ভব প্রথমত এই কারণে যে পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষার পরিকাঠামো যথোপযুক্ত না হলেও স্কুলগুলির তুলনায় কলেজগুলির পরিকাঠামো অনেকটা ভাল এবং ঐতিহাসিক কারণে কোনও কোনও কলেজের (যেমন প্রেসিডেন্সি কলেজ) পরিকাঠামো খুবই ভাল। দ্বিতীয়ত, স্কুলগুলির উন্নয়ন খাতে সরকারের কোনও অর্থ বরাদ্দ থাকে না, কিন্তু কলেজগুলি উন্নয়ন খাতে প্রতি বছরই রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কমবেশি টাকা পেয়ে থাকে। তাছাড়া উচ্চশিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও নানা ভাবে কলেজগুলিকে আর্থিক সাহায্য করে থাকে। স্বভাবতই আশা করা যায় যে রাজ্যস্তরের উচ্চশিক্ষায় উৎকর্ষ অর্জনের জন্য যদি নতুন কোনও প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তাহলে এ ব্যাপারে প্রয়োজনে অতিরিক্ত আর্থিক সাহায্যদানে মঞ্জুরি কমিশন গররাজি হবে না। তৃতীয়ত, স্কুলশিক্ষার তুলনায় কলেজশিক্ষা সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে এই অর্থে যে শিক্ষাসংস্কার সংক্রান্ত কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য কয়েকটি স্কুলকে বেছে নেওয়া সম্ভব নয় কারণ স্কুলের স্বাতন্ত্র্য (autonomy) সম্পর্কিত কোনও নীতি এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে গৃহীত হয়নি। পক্ষান্তরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অটোনমাস কলেজ ও ডিম্‌ড ইউনিভার্সিটির প্রয়োজনীয়তা নীতিগতভাবে স্বীকার করে নিয়েছে এবং সারা দেশে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু অটোনমাস কলেজ ও ডিম্‌ড ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (পশ্চিমবঙ্গেও একটি ডিম্‌ড ইউনিভার্সিটি কয়েক বছর ধরে চলছে)। কাজেই পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষার আমূল সংস্কার করে তা প্রয়োগের জন্য আপতত কয়েকটি কলেজকে অটোনমাস কলেজ করে এবং সবচেয়ে অগ্রবর্তী কলেজটিকে (অর্থাৎ, যেখানে স্নাতকোত্তর শিক্ষার পরিকাঠামো রয়েছে) ডিম্‌ড ইউনিভার্সিটিতে রূপান্তরিত করে অবশ্যই এগোনো যেতে পারে। অবশেষে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই সংস্কারের প্রকল্প সফল হলে তখন তা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে সমগ্র রাজ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টান্তের দ্বারা তখন অনুপ্রাণিত হতে পারে সারা দেশ। পরবর্তী অংশে এ রাজ্যের উচ্চশিক্ষার পরিবর্তন ও উন্নয়ন-সম্পর্কিত পরিকল্পনার যে রূপরেখা পেশ করা হচ্ছে তাকে বিচার করতে হবে এই প্রেক্ষাপটে।

## চার

এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষার অবস্থাটা ঠিক কী তা বোঝা যাবে একটিমাত্র ঘটনা থেকে। ১৯৯৪ সালে কলেজ-অধ্যাপকের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথম 'স্লেট' (State Level Eligibility Test) অনুষ্ঠিত হয় কলেজ সার্ভিস কমিশনের উদ্যোগে। এই পরীক্ষায় বসার সুযোগ পেয়েছিলেন শুধু তাঁরাই যাঁরা এম এ বা এম এস সি পরীক্ষায় ৫৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছেন। অর্থাৎ, কেবল প্রথম সারির ছাত্রছাত্রীরাই ছিলেন পরীক্ষার্থী। কিন্তু ফলাফল বেরোলে দেখা গেল যে সাফল্যের হার মাত্র ১৭ শতাংশ। এর অর্থ একটাই: উচ্চশিক্ষা এ রাজ্যে ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রি দিচ্ছে, কিন্তু তাদের শিক্ষা দিতে পারছে না। ফলত এক ব্যাপক আনুষ্ঠানিক আয়োজন সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষার্থীরা পঠিতব্য বিষয় সম্পর্কে নিদারুণভাবে অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে। যে উচ্চশিক্ষার পিছনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বছরে প্রায় তিনশো কোটি টাকা ব্যয় করছেন তার এই শোচনীয় ব্যর্থতা সঙ্গত কারণেই মেনে নেওয়া যায় না। কাজেই উচ্চশিক্ষার হাল ফেরানোর কাজটা এ রাজ্যে আজ খুবই জরুরি। তবে এ ব্যাপারে করণীয় কী তা স্থির করার আগে যে বিষয়গত অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা চলছে তার দিকে একটু নজর দেওয়া দরকার।

এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই যে কথাটি উল্লেখ করা দরকার তা হল এই যে দেশের অন্যত্র যেমন পশ্চিমবঙ্গেও তেমনই সনাতন ভারতবর্ষের শিক্ষাদর্শ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত। পশ্চিমবঙ্গে আজ যারা উচ্চশিক্ষা নিতে আসে তাদের আদর্শ 'বুনো রামনাথ' নয়, অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন তাদের লক্ষ্য নয়, তাদের লক্ষ্য চাকুরি ও কেরিয়ার। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে আনুষ্ঠানিকভাবে উচ্চশিক্ষা শেষ করেও তাদের অনেকেই চাকুরি পায় না অথবা এই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে কেরিয়ার গড়বার কোনও সুযোগ পায় না। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা এর মূল কারণ, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও অস্বীকার করা যায় না যে উচ্চশিক্ষার পাঠক্রমের সঙ্গে জীবনের তথা সামাজিক প্রয়োজনের কোনও যোগসূত্র নেই বলে অনেক সময়েই চাকুরির বাজারে উচ্চশিক্ষার ডিগ্রির কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকে না এবং একই কারণে লব্ধ উচ্চশিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগের ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে কেরিয়ার গড়ার কোনও অবকাশ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য সরকারের পক্ষে নতুন করে আর কোনও আর্থিক দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয় এ প্রশ্নের উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, অতীতে অধ্যাপকদের বস্তুগত চাহিদা ছিল কম, শিক্ষকতাকে একটা ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে শিক্ষক হিসাবে সাফল্য অর্জনকেই তাঁরা জীবনের পরম প্রাপ্তি বলে মনে করতেন। আজ সামাজিক পরিবেশে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে এবং সেইসঙ্গে অধ্যাপকদের মানসিকতাও বদলে গেছে। তাঁদের বস্তুগত চাহিদা



এখন বিপুল এবং মুখে তাঁরা যা-ই বলুন তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আজ সর্বার্থেই পেশাজীবী। এ সবই হল সমাজব্যবস্থার প্রতিফলন এবং যেহেতু এই সমাজব্যবস্থা রাতারাতি বদলানো সম্ভব নয় সে কারণে উচ্চশিক্ষার এই বিষয়গত অবস্থাকে আপাত-অপরিবর্তনীয় অবস্থা হিসাবে ধরে নিয়েই আমাদের উচ্চশিক্ষার সংস্কারের কথা ভাবতে হবে।

এই সংস্কার সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রচলিত পাঠক্রমে। পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষার পাঠক্রম যাঁরা প্রণয়ন করেন তাঁরা সকলেই জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দু'টি জিনিস তাঁরা কখনই মনে রাখেন না। প্রথমত, নিজেদের পাণ্ডিত্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন না বলে তাঁরা খেয়াল রাখেন না যে বিষয়গত অবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে পাঠক্রম তৈরি করে কোনও লাভ নেই কারণ তাতে পাঠক্রম সম্পর্কে শিক্ষার্থী কোনও আগ্রহ বোধ করবে না। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমের অনুকরণে পাঠক্রমকে সর্বাধুনিক করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর গ্রহণযোগ্যতার সীমা সম্পর্কে তাঁরা আদৌ সচেতন থাকেন না যার ফলে পাঠক্রম যথেষ্ট মূল্যবান হওয়া সত্ত্বেও অক্ষম শিক্ষার্থীর কাছে তা অর্থবহ হয় না যে কারণে লেখাপড়াটা তার কাছে নিতান্ত এক যান্ত্রিক রুটিন হয়ে ওঠে। বস্তুত, এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গে স্নাতক স্তরের শিক্ষা আজ কার্যত অর্থহীন হয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীরা দেখতে পাচ্ছে যে তাদের পঠিতব্য বিষয়ের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের কোনও সম্পর্ক নেই। পাঠক্রমের ব্যাপ্তি ও জটিলতা দেখেও তারা ভয় পাচ্ছে। ফলত পাঠক্রম যথাযথভাবে আয়ত্ত করার পরিবর্তে তারা শর্টকাটের আশ্রয় নিচ্ছে এবং এই প্রেক্ষাপটেই আজ তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে কোচিংনির্ভর প্রশ্নোত্তরভিত্তিক বিদ্যাচর্চার প্রবণতা। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে উচ্চশিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন কোনও মতেই সম্ভব নয় এবং এইজন্যই বি এ ও বি এস সি পাস কোর্স ও অনার্স কোর্সের পাঠক্রমের আমূল পরিবর্তন আজ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য কথাটা এই যে পশ্চিমবঙ্গে এখন যেসব শিক্ষার্থী পাস কোর্সে বি এ ও বি এস সি পাস করে তারা মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষক হওয়ার যোগ্য বলেও বিবেচিত হয় না এবং যদিও তাদের ভাল যে কোনও চাকুরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসার যোগ্যতা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত তথাপি কার্যক্ষেত্রে তারা এই চাকুরি পায় না কারণ অনার্স গ্র্যাজুয়েট ও এম এ, এম এস সি ডিগ্রিধারীদের সঙ্গে প্রতিস্পর্ধিতায় অনিবার্যভাবেই তাদের পিছু হটতে হয়। বস্তুতপক্ষে, পশ্চিমবঙ্গে আজ বাস্তব অবস্থাটা এই যে পাস কোর্সের গ্র্যাজুয়েটরা যদি আদৌও চাকুরি পায় তাহলে সে চাকুরি হয় সরকারি অফিস-আদালত অথবা বেসরকারি সংস্থার সাধারণ প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য। পাস কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা এই বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন বলেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্দিষ্ট পাঠক্রম আয়ত্ত করার ব্যাপারে তারা কোনও আগ্রহ বোধ করে না, প্রাইভেট টিউটরের সাহায্যে কিছু প্রশ্নোত্তর তৈরি করে তারা পরীক্ষার বৈতরণী পার হয়ে যায়। ফলত পশ্চিমবঙ্গে আজ বি এ, বি এস সি পাস কোর্সের লেখাপড়াটা কার্যত ছেলেখেলায় পরিণত হয়েছে। অথচ স্নাতক স্তরের শিক্ষায় পাসকোর্সের ছাত্রছাত্রীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই যখন পরিস্থিতি তখন পাস কোর্সে গুরুগম্ভীর পাঠক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান দেওয়ার প্রয়াস নিতান্তই নিরর্থক। কাজেই পাস কোর্সের পাঠক্রমের সামগ্রিক পুনর্গঠন করা দরকার এবং এতে দু'টি দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, লক্ষ রাখতে হবে যে বিষয়-সম্পর্কিত জ্ঞান যেন সহজবোধ্য হয় এবং শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক জীবনে বিষয়টির যতটুকু প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা ঠিক ততটুকুই যেন পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া এখন পাস কোর্সে নানা ধরনের ঐচ্ছিক বিষয়ের মধ্যে কয়েকটি বেছে নেওয়ার যে সুযোগ দেওয়া হয় তা উঠিয়ে দিয়ে বি এ ও বি এস সি-র জন্য একটি সমন্বিত (integrated) পাঠক্রমের ব্যবস্থা করা উচিত। এই সমন্বিত পাঠক্রমটি সকলের জন্যই হবে আবশ্যিক এবং বি এ-র জন্য এই পাঠক্রমে থাকবে কলা বিভাগের বিভিন্ন শাখা-সম্পর্কিত তথ্য ও জ্ঞানের চুম্বক আর বি এস সি-র পাঠক্রমে একইভাবে থাকবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে মূল তথ্য ও জ্ঞানের সংক্ষিপ্তসার। দ্বিতীয়ত, সাধারণ প্রশাসনিক কাজকর্মে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় যে ধরনের লেখালেখি করতে হয় সে সম্পর্কে একটি নিবিড় প্রশিক্ষণও বি এ ও বি এস সি পাস কোর্সের পাঠক্রমের আবশ্যিক অঙ্গ হওয়া উচিত। অর্থাৎ, ব্যবস্থাটা এমন করতে হবে যাতে মূল বিষয়ের পাঠ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় চিঠিপত্র, রিপোর্ট, রিভিউ ইত্যাদি লেখার পাঠ নেয় আবশ্যিকভাবে। এ ছাড়া উপযুক্ত পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করে পাস কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের জন্য টাইপ শেখাও আবশ্যিক করা দরকার। এইভাবে পাস কোর্সের পাঠক্রমের চরিত্র ও চেহারা বদলাতে পারলে ছাত্রছাত্রীরা তা যথেষ্ট যত্ন ও মনোযোগ দিয়ে আয়ত্ত করতে সচেষ্ট হবে কারণ তখন তারা বুঝবে যে এই ধরনের লেখাপড়া তাদের ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগবে এবং, বলা বাহুল্য, চাকুরি পেতে সাহায্য করবে।

অবশ্য উচ্চশিক্ষার সবটাই চাকুরিকেন্দ্রিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় কারণ সে ক্ষেত্রে শিক্ষার যে একটা নিজস্ব আদর্শ ও উদ্দেশ্য আছে তা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়। অনার্স স্তরের স্নাতক শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে হবে এই প্রেক্ষাপটেই। এ কথা অনস্বীকার্য যে অনার্স স্তরের লেখাপড়াই হল উচ্চশিক্ষার মূল

স্তব্ধ। আবার পশ্চিমবঙ্গে আজ বাস্তব ঘটনা এই যে যারা অনার্স পাস করে তাদের সকলে এম এ বা এম এস সি পড়ার সুযোগ পায় না। এমতাবস্থায় অনার্স স্তরের শিক্ষাই হল উচ্চশিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য পূরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র। কিন্তু এজন্য চাই এমন পাঠক্রম যা শিক্ষার্থী সহজে গ্রহণ করতে পারে এবং যাতে পঠিতব্য বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের একটা পোক্ত ভিত্তি তৈরি হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এখন অনার্সের যে পাঠক্রম পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে তা যতটা ভারি ততটা অর্থবহ নয়। এর কারণ হল এই যে পাঠক্রমের কাঠামোটাই ত্রুটিপূর্ণ এবং পশ্চিমের অনুকরণে নিত্য নতুন বিষয় পাঠক্রমে সংযোজিত হয়ে তার বোঝা বাড়াচ্ছে, কিন্তু মূল বিষয় সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি সহজ করে তুলে ধরাই যে পাঠক্রমের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই কথাটা খেয়াল রাখছেন না পাঠক্রম-প্রণেতারা। এই জন্যই চাই পাঠক্রমের পরিবর্তন। এই পাঠক্রমকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে একটি বিষয়ের মূল উপাদানগুলি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীরা সমাক অবহিত হতে পারে। একই সঙ্গে এটাও দেখতে হবে যে পাঠক্রম যেন যথেষ্ট হালকা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অনার্স কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের পাস কোর্সের দু'টি বিষয় পড়ার যে প্রথা এখন পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত আছে তা কার্যত অর্থহীন হয়ে পড়েছে। কারণ পাস কোর্সের বিষয়ে শুধু পাস নম্বর পাওয়াটা আবশ্যিক, কিন্তু এই নম্বরের অনার্সের ফলাফল নির্ধারণে কোনও গুরুত্ব নেই। ফলত অনার্স পাঠরত কোনও ছাত্রছাত্রীই পাস কোর্সের বিষয় অধ্যয়নে মনোযোগ দেয় না যে জন্য এই বিষয় সম্পর্কে তারা কিছুই শেখে না অথচ সময়ের অপচয় হয়। আবার পাস কোর্সের পুনর্গঠন সম্পর্কে এই নিবন্ধে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তা কার্যকর করতে হলে অনার্সের ছাত্রছাত্রীদের পাস কোর্স থেকে বিচ্ছিন্ন করা ছাড়া উপায় নেই। কাজেই অনার্স শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে অনার্সের ছাত্রছাত্রীদের বাধ্যতামূলকভাবে পাস কোর্সের বিষয় নেওয়ার বর্তমান নিয়ম তুলে দিতে হবে। পরিবর্তে অনার্সের পাঠক্রমকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে যাতে অনার্সের মূল পাঠ্যবিষয় ভাল করে জানা ও শেখার জন্য অন্যান্য বিষয়ের যে যে অংশ খুবই প্রাসঙ্গিক সেগুলিকে অনার্স বিষয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে অনার্সের প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য একটি সমন্বিত (integrated) কোর্স প্রবর্তন করা যায়। অনার্সে এই সমন্বিত কোর্স হলে একদিকে যেমন শ্রম ও সময়ের অপচয় বন্ধ হবে অন্যদিকে তেমনই অনার্সের মূল বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ রূপ ধরা দেবে শিক্ষার্থীর কাছে।

বিষয়গত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্নাতকোত্তর শিক্ষার পাঠক্রমেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে এখন যারা এম এ, এম এস সি পড়ে তাদের একটা অংশ প্রকৃতই শিক্ষকতায় আগ্রহী। এরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে চায় এবং এদের কেউ কেউ আবার উচ্চতর অ্যাকাডেমিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে চায়। কিন্তু একই সঙ্গে আর একটা বড় অংশ আছে যারা শিক্ষকতায় সত্যিই আগ্রহী নয়। তারা চায় অন্য ধরনের চাকুরি যার জন্য চাই বিশেষ বিশেষ দক্ষতা যা প্রচলিত প্রথাগত স্নাতকোত্তর শিক্ষা স্বভাবতই দিতে পারে না। ফলত উপযুক্ত অ্যাকাডেমিক ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও প্রার্থীরা অনেক সময়েই এই সব চাকুরির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। মনে রাখতে হবে যে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার তুলনায় এই সব চাকুরির সংখ্যা অনেক বেশি এবং আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ যত শিল্পোন্নত হবে এবং এ রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য যত বাড়বে ততই এই সব চাকুরির সুযোগ বাড়বে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে আজ স্নাতকোত্তর শিক্ষার এমন কোনও সুসংগঠিত ব্যবস্থা নেই যাতে সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমেই ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ধরনের প্রয়ুক্তিগত জ্ঞান ও কৌশলের পাঠ গ্রহণ করে সরকারি ও বেসরকারি শিল্পসংস্থায় এবং নানা ধরনের বেসরকারি উদ্যোগে সহজে চাকুরি পেতে পারে। এই পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে পশ্চিমবঙ্গের স্নাতকোত্তর শিক্ষাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এখন যে প্রথাগত স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাতে পরিবর্তন আনার কোন প্রয়োজন নেই। যারা অধ্যাপনা ও অ্যাকাডেমিক গবেষণায় আগ্রহী তারা এখানেই লেখাপড়া করতে পারবে। পাশাপাশি স্নাতকোত্তর শিক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামো আছে এমন কোনও কলেজকে (যেমন প্রেসিডেন্সি কলেজ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য মর্যাদা দিয়ে (স্বতন্ত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেও প্রস্তাবিত উদ্যোগ নেওয়া যায়। কিন্তু তা ব্যয়সাপেক্ষ হবে বলে এই ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে) সেখানে সম্পূর্ণ নতুন এক স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পাঠক্রমের অভিনবত্ব হবে এই শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত বিষয়গুলিকে ভেঙে এবং তাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তৈরি হবে নতুন নতুন বিষয়ের পাঠক্রম। যেমন, শারীরবিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তৈরি হবে নতুন বিষয়, Ergonomics and Industrial Hygiene, পদার্থবিদ্যা ও ভূতত্ত্বকে কেন্দ্র করে তৈরি হবে Exploration: Geophysics, রাশিবিজ্ঞানের সঙ্গে গণিত ও সমাজবিজ্ঞানের কয়েকটি শাখার সমন্বয়ে প্রবর্তিত হবে Demography and Actuarial Science, ইত্যাদি, ইত্যাদি। যেহেতু এইসব বিষয় হবে মূলত চাকুরিকেন্দ্রিক সে কারণে এই শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিল্পসংস্থা ও বেসরকারি উদ্যোগে সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে।



আবার এই ধরনের শিক্ষা প্রবর্তিত হলে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওপর এখন যে প্রবল চাপ রয়েছে তা অনেকটাই কমবে।

তবে পাঠক্রমের কাঠামো ও চরিত্র-বদলই যথেষ্ট নয়। পাঠক্রম যতই অভিনব ও অর্থবহ হোক না কেন, শিক্ষকেরা যদি উদ্যমী ও যত্নশীল না হন তাহলে সমস্ত ইতিবাচক উদ্যোগই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের শিক্ষকই আজ পেশাজীবী, তাঁদের প্রায় কেউই আর শিক্ষাব্রতী নন। যে আর্থ-সামাজিক পরিবেশে তাঁদের মানসিকতার এই পরিবর্তন ঘটেছে তা রাতারাতি বদলানো যাবে না, অতএব তাঁরা পেশাজীবীই থাকবেন। তবে পেশাজীবীরও পেশাগত দক্ষতা ও কর্মনিষ্ঠা থাকে, অন্যথায় তিনি পেশাজীবী হিসাবে সফল হতে পারেন না। কাজেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা পেশাজীবী হিসাবে যখন তাঁদের কর্তব্য পালন করবেন তখন দেখতে হবে যে পেশাজীবীর দক্ষতা ও নিষ্ঠা নিয়েই যেন তাঁরা নিজেদের কাজটা করেন। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষাদান-পদ্ধতির পরিবর্তন। শিক্ষকদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বক্তৃতা পদ্ধতি (lecture method)-এর ওপর নির্ভরশীল। এর কুফল হল যে দিনের পর দিন বক্তৃতা দিতে দিতে শিক্ষণপ্রক্রিয়াটাই অধ্যাপকদের কাছে একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে, অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীরাও শুধু বক্তৃতা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এ ছাড়া এই পদ্ধতির পরিণামে অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা দূরত্বও তৈরি হয় যেহেতু এই দুই পক্ষের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা নেহাতই দাতা ও গ্রহীতার যাদের মধ্যে কোনও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নেই। আবার এই বক্তৃতা পদ্ধতির জন্য অধ্যাপকদের মধ্যে ফাঁকিবাজিও বাড়ছে। কারণ একজন অধ্যাপক মনে করেন যে ক্লাসরুমে কোনওভাবে বক্তৃতার কাজটা শেষ করতে পারলেই তাঁর কর্তব্য শেষ, ছাত্রছাত্রীরা সত্যিই বিষয়টা অনুধাবন করতে পারল কি না, এবিষয়ে তাঁর নিজের ত্রুটিবিচ্যুতি কোথায় এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক অ্যাকাডেমিক কর্মধারায় তিনি যথাযোগ্যভাবে অংশগ্রহণ করতে পারছেন কি না—এ সব জিনিস গতিয়ে দেখার দায়িত্ব তাঁর নয়। ফাঁকিবাজি আসছে এইভাবেই। অন্যদিকে এই ফাঁকিবাজির পরিণামেই ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট কোচিংয়ের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। অধ্যাপকরা তাঁদের নিজেদের কাজটা যদি ঠিকমতো করতেন, অর্থাৎ, তাঁদের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীরা যদি পাঠক্রম যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে পারত তাহলে অবশ্যই তাদের আর প্রাইভেট টিউটরের প্রয়োজন হত না। সঙ্গত কারণেই এই অবস্থার পরিবর্তন চাই এবং এই পরিবর্তন আনতে হলে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শিক্ষণপ্রক্রিয়ায় অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রী উভয় পক্ষই অংশ গ্রহণ করতে পারেন, যাতে দাতা ও গ্রহীতার তথাকথিত সম্পর্ক দূর হয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়ের ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এজন্য বক্তৃতা-পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু বক্তৃতা-পদ্ধতির পরিপূরক হিসাবে আলোচনা-পদ্ধতি (discussion method) প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এই আলোচনা-পদ্ধতি এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে ক্লাসরুমে ও ক্লাসরুমের বাইরে নিরন্তর পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষক নিশ্চিত হতে পারেন যে ছাত্রছাত্রীরা পাঠক্রম সমাক আয়ত্ত করতে পেরেছে এবং অধীত বিষয় সম্পর্কে কোনও ছাত্রছাত্রীর ভুল ধারণা থাকলে তিনি তা সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে দিতে পারেন। আসলে শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াকে মুক্ত করতে হবে কঠিনসর্বস্বতা থেকে, অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রী এই উভয় পক্ষকেই মনে রাখতে হবে যে তাঁরা এক বড় কর্মযজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত ও এই কর্মযজ্ঞের সাফল্যের ব্যাপারে তাঁদের যৌথ দায়িত্ব রয়েছে। এজন্য অধ্যাপকদের অনেকটা সময় দিতে হবে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রক্ষায়। এই কারণেই প্রয়োজন আলোচনা-পদ্ধতির যা যান্ত্রিকতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা দূর করে লেখাপড়ার হার্দ্য পরিবেশ তৈরি করতে পারে অনায়াসেই। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সম্ভব হলে এই আলোচনা-পদ্ধতিকে আরও ফলপ্রসূ করা যেতে পারে অডিও-ভিসুয়াল পদ্ধতির সাযুজ্যে।

শিক্ষাদান-পদ্ধতির পাশাপাশি পরীক্ষার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনাটাও খুব জরুরি। এ রাজ্যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দুই বা এক বছর পরে বড় মাপের যে পাবলিক পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে তার বিশ্বাসযোগ্যতা এখন অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পক্ষে তার পরিচালনাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আবার উচ্চশিক্ষা যে ইদানীং তথাকথিত প্রশ্নোত্তরের অনুশীলনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং ছাত্রছাত্রীরা যে বহুলাংশে প্রাইভেট টিউটরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে তার পিছনেও মূল কারণ এই গতানুগতিক পরীক্ষাব্যবস্থা। স্বভাবতই এই ব্যবস্থার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। তবে লিখিত অন্তিম (terminal) পরীক্ষা একেবারে তুলে দেওয়ার দরকার নেই, এর আকারটা ছোট করা দরকার। যেমন কোর্স শেষ করার পর বরাদ্দ মোট নম্বরের মাত্র কুড়ি শতাংশের ওপর ভিত্তি করে একটি ছোট মাপের কিন্তু সমগ্র পাঠক্রমকেন্দ্রিক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। বাকি আশি শতাংশ নম্বর পাওয়ার ব্যাপারে একমাত্র মানদণ্ড হওয়া উচিত নিরবচ্ছিন্ন অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন। এই অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মূল লক্ষ্য হবে যাচাই করে দেখা যে ছাত্রছাত্রীরা তাদের পাঠ্যবিষয় প্রকৃতই আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা। বলা বাহুল্য, সাবেকি প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে এই যাচাই সম্ভব নয়। কাজেই অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের প্রধান প্রধান অঙ্গ

হবে আলোচনা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ, মৌখিক প্রশ্নের উত্তরদান, বছরে কয়েকটি টার্ম পেপার তৈরি করা, অধ্যাপক-নির্দিষ্ট লাইব্রেরি ওয়ার্ক সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন এবং বছরে অনেকগুলি ছোট ছোট লিখিত পরীক্ষা এমনভাবে নেওয়া যাতে শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞানের পরিমাণ প্রকৃতই যাচাই করা যায়।

এসব কিছু এখনই ব্যাপক হারে প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। অথচ উচ্চশিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের কাজটা আজ পশ্চিমবঙ্গে খুবই জরুরি। কাজেই কয়েকটি উন্নত মানের কলেজ বেছে নিয়ে উচ্চশিক্ষার সার্বিক পরিবর্তনের কাজটা এখনই শুরু করা দরকার এবং এ জন্য এই কলেজগুলিকে যতটা স্বাতন্ত্র্য দেওয়া দরকার তা দিতে আপত্তি করা উচিত নয়। এই স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপারে সুপারিশ আছে ভবতোষ দত্ত কমিশনের এবং অশোক মিত্র কমিশন উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষ অর্জনের স্বার্থে স্বাতন্ত্র্যের বিরোধিতা করেননি। অতএব পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আজ এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে। সারা দেশেই আজ উচ্চশিক্ষার চরম দুরবস্থা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অনেকাংশেই ডিগ্রি তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে যদি আজ উচ্চশিক্ষার সার্বিক পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয় তাহলে তাতে সুনাম বাড়বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরই এবং সারা দেশের মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে অন্তত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালি পথিকৃতের ভূমিকা নিতে পারে। অতএব "জড়তা হতে নবীন জীবনে নূতন জনম" লাভের উদ্যোগ শুরু হোক পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষায়। □

'...Nation state এর মতাদর্শ ঘুঁকছে, কিন্তু আমাদের ঘাড় থেকে নামতে চাইছে না।' — কাশ্মীর সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই বক্তব্যকে বিশদ করে লেখা শ্রী অমিতাভ চৌধুরীর (শ্রীনিরপেক্ষ) প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবে চতুরঙ্গের আগামী সংখ্যায়। বক্তব্যটি তাঁরই মুদ্রিত ভাষণ 'এ রথ অযুত বিদ্রোহ পার হবে' — থেকে উদ্ধৃত।

প্রবন্ধটি বর্তমান সংখ্যায় ছাপা সম্ভব হল না বলে আমরা দুঃখিত।

আগামী সংখ্যায় থাকছে সংযুক্ত সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র ভেঙে একাধিক Nation State-এর উদ্ভবের পটভূমি নিয়ে অন্য একটি তথ্যনির্ভর ও বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধ।

অধ্যাপক বিনয় চৌধুরীর ধারাবাহিক সন্দর্ভ 'ঔপনিবেশিক পূর্বভারতে হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক' — থাকছেই।

# বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বৃত্তিশিক্ষা : কিছু ভাবনা

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উচ্চশিক্ষা বলতে আমরা সাধারণত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পঠনপাঠনকে বুঝি। যে-কোন শিক্ষার মতো এই স্তরের শিক্ষারও মূল উদ্দেশ্য হল স্বামী বিবেকানন্দ যাকে বলেছেন মানুষ তৈরি করা, মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো, জ্ঞানবর্তিকার স্নিগ্ধ আলোয় মানবসমাজকে দ্যৌত-স্নাত করা। একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় এসে অবশ্য মনুষ্যত্বের ধারণা সামান্য সংকুচিত হয়ে মানবসম্পদের ধারণায় পর্যবসিত হয়েছে। আমাদের উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য তাই মানবসম্পদের যথোচিত বিকাশ ঘটানো। কেননা এই সম্পদকে অবহেলা করা হলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হবে শুধু নয়, অসমাপ্ত থেকে যাবে। অতএব কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক থেকে শুরু করে পরিকল্পনা কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, রাজ্য শিক্ষা দপ্তর পর্যন্ত প্রশাসনের প্রতিটি কাঠামো বিশাল কর্মযজ্ঞে সামিল হয়েছে।

এই কর্মযজ্ঞের দুটি প্রধান ক্ষেত্র হল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। আদর্শগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় জ্ঞান ও শিক্ষা বিতরণের শ্রেষ্ঠ আসন, যেখানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষকরা স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনাশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কলাবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, প্রকৃতিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার জগতে নিত্য নতুন নিরলস গবেষণায় রত থাকেন। সৃষ্টিশীল চিন্তা ও উজ্জ্বল বুদ্ধিবৃত্তির সমন্বয় ঘটে এখানে। এই সমন্বয় ঘটানোর ক্ষেত্রে অন্যতম সোপান হল স্নাতক স্তরের কলেজীয় শিক্ষা। অতএব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয়ে মিলেই শিক্ষার মহত্তম আদর্শ রূপায়ণে ব্রতী হয়। এই ব্রতের মূল উদ্দেশ্য তিনটি। প্রথম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে মানুষ করা, তার মনের চেহারা পরিবর্তন করা, তাকে স্বাবলম্বী করে তোলা, চরিত্র গঠন করা এবং চিন্তা ও কল্পনাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বিদ্যাশিক্ষার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কিংবা এক বা একাধিক বিষয়ে শিক্ষার্থীকে সার্বিক জ্ঞান প্রদান করা যাতে ছাত্র বা ছাত্রী বিশেষ বিষয়ে পটুত্ব অর্জন করে বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চায় ব্রতী হতে পারে। তৃতীয় উদ্দেশ্য হল জীবনমুখী শিক্ষা প্রদান করে শিক্ষার্থীকে এমনভাবে মানুষ করা যাতে সে জীবিকা নির্বাহ করে নিজের ও পরিবারের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থাই শুধু করবে না, সমাজেরও কার্যকর উপকারে লাগতে পারবে। এই তিনটি উদ্দেশ্য যথাযথভাবে পূরণ করতে পারলেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশের মানবসম্পদকে কাজে লাগানো সম্ভব হবে।

সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য উচ্চশিক্ষার বিশেষ উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেছে। ১৯৮১-৮২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ও সমতুল প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১০১ এবং কলেজ ছিল ৪৮৮ডটি। দশ বৎসরের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৭৬ ও ৭১২১। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের সংখ্যা ১৯৮১-৮২-তে ছিল ২৯.৫২ লক্ষ। ১৯৯১-৯২-তে তা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪৪.২৫ লক্ষ। নানা কারণে এই বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। প্রথমত, উন্নয়নশীল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অর্থনীতির উপযোগী মানবসম্পদ সৃষ্টির তাগিদে এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সরকার নিজেই উচ্চশিক্ষার সুযোগসুবিধা সম্প্রসারণে উদ্যোগী হয়েছে। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও ততই উচ্চশিক্ষালাভের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ চাকরির বাজার যতই সীমিত হয়ে পড়ছে নিয়োগকর্তারাও ততই বেশি করে চাকুরিপ্রার্থীর যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিকে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করছেন। তৃতীয়ত, উচ্চশিক্ষার জগৎ এখন আর শুধু উচ্চবর্ণ

ও বণিক শ্রেণীর একান্ত বিচরণক্ষেত্র নয়। সমাজে এতদিন যারা অবহেলিত হয়েছে সেই অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ অংশ সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাবৃদ্ধির আবশ্যিক শর্ত হিসেবে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। শুধু তপসিলী জাতি ও উপজাতির মধ্যেই নয়, সর্বস্তরের মহিলাদের মধ্যেও এ বিষয়ে বিশেষ তৎপরতা লক্ষ করা যায়।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এর ফলে কি আমরা শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করতে পেরেছি? বিশেষজ্ঞ থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলের অভিজ্ঞতাই এক্ষেত্রে হতাশাব্যঞ্জক। উচ্চশিক্ষার প্রসার বলতে প্রধানত স্নাতক পর্যায়ে পাস কোর্স পঠনপাঠনের সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, পশুচিকিৎসা বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ তেমনভাবে বাড়ানো হয়নি। কারণ এধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা ব্যয়সাপেক্ষ। ফলে জাতীয় সম্পদের অধিকাংশ ব্যয় হয়েছে স্নাতক স্তরে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখার বিস্তারে। অথচ এসব ক্ষেত্রে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। উপরন্তু বি.এ, বি. এস. সি. বা বি. কম. পঠনপাঠনের বিষয়টি অপরিকল্পিতভাবে সংগঠিত করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত বিবেচনার তুলনায় রাজনৈতিক বিবেচনাই অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে। বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মশৃঙ্খলার বালাই নেই। ফলে যোগ্যতামান অনুযায়ী সেসব জায়গায় লেখাপড়ার পরিবেশই তৈরি হতে পারেনি। অর্থনৈতিক সচ্ছলতার অভাবও এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। উপযুক্ত আর্থিক সংস্থান না থাকার ফলে বহু কলেজের পক্ষেই সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উচ্চমানের শিক্ষাপ্রদান করা সম্ভব হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের হিসাব অনুযায়ী সাত হাজার কলেজের মধ্যে তিন হাজারেরও বেশি কলেজ আর্থিক সচ্ছলতা ও শিক্ষামানের দিক থেকে পঙ্গু বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

শিক্ষাকাঠামোর যেখানে এই হাল সেখানে তা যে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হবে তা বলাই বাহুল্য। ডিগ্রি ও পরীক্ষাসর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থা মানুষ গড়ার কারিগর হতে পারেনি। আজকের ছাত্রসমাজ কেরিয়ারসর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিক জীবে পরিণত হচ্ছে। যে আদর্শবাদ ছিল ছাত্র ও যুব-সমাজের গৌরব তা আজ ক্রমশ অপসৃয়মান। উন্নত কল্পনাশক্তি ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয়ও তারা দিতে অপারগ। অল্প আয়াসে চটজলদি ফল পাবার প্রত্যাশা তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছে। ফলে সামাজিক অসন্তোষও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে স্নাতক পর্যায়ের 'পাস' ছাত্রছাত্রীরা তো বটেই, এমনকি 'অনার্স' পাস করা ছাত্রছাত্রীরাও মৌলিক চিন্তার অধিকারী হতে পারছে না। অধীত বিষয়কে সামগ্রিকভাবে জানার ধৈর্যই তাদের নেই। পরীক্ষার উপযোগী লেখাপড়া করে তারা খণ্ডিত জ্ঞান নিয়েই ডিগ্রিধারী হচ্ছে।

শিক্ষাব্যবস্থার এই ব্যর্থতা হয়তো আংশিকভাবে ঢেকে দেওয়া যেত যদি শিক্ষার্থীদের জীবিকা নির্বাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব হত। আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা এক্ষেত্রে চরম আকার ধারণ করেছে। এই সমস্যার দুটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একদিকে রয়েছে আর্থিক উন্নয়নের শ্লথগতি, যার ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ কম সৃষ্টি হয়েছে। বেসরকারি শিল্প ও পরিষেবাতে যেমন, তেমনই সরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মী নিয়োগের হার প্রয়োজনের তুলনায় ভীষণ কম। অন্যদিকে রয়েছে পাঠক্রমের সঙ্গে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের চাহিদার সংযোগের অভাব। শিল্পায়ন, নগরায়ন ও কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে যে নতুন নতুন পেশা, বৃত্তি ও দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন সৃষ্টি হচ্ছে মান্ধাতা আমলের পাঠক্রম ছাত্রছাত্রীদের তার উপযুক্ত করে তুলতে পারছে না। সাম্প্রতিক কালের অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির মাধ্যমে বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তিও আসতে শুরু করেছে। এই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াতেও কর্মক্ষেত্রে বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধিত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এই নয়া অর্থনীতির চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না।

এই পরিস্থিতিরই করুণ পরিণতি হল কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের কর্মব্যস্ততা। অর্থাৎ শিক্ষিত বেকারের নাম নথিভুক্ত করার কর্মব্যস্ততা। কর্মপ্রার্থীর তালিকা ঘাঁটলে দেখা যাবে, অদক্ষ শ্রমিকের তুলনায় শিক্ষিত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। শেষোক্তদের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রার্থীদের সংখ্যা বেশি হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিপ্রাপ্তদের সংখ্যাও কম নয় এবং তা ক্রমবর্ধমান। শুধু তা-ই নয়। কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম লেখানো এবং কাঙ্ক্ষিত কাজ পাওয়া—এই দুইয়ের মধ্যে কালের ব্যবধানও শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছে। ফলে চাকরির বাজারে স্নাতকদের চাহিদার তুলনায় জোগান মাত্রাতিরিক্ত বেশি হয়ে পড়েছে। স্বভাবতই সাধারণ বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হওয়া স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের চাকরির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। এর একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়াও আছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ যত কমছে উচ্চশিক্ষার দরজায় ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ও ততই বাড়ছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এর পরিণতি মারাত্মক। কারণ যাদের উচ্চশিক্ষা লাভের সামর্থ্য ও আগ্রহ কোনটাই নেই তারাও স্রেফ ছাত্রজীবনকে প্রলম্বিত করার জন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করছে। বিকল্প কিছু করার নেই, শুধু এই যুক্তিতেই গরিষ্ঠসংখ্যক ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার ভান করছে। এটাই মনে হয় সমসাময়িক কালের করুণতম সামাজিক বিয়োগান্ত নাটক। কেননা উদ্দেশ্যহীন ও জীবনবিমুখ শিক্ষা শিক্ষার্থী ও সমাজ কারোরই উপকারে লাগে না।



শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবার ফলে নানাভাবে সামাজিক সম্পদের অপচয় হচ্ছে। প্রথমত, শিক্ষার্থী জানেই না যে, অ-সাম্মানিক স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে সে ভবিষ্যৎ জীবনে কী করবে। কারণ চাকরির বাজারে এই ডিগ্রির কোন মূল্যই আর অবশিষ্ট নেই। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়নি এবং জীবিকার ক্ষেত্রেও বিশেষিকতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি, তখন একজন সাধারণ গ্র্যাজুয়েটও সামাজিকভাবে উপযোগী কর্মে নিযুক্ত হতে পারত। কিন্তু বর্তমানের তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে তারা পিছু হঠতে বাধ্য। দ্বিতীয়ত, উদ্দেশ্যহীন শিক্ষা-প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়ে শিক্ষার মহান আদর্শের প্রতিই তারা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছে। তৃতীয়ত, আগ্রহহীন সাধারণ মানের ছাত্রছাত্রী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও পঠনপাঠনের উন্নত অ্যাকাডেমিক মান বজায় রাখতে পারছে না।

অতএব একথা স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা কর্মসংস্থান সৃষ্টির দিকে লক্ষ রেখে গড়ে তোলা হয়নি। আবার একথাও ঠিক যে, শিক্ষার্থীকে কেবলমাত্র চাকরির বাজারের উপযুক্ত করে প্রস্তুত করাই শিক্ষার ধ্যান-জ্ঞান হতে পারে না। তাছাড়া নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি যে ধরনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান বা দক্ষতা কর্মপ্রার্থীর কাছ থেকে দাবি করে তা পূর্বাহ্নে উপলব্ধি করা বা সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে সর্বদা সম্ভব নয়। একধরনের শিক্ষায় অভ্যস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষেও হঠাৎ করে নতুন কোন বিষয় আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নয়। সুতরাং সমাজ ও অর্থনীতি মানুষের কাছ থেকে কী ধরনের যোগ্যতা বা দক্ষতা কামনা করে সেই সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে যতই বাস্তবসম্মত করে তোলার চেষ্টা করি না কেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যে ধরনের ছাত্রছাত্রী তৈরি করবে এবং চাকুরির বাজারে কী ধরনের গুণের প্রয়োজন, এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান থাকবেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্রছাত্রীরা যাতে সামাজিক উৎপাদনব্যবস্থায় সৃজনশীল ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে সে বিষয়ে আরও অনেক বেশি সচেতন হতে হবে।

তবে যে কোন প্রকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিপ্রাপ্তদের একটা চাকরি ধরিয়ে দিতে পারাটাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চরম লক্ষ্য হতে পারে না। কারণ আমাদের মতো অনগ্রসর তথা উন্নয়নশীল দেশে পুঁজির অভাব, ভূমিসংস্কারের অভাব, নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ ইত্যাদি নানা কারণে শিল্পায়নের গতি শ্লথ হতে বাধ্য। ফলে বাড়তি কর্মসংস্থানের সুযোগও সীমিত। সংগঠিত ক্ষেত্রে তাই চাকরির হাহাকার আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করি। সে জন্য শুধু নিরাপদ চাকরির পিছনে না ছুটে আমাদের ছাত্রসমাজ যাতে ব্যবসাবাণিজ্য ও স্বনিযুক্তি প্রকল্পে নিজেদের ব্যস্ত রাখতে পারে শিক্ষার সঙ্গে জড়িত কর্তৃপক্ষদের সেদিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

(২)

শিক্ষার সঙ্গে জীবিকার ব্যবধান দূর করতে ভাবনাচিন্তা কম হয়নি। স্বাধীনতালাভের পর থেকে একাধিক শিক্ষা কমিশন এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন। ১৯৬৬ সালে শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কর্মশিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষা চালু করার সুপারিশ করেন। কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ইঞ্জিনিয়ারিং, স্বাস্থ্য, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, কলা ইত্যাদি নানা শাখায় প্রায় একশো পঞ্চাশটি বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রবর্তন করে কমপক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ ছাত্রছাত্রীকে তার আওতায় আনার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, পঞ্চাশ শতাংশ তো দূরের কথা ২০০০ সালের মধ্যে পাঁচ শতাংশ ছাত্রছাত্রীকেও বৃত্তিশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করা যাবে কিনা সন্দেহ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অশোক মিত্র কমিশন মন্তব্য করেছেন যে, মাধ্যমিক স্তরের কর্মশিক্ষা যদি শিক্ষক বা ছাত্রসমাজ কেউই গুরুত্বসহকারে চর্চা না করে থাকেন, তাহলে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যে তিন লক্ষ ছাত্র ভর্তি হয় তার এক শতাংশও বৃত্তিশিক্ষার বিকল্প পাঠক্রমে ভর্তি হতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। কারণ ঐ পাঠক্রমে শিক্ষা সমাপ্ত করে লাভজনক বৃত্তি নির্বাচনের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। তাছাড়া ঐ ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষান্তে কোন কলেজেই স্নাতক কোর্সে ভর্তি হতে পারে না।

পলিটেকনিক বা শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি (I.T.I) অবশ্য প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। কিন্তু মিত্র কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতি বছর প্রায় লক্ষাধিক প্রার্থীর মধ্যে মাত্র পাঁচ শতাংশ বা ৪,৭০০ জন আই.টি.আই.-গুলিতে ভর্তির সুযোগ পায়। আর পলিটেকনিকগুলিতে প্রায় তিরিশ হাজার প্রার্থীর দশ শতাংশ মাত্র ভর্তি হতে পারে। ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পরিস্থিতি আরও শোচনীয়। ১৯৯১ সালের হিসাব অনুযায়ী ৩০,০০০ প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১৫০০ জন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে এবং ২৫,০০০-এর মধ্যে মাত্র ৮২৫ জন ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছিল। সুতরাং প্রযুক্তি ও বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ যে বহুগুণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য।

এই কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে বৃত্তিশিক্ষার অন্তর্ভুক্তি জরুরি বিষয় হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়েই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন স্নাতক পাঠক্রমকে পরিবেশ, দেশের উন্নয়নের চাহিদা এবং

উৎপাদনশীলতা ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করেছিলেন। নিয়মিত পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ফলিত বিদ্যা, হাতেকলমে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা এবং জাতীয় ও সমাজসেবার সঙ্গে ছাত্রদের যুক্ত থাকার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৯১ সাল পর্যন্ত মাত্র ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ২০৮টি কলেজ এই পাঠক্রম চালু করে। ফলে গোটা দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় তার প্রান্তিক প্রভাবও পড়েনি। প্রতিটি বিষয়পিছু ৭.৫০ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া সত্ত্বেও কলেজগুলিতে বিশেষ সাড়া পাওয়া যায়নি।

সমস্যাটা প্রধানত দুটি রূপে দেখা দেয়। একদিকে উচ্চমাধ্যমিকে যারা বৃত্তিশিক্ষা নিয়ে উত্তীর্ণ হচ্ছে তাদের স্নাতক পর্যায়ে পড়াশোনার সুযোগ করে দেওয়া দরকার ছিল। অন্যদিকে আরও জরুরি বিষয় হিসেবে যেটা দেখা দিল তা হল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা। এই দ্বিবিধ সমস্যা সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ড. টি. এন. ধর-এর নেতৃত্বে একটি 'কোর কমিটি' ১৯৯১ সালের নভেম্বর মাসে গঠন করেন। বৃত্তিশিক্ষার শিক্ষাগত মান ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা উভয় দিক বিবেচনা করে কমিটি ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক বিস্তৃত প্রতিবেদন পেশ করেন। বৃত্তিশিক্ষা নিয়ে যাঁরা ভাবনাচিন্তা করেন তাঁদের কাছে এই প্রতিবেদন এক মূল্যবান দলিলবিশেষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে কীভাবে বৃত্তিশিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, কোন্ বিষয় নির্বাচন করলে কর্মসংস্থানের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ বৃদ্ধি পাবে, নতুন পাঠক্রমের কাঠামো কেমন হওয়া উচিত এবং তা চালু করার জন্য আর্থিক ও প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব কীভাবে বণ্টন করা প্রয়োজন ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোকপাত করে কমিটি প্রতিবেদন বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তিশিক্ষা প্রদানের সম্ভাবনাকে বাস্তবসম্মত করে তুলেছে।

স্নাতক স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে তিনভাবে সমৃদ্ধ করা যেতে পারে। প্রথমত, যে সমস্ত বিষয় বর্তমানে বি.এ, বি.এস.সি., ও বি.কম. কোর্সে পড়ানো হয় তাদের পাঠক্রমকে সংশোধন ও পুনর্বিন্যাস করে এমনভাবে তৈরি করা যেতে পারে যাতে শিক্ষার্থীরা চাকুরির বাজারে বা স্বনিযুক্তি প্রকল্পে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে। যেমন, বাণিজ্য শাখা নিয়ে যারা পড়তে আগ্রহী তারা যদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হিসাব পরীক্ষা, ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা, বীমা-ব্যবসায় ইত্যাদি বিষয়ে হাতেকলমে প্রায়োগিক জ্ঞান লাভের সুযোগ পায় তাহলে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সময় তারা বাড়তি সুবিধা পেতে পারে। সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থীদের অনুরূপভাবে শ্রমকল্যাণ, পরিবার কল্যাণ বা সমাজসেবার নানা দিক সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত করা যেতে পারে। বিশেষ করে নমুনাসমীক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে যদি তাদের পরিচিত করানো যায় তাহলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদের কদর বাড়তে বাধ্য। গৃহবিজ্ঞানের পাঠক্রমকেও একইভাবে কর্মসংস্থানমুখী করে তোলা যেতে পারে। তবে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম-রচয়িতাদেরই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে গেলে একাজটা তাঁদের অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করতেই হবে।

দ্বিতীয়ত, উচ্চমাধ্যমিকে যেমন বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৃত্তিশিক্ষার তিন বৎসরের স্নাতক কোর্স চালু করা যেতে পারে। এর ফলে উচ্চমাধ্যমিক পাস করা ছাত্রছাত্রীরা একদিকে যেমন স্নাতক ডিগ্রি লাভের সুযোগ পেয়ে নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারবে, অন্যদিকে তেমনই ডিগ্রি পর্যায়ের পাঠক্রমকেও আধুনিক অর্থনীতি, উৎপাদনব্যবস্থা ও প্রযুক্তির উপযোগী করে তোলা যাবে। তবে এ ধরনের ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তনের আগে পলিটেকনিক ও অন্যান্য বৃত্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে কী পাঠক্রম চালু আছে তা যাচাই করা প্রয়োজন। যেসব বিষয় ঐসব প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয় না অথচ যার সামাজিক মূল্য রয়েছে সেই সব বিষয়ই ডিগ্রি কোর্সে পড়ানো যেতে পারে। আবার অনেক বিষয় আছে যা শেখানোর উপযুক্ত পরিকাঠামো পলিটেকনিকগুলির আছে। সেসব বিষয় ঐসব প্রতিষ্ঠানেই শেখানোর ব্যবস্থা করা উচিত।

এই সম্পর্কে মিত্র কমিশনের সুপারিশ প্রণিধানযোগ্য। কমিশন বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য বিভিন্ন সময়ের কোর্স চালু করার সুপারিশ করেছেন: (ক) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত যারা লেখাপড়া করেছে তাদের জন্য দুই বছরের কোর্স; (খ) উপরোক্ত গোষ্ঠীর জন্য চার বছরের কোর্স; (গ) মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের জন্য দুই বছরের কোর্স; (ঘ) মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের জন্য চার বছরের কোর্স; এবং (ঙ) উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের জন্য দুই বছরের কোর্স। এই বিভিন্ন ধরনের পাঠক্রমে যেমন শিল্প, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত নানা বিশেষজ্ঞ জ্ঞান বিতরণের সুযোগ থাকবে তেমনি এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে পাঠ গ্রহণেরও সুযোগ দিতে হবে। পলিটেকনিক ও আই.টি.আই-গুলির পরিকাঠামোর ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটিয়ে এই ধরনের বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অবশ্য পাঠক্রমের বিষয় নির্বাচনেও অভিনবত্ব চাই। যে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে অসংগঠিত ক্ষেত্রে যোগদান করে তাদের শিক্ষাপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষ শ্রমিকে পরিণত করার মহৎ দায়িত্ব আমরা পালন করতে পারি। কৃষি, উদ্যানপালনবিদ্যা, সবজি চাষ, রেশমশিল্প, মৎস্যচাষ, খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া, জৈব প্রযুক্তি, পোশাক প্রস্তুত, কাঠের কাজ, রেডিও-টি.ভি. সারানোর কাজ, চামড়ার কাজ, পশুপালন, কমপিউটার ইত্যাদি নানা



নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়ে দুই বা চার বছরের কোর্স চালু করে বেকার যুবকদের স্বনিযুক্তি প্রকল্পে উৎসাহদান করা আশু কর্তব্য।

তবে উপরোক্ত কর্মসূচি রূপায়িত করতে গেলে শিল্প-শিক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। সেজন্য প্রচুর অর্থবরাদ্দেরও প্রয়োজন। অথচ আমাদের বাজেটে শিক্ষাখাতে যা বরাদ্দ ধার্য থাকে তার অধিকাংশই ব্যয়িত হয় পরিকাঠামো বজায় রাখতে। উন্নয়ন খাতে আর বিশেষ অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং সীমিত আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে আমরা কী করতে পারি সেকথাও ভাবা দরকার। প্রধানত এই বিবেচনার কথা মাথায় রেখেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের 'কোর কমিটি' তৃতীয় বিকল্পের প্রস্তাব করেছেন। এই বিকল্পটি হল প্রচলিত স্নাতক পাঠক্রমের মধ্যেই একটি করে বৃত্তিশিক্ষার বিষয় চালু করা। এর ফলে সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির প্রতি যে মোহ আছে তাকেও যেমন সম্মান জানানো হবে তেমনই নির্দিষ্ট পেশা বা বৃত্তির উপযোগী কিছু জ্ঞানও শিক্ষার্থীকে দেওয়া যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তরফেও বিশেষ আপত্তির কারণ থাকবে না। কারণ পাঠক্রমের আমূল পরিবর্তন যেমন করতে হবে না, তেমনই একটিমাত্র বৃত্তিশিক্ষার বিষয় পড়ানোর পরিকাঠামো সৃষ্টিতে বাধ্যাধিকাও ঘটবে না। তাছাড়া এই কাঠামোতে বৃত্তিশিক্ষার পাঠ নিলেও শিক্ষার্থীর স্নাতকোত্তর পাঠ গ্রহণ করার কোন বাধা থাকবে না।

সুখের কথা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান শাখায় উপরোক্ত তৃতীয় বিকল্প অনুযায়ী বৃত্তিশিক্ষার সূচনা করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পাঠিয়েছেন। ঐ নির্দেশিকায় (ক) কলা, মানবিক বিদ্যা ও সমাজবিদ্যা, (খ) বাণিজ্য, অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা, (গ) বিজ্ঞান এবং (ঘ) ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় বৃত্তিশিক্ষা চালু করার জন্য ৩৫টি বিষয়কে নির্বাচন করা হয়েছে, যার মধ্যে অন্তত একটি বিষয় শিক্ষার্থীরা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নির্বাচন করতে পারবে।

পাঠ্য বিষয়ের নির্বাচনে অবশ্যই দূরদৃষ্টির পরিচয় আছে। যেমন, কলা, মানবিক বিদ্যা ও সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে (১) Functional Hindi, (২) Functional Sanskrit, (৩) Communicative English এবং (৪) Archeology & Muscology নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

বাণিজ্য, অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা শাখায় বৃত্তিশিক্ষার সম্ভাব্য বিষয়গুলি হল: (১) Principles & Practices of Insurance, (২) Actuarial Science, (৩) Office Management & Secretarial Practice, (৪) Tax Procedures & Practices, (৫) Foreign Trade Practices & Procedures, (৬) Tourism and Travel Management, (৭) Advertising, Sales Promotion & Sales Management, এবং (৮) Computer Applications.

বিজ্ঞান শাখার জন্য নির্দিষ্ট বিষয়গুলি হল: (১) Industrial Chemistry, (২) Food Science and Quality control, (৩) Clinical Nutrition Dietetics, (৪) Industrial Microbiology, (৫) Bio-technology, (৬) Biological Technique and Specimen Preparation, (৭) Seed Technology, (৮) Sericulture, (৯) Industrial Fish and Fishery, (১০) Instrumentation, (১১) Optical Instrumentation, (১২) Geoexploration and Drilling Technology, (১৩) Mass Communication Video Production, (১৪) Still Photography Audio Products.

ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে যারা পড়তে আসবে তাদেরও কিছু বৃত্তিমূলক বিষয় শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। তারা যে বিষয়গুলি থেকে নির্বাচন করতে পারে সেগুলি হল: (১) Electronic Equipment Maintenance, (২) Computer Maintenance, (৩) Electrical Equipment Maintenance, (৪) Environment and Water Management, (৫) Rural Technology, (৬) Automobiles Maintenance, (৭) Refrigeration & Air Conditioning Maintenance, (৮) Construction Technology Management, এবং (৯) Manufacturing Process.

অশোক মিত্র কমিশনের প্রতিবেদনেও পাস কোর্স পঠন-পাঠনকে অর্থবহ করে তোলার জন্য কতকগুলি ব্যবহারিক ও সমাজের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বিষয়কে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নির্বাচনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জনস্বাস্থ্য, সাক্ষরতা, পরিবেশ-বিদ্যা, কমপিউটার বিজ্ঞান, নারীসমস্যা সংক্রান্ত বিদ্যা, নাটক ও চলচ্চিত্র ইত্যাদির মতো বিষয়কে চিরাচরিত বিষয়ের সহায়ক বিষয় হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সুযোগ দিলে শুধু যে তাদের সামাজিক চেতনাই সমৃদ্ধ হবে তাই নয়, চাকরির বাজারেও তাদের গুরুত্ব বাড়বে।

দেরিতে হলেও আশার কথা এই যে, পশ্চিমবঙ্গেও স্নাতক পর্যায়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সূচনা হয়েছে। সম্প্রতি যে সমস্ত কলেজে বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে তার তালিকার প্রতি নজর দিলে আমরা কোন্ অবস্থায় রয়েছি তার একটি আভাস হয়তো পাওয়া যাবে: (১) রানী ধনাক্ষকুমারী কলেজ: প্রতিরক্ষা বিদ্যা; (২) হরিণঘাটা কলেজ: কমপিউটার বিজ্ঞান; (৩) বসিরহাট কলেজ: কমপিউটার বিজ্ঞান; (৪) নৈহাটি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ (দিবা বিভাগ): ইলেকট্রনিক্স; (৫) ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ: কমপিউটার

বিজ্ঞান; (৬) নৈহাটি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ (সান্ধ্য বিভাগ): চলচ্চিত্র বিদ্যা; (৭) দীনবন্ধু এন্ড্রুজ কলেজ: ইলেকট্রনিক্স্; (৮) ডায়মন্ডহারবার ফকিরচাঁদ কলেজ: ইলেকট্রনিক্স; (৯) সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়, কাপগারি, মেদিনীপুর: বীজ প্রযুক্তি এবং মৎস্যচাষ; এবং (১০) কালিম্পং কলেজ: রেশমগুটির চাষ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বৃত্তিশিক্ষার সূচনার জন্য যে আর্থিক দায়ভার ধার্য হবে, প্রথম পাঁচ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনই তা বহন করবেন। তারপর ঐ দায়িত্ব রাজ্যসরকারকেই বহন করতে হবে। আপাতত ইউ.জি.সি.-র নির্দেশে প্রতিটি কলেজে উপরোক্ত বিষয়গুলির জন্য তিরিশটি করে আসনসংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তাহলেও প্রাথমিক সাড়া অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে না। তাই আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে এই সীমিত ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটবে।

(৩)

বৃত্তিশিক্ষা বা কর্মমুখী শিক্ষা সফলভাবে রূপায়ণ করতে হলে তাকে কলেজের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। কারণ যে বিষয় হাতেকলমে কাজ করে শেখার কথা তা শুধু পাঠ্যবইয়ের সাহায্যে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। তাকে আয়ত্ত করতে হলে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করতে হবে এবং এক্ষেত্রে তার যথার্থ ল্যাবরেটরি হল মাঠ-ময়দান বা কল-কারখানা। অতএব, কৃষি ও শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেই বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। পাঠ্যতালিকা রচনা করা থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত পর্যায়েই উদ্যোক্তা ও বাবসায়ীদের পরামর্শ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। কারণ তাঁরাই বলতে পারেন কী ধরনের দক্ষতার বাজারে চাহিদা আছে বা কী ধরনের সামগ্রী উৎপাদন করে একটি ছাত্র স্বনির্ভরশীল হতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের আংশিক সময়ের অধ্যাপক নিযুক্ত করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে ছাত্রসমাজ যে অনেক বেশি উপকৃত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সুতরাং একথা মানতেই হবে যে যত্রতত্র বৃত্তিশিক্ষার পাঠক্রম চালু করা সম্ভব নয়। যে অঞ্চলে কোন বিশেষ শিল্প বা একাধিক শিল্প গড়ে উঠেছে অথবা কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে, সেই অঞ্চলের নিকটবর্তী কলেজকেই বৃত্তিশিক্ষার উপযুক্ত কেন্দ্র বলে বিবেচনা করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিং-এর চা শিল্প, খাগরার কাঁসার বাসনশিল্প, শান্তিপুর বা ধনেখালির তাঁতশিল্প, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প অথবা সুন্দরবন অঞ্চলের মৎস্য ও পর্যটন শিল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। এইসব এলাকার কলেজগুলিতে অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যজনক শিল্পের সহায়ক বৃত্তিশিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করলে ছাত্রসমাজ ও শিল্প উভয়েই উপকৃত হতে পারে। এলাকার সম্পদ যাতে শিল্পে সদ্ব্যবহার করা যায় সেদিকে লক্ষ রেখে পাঠক্রম রচনা করলে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা যেমন সৃষ্টি করা যাবে তেমনই স্থানীয় শিল্পও তার পক্ষে প্রয়োজনীয় মেধা ও দক্ষতা সহজেই সংগ্রহ করতে পারবে।

দেশে স্বনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলার পক্ষে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। গ্যাট চুক্তি ও বিশ্বায়নের ফলে ভারতের বাজার এখন বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলির কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। দেশের সম্পদ নয়া ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের শিকার হতে শুরু করেছে। এই প্রক্রিয়া যত ব্যাপকতর হবে ততই জাতীয় শিল্প ও কৃষি পিছু হঠতে শুরু করবে। জাতীয় বাজারও তাদের কাছে সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় বিদেশি পুঁজিকে স্বাগত জানাতে বাধ্য হলেও আমাদের উচিত জাতীয় অর্থনীতিকে যথাসাধ্য রক্ষা করার চেষ্টা করা। যেসব ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্প ও কৃষিজাত শিল্পের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে তাদের সুরক্ষিত রাখতে ও শক্তিশালী করতে স্থানীয় মেধা ও দক্ষতার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। স্থানীয় বিদ্যালয়ে বা মহাবিদ্যালয়ে কর্মশিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা সমাজের এই প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে পারবে বলে আশা করা যায়। স্থানীয় পুরসভা, পঞ্চায়েত ও গণসংগঠনগুলি যদি এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয় তাহলে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার্থীর সঙ্গে জীবনের সংযোগ পরিবার, ছাত্র, শিক্ষক ও সমাজ সকল পক্ষেরই সন্তোষ উৎপাদন করতে পারবে।

বৃত্তিশিক্ষার কথা যখনই বলা হয় তখন প্রধানত এই যুক্তিই প্রাধান্য পায় যে অর্থনীতির সংগঠিত ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই; তাই বৃত্তিমুখী শিক্ষা প্রয়োজন। এটি একধরনের নেতিবাচক যুক্তি। এর মধ্যে হতাশার ভাব ফুটে ওঠে। কিন্তু আমরা যদি বলি যে প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই বৃত্তিশিক্ষার উদ্দেশ্য তাহলে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হবে। এদিক থেকে দেখলে বৃত্তিশিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর মনে উদ্যোক্তার মানসিকতা গড়ে তোলা এবং স্বনিযুক্তিতে উৎসাহিত করা। তার মানে এই নয় যে প্রত্যেককেই টাটা-বিড়লা হতে হবে। কিন্তু এটা আশা করা নিশ্চয়ই অন্যায্য নয় আজ যারা ডিগ্রির কাগজ নিয়ে ম্লানমুখে ঘুরে বেড়ায় কাল যদি তারা সামাজিক উৎপাদনে কোন না কোনভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে তাহলে নিশ্চিত পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে গোটা সমাজেরও মঙ্গল সুনিশ্চিত হবে।

এক্ষেত্রে অবশ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কিছু করণীয় আছে। প্রথমত, বৃত্তিশিক্ষার্থীকে যদি উদ্যোক্তায় পরিণত করতে হয় তাহলে তার মধ্যে সময়, সম্পদ, মানুষ, পরিকাঠামো ইত্যাদি সবকিছু ব্যবস্থাপনার দক্ষতা সঞ্চার করতে হবে। কী করে বাজেট প্রস্তুত করতে হয়, আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য আনতে হয়, কাঁচামাল ও উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য ধার্য করতে হয় বা লাভ-ক্ষতির হিসেব করতে হয়, তা শেখাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেই উদ্যোগী হতে হবে। দ্বিতীয়ত, কোন্ ধরনের দ্রব্য ও পরিষেবার বাজারে চাহিদা আছে তার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য শিক্ষার্থীকে জানাতে হবে। এজন্য কাজের বাজারে নিত্যনতুন কী পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে সে বিষয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেই ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। তৃতীয়ত, বাজারের চাহিদা ও শিক্ষার্থীর ক্ষমতা উভয় দিক বিবেচনা করে কোন্ ধরনের বৃত্তিশিক্ষার কোর্স কোন্ ছাত্রের পক্ষে উপযোগী এই পরামর্শদানও অত্যন্ত জরুরি। আবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর শিক্ষার্থীরা কর্মসংস্থানের সুযোগ কতটা পেল বা পেল না সেই তথ্যও যদি সংগ্রহ করা যায় তাহলে ভবিষ্যতে পাঠক্রম সংশোধনের ক্ষেত্রে তা কাজে লাগতে পারে। পরিশেষে, শুধু স্বনিযুক্তির কথা বললেই তো হবে না, বৃত্তিশিক্ষা লাভের পর সম্ভাব্য উদ্যোক্তারা যাতে নিজস্ব ব্যবসা স্থাপন করা, কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপন্ন সামগ্রী বাজারে বিক্রি ইত্যাদির জন্য সহজে ঋণ সংগ্রহ করতে পারে সরকার ও ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে তা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

বৃত্তিশিক্ষা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন যে অবস্থান নিয়েছেন সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলার আছে। কমিশনের মতে সেই সব ডিগ্রি কলেজকেই বৃত্তিশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে যাদের এর প্রতি আন্তরিকতা আছে। আর আন্তরিকতা তাদেরই আছে বলে ধরা হবে যারা নতুন পাঠক্রম চালু করার আর্থিক দায়দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম বা প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহে নিজে যত্নবান হবে। কমিশনের নির্দেশিকাতেও প্রথম পাঁচ বৎসর অনুদান দেবার কথা আছে। তারপর কোর্স চালু রাখার দায়িত্ব রাজ্য সরকার বা কলেজ কর্তৃপক্ষের। কিন্তু শিক্ষা যেহেতু সংবিধানের যুগ্মতালিকাভুক্ত সেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার এভাবে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইতে পারেন না। অধিকাংশ কলেজই আর্থিক দিক থেকে পঙ্গু। ফলে নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের সামর্থ্য তাদের সীমিত। ইউ.জি.সি.-এর মতে কলেজগুলির উচিত শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করা। কিন্তু প্রশ্ন হল শিল্পপতি ব্যবসায়ীরা এই প্রস্তাবে কেন আকৃষ্ট হবেন? তাঁরা যদি বিনিয়োগ করে লাভবান হবার সম্ভাবনা দেখেন তবেই তারা এগিয়ে আসবেন। না হলে আসবেন না। সুতরাং বেসরকারি সাহায্যের উপর খুব বেশি ভরসা করে লাভ নেই। কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করে এবং শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের উপযোগী ব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে যাবতীয় সাহায্য প্রদান করে সরকারই এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন। বেসরকারি সাহায্য অবশ্যই কাম্য। তবে তার আগে পুরনো শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে, নতুন শিক্ষকপদ সৃষ্টি করে, এবং ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য ওয়ার্কশপ তৈরি করে সরকারকেই বৃত্তিশিক্ষার উপযুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টি করতে হবে।

বৃত্তিশিক্ষার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও আমাদের সচেতন থাকতে হবে। প্রথমত, বৃত্তিশিক্ষা কখনওই সাধারণ শিক্ষার বিকল্প হতে পারে না। দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। মানুষত্বের সার্বিক বিকাশই সাধারণ শিক্ষার মূল লক্ষ্য। তাই বৃত্তিশিক্ষা কেবল এর সহায়ক ভূমিকাই পালন করতে পারে। দ্বিতীয়ত, বৃত্তিশিক্ষার প্রবর্তন করলেই শিক্ষিত বেকারত্বের সমস্যা মিটে যাবে এরকম একটা ধারণা অনেকের মনে থাকতে পারে। প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, এই ধারণা অমূলক। দেশে ব্যাপক শিল্পায়ন ও কৃষিতে আধুনিকীকরণ না হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে না। আবার শিল্পায়নের প্রাথমিক শর্ত হল অভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টি। তার জন্য প্রয়োজন সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আয় বৃদ্ধি। আর তা করতে হলে প্রথমেই সম্পদ করতে হবে ভূমিসংস্কার। অতএব কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপযুক্ত শিল্পায়ন হবে কিনা তা অনেকটাই নির্ভর করছে শাসকশ্রেণীর সদিচ্ছা ও গণআন্দোলনের উপর। একমাত্র গণআন্দোলনই পারে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে এবং শিল্পায়নের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে। বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে বৃত্তিশিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের এই কঠিন বাস্তব সত্য সম্পর্কেও অবহিত রাখা প্রয়োজন। তাহলেই তারা স্বনির্ভরশীল হওয়ার সাধনায় মগ্ন থাকার মাঝে সমাজ-পরিবর্তনের যজ্ঞেও হাত মেলাতে শিখবে। □

# শঙ্খবালা

কিন্নর রায়

আজকাল এমনটি প্রায়ই হয়। রাতে ঘুমের মধ্যে এমনকি দুপুরে খুব পাতলা ভাত-ঘুমের ভেতর আরশাদ আলি দেখতে পায় সেইসব হাঁ-মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কুয়ো, একটার পর একটা — সার বাঁধা। পোড়ামাটির গোল পাটা পর পর সাজানো। এরা কি খাবার জলের ছিল, নাকি নিকাশী-ব্যবস্থার জন্যে— পঞ্চাশ পেরনো আরশাদ আলি ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। আর বগুড়ায় আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে আট কিলোমিটার দূরে সেই যে মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষ, যার অনেকটাই এখনও উঁচু উঁচু টিবির আড়ালে, আমি তো বার বার চলে যাই মহাস্থানগড়ে অটো-ট্যাকসিতে। এখন নিয়মিত অটো-ট্যাকসি যায়। আরশাদ তার চোখের সামনে মহাস্থানগড় যাওয়ার রাস্তাটি দেখতে পায়। কেমন যেন ইতিহাসের বোঝা নিয়ে দাঁড়ানো। এপথ দিয়েই কি হেঁটে গেছেন ইউয়েন সাঙ, বৌদ্ধ শ্রমণেরা? ইতিহাস কথা বলে না।

এক সভ্যতার সর সরালে আর এক জনপদ। তার নিচে আরও কত কত হাজার বছর আগে গড়ে তোলা মানুষের ঘরবাড়ি। ফরাসিরা এখনও খুঁজছে সেখানে। ওদের ক্যামেরায়, সে কি কোনও এক্স রে ক্যামেরা, যার ভেতর দিয়ে মাটির বুকের ভেতর ঘুমনো ইতিহাস দেখতে পেয়ে একদম চৌকো চৌবাচ্চার ধরনে খুঁড়ে ফেলা। মাটি কেটে ফেলা চৌকোনা মাপে। তারপর তার বুক থেকে তুলে আনা সময়ের পাঁজর।

কত কত উঁচু ঢিপি মহাস্থানগড়ে। প্রাচীন ইট নিয়ে চলে যাচ্ছে মানুষ। বেড়া একটা আছে। সরকারি নিষেধাজ্ঞাও। কিন্তু প্রয়োজন কি বেড়া মানে?

নিজেদের ঘর, রান্নাঘর, পায়খানা। মুরগির খোঁয়াড়— সব ইতিহাসের ইটে। একটু বড় হওয়ার পর থেকেই মহাস্থানগড় আমায় টানে, আরশাদ মনে করতে পারে। কেন টানে? কিসের জোরে! আরশাদ তার জবাব দিতে পারে না।

সিঙ্গল খাটের বিছানায় জোড়া বালিশে পিঠ ঠেকিয়ে আরশাদ আলি মহাস্থানগড়ের সেইসব মাটির পাড়অলা প্রাচীন কুয়োর অন্ধকার হাঁ-মুখ দেখতে পাচ্ছিল। কোনো কোনো রাতে সেই অন্ধকারে চাঁদও ডুবে যায়। আর সেই সব ইঁদারারা দোজখের আক্কেরা বুকে নিয়ে— দোজখ কি আরও কালো? নাকি সেখানে শুধুই আগুন?

পিঠের উঁচু বালিশের পাশে পাইপ আছে। তামাকের পাউচ। ইচ্ছে করছে না। কিছু ভালো লাগছে না আরশাদের। ঢাকায় দিনের পর দিন বনধ্ চলেছে। খালেদা জিয়া কি হটে যাবেন? নতুন নির্বাচনে আওয়ামি লিগের পালতোলা নৌকো কি ছুটে বেড়াবে পানিতে? বি এন পি-র ধানের শীষ আর এরশাদের জাতীয় পার্টি? জামাতে ইসলামি? ইনডিয়ার পেপারে আর কতটুকুই বা পাওয়া যায়!

গরমের দীর্ঘ দুপুর কিছুতেই যেন কাটতে চায় না। বিকেলের দিকে কেউ না কেউ এসে যাবেই। কিন্তু এতটা সময়? ডক্টর মৈত্রর কড়া নির্দেশ— এগারোটার ভেতর দুপুরের খাওয়া শেষ করতে হবে। তারপর অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টাসিড, ভিটামিন, হজমের ওষুধ। একগাদা বড়ি, ক্যাপসুল, সিরাপ মতো ঝাঁঝালো কিছু। ঢেকুরের সঙ্গে সঙ্গে তার গন্ধও উঠে আসবে। তখন একটু মৌরি খেলে ভাল লাগে।

নিজের কেটে নেওয়া ডান পায়ের জন্যে মাঝে মাঝে মনটা পাথরচাপা হয়ে যায়। আমি কি আর সেভাবে টই টই ঘুরে বেড়াতে পারব মহাস্থানগড়ের সেইসব টিপির আশেপাশে, সন্ধে লেগে আসা মাটির স্তূপের গায়ে সূর্যাস্তের মেক আপ। দূরে



এই গরমে কলকে ফুলের গাছ-বোঝাই সবুজ পাতা। হলুদ ফুল। গাছ আলো করে ফুটে থাকা ফুলেদের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে একটা পাখি, সে কি দুর্গা টুনটুনি? পাখিটাকে স্পষ্ট চেখে পড়ে না। নাকি শুধুই টুনটুনি? যার কথা পড়েছি সেই ছেলেবেলায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখায়। আরও পরে স্কুলে, বিজ্ঞান বইয়ের পাতায়— টুনটুনিকে কেন দর্জি পাখি বলা হয়, পড়তে পড়তে জানতে পারি।

ইন্ডিয়ায় না এলে বোধহয় এত ভাল অপারেশন হত না। ডক্টর এস কে মৈত্র খুব চেষ্টা করেছিলেন পা-টা বাঁচাতে। কিন্তু বোম্বের— নাকি মুম্বাই এখন, শুধুই মুম্বাই— ডক্টর আদবানি বললেন, পা অ্যামপিউট না করলে গোটা বডিতেই ছড়িয়ে পড়বে কার্সিনোমা। সার্জারির পর একটা কোর্স কেমো হয়ে গেছে। মাথার পাতলা হয়ে আসা সাদা চুল, মুঠো মুঠো উঠে, যেন উড়ে গেল— প্রায় ন্যাড়া, তেলতেলে হয়ে উঠল সমস্ত মাথা। যেন কোনো তেলালো বেলেপাথরের গায়ে সাদা সাদা কিছু শেকড়, কিংবা লতার আঁকশি, এই তো আমার মাথার চুল। আয়নার সামনে গোসল করার পর দাঁড়ালে দেখতে পাই, তখনও গোসলখানার পানি লেগে চুলের গোড়ায়। প্রায় ফাঁকা হয়ে যাওয়া চাঁদিতে লেপ্টে থাকা লম্বা লম্বা সাদা চুল, যেন মৃত সব ক্রিমিরা— আয়নার কাচে ভেসে ওঠা নিজের সুরতই চিনতে পারি না। একি আমি, নাকি অন্য কেউ? আর আয়নার ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে যায় মহাস্থানগড়ের ইতিহাসমাখা সেইসব টিপি। তার পাশে গভীর গভীর খাদের ভেতর অন্ধকার মুখে নিয়ে হাঁ-করা কুয়োরা, ভাঙাচোরা ইট, বৌদ্ধ বিহার। হলুদ ফুলে বোঝাই কলকে গাছে দুর্গা টুনটুনি পাখিটি বার বার ফুলের ভেতর নিজেকে পুরোপুরি ঢুকিয়ে মধু খেতে চাইছিল। ঝাপড়ালো কাঠচাঁপা গাছটির পুরু পাতায় চৈত্রের ধুলো। একটা দুটো তিনটে কাঠচাঁপা হাওয়ায় লাট্টু হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে— কেউ যেন সুতো কাটার তকলি ভাসিয়েছে বাতাসে, এভাবে মাটিতে নেমে আসতে চাইছিল। তাদের পাপড়ির সাদায় গোলাপির আভাস। ফুলের গন্ধে চারপাশে কোন এক মায়াবী পর্দা।

বিছানায় বাঁ পা টান টান মেলে দিয়ে আরশাদ আলি দেখতে পাচ্ছিল বড় বড় জানলার খড়খড়িতে কলকাতার বৈশাখী ধুলো। আগেকার উঁচু উঁচু বাড়ি যেমন রয়। একতলার সেগুনের জানালায় বহুদিন রঙ, প্রাইমার কিছুই পড়েনি। বিছানায় শুয়ে, যেটুকু আকাশ দেখা যায়, সেখানে শুধুই রৌদ্রঝলক। কলকাতা একটু একটু করে তেতে উঠছে গরমে। খানিকক্ষণ চুপ করে কান পেতে থাকলে পার্কসার্কাস ট্রাম ডিপোয় ট্রাম যাওয়া-আসার শব্দ, ঘন্টার আওয়াজ পাওয়া যায়। ট্যাক্সির শব্দও কখনও।

বৈশাখের রোদ গায়ে মেখে পার্কসার্কাসের এই তিনতলা বাড়িটি চুপ করে দাঁড়িয়ে। বাইরে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। পেছনের লোহার উঁচু, ভারি গেটটিতে বড় তালা। লোহার রেলিং-এর ওপর কাঁটাতার খানিকটা, এটুকু বাবরি মসজিদ ভাঙার পর।

বাইরে সিমেন্ট-বালির সুন্দর প্লাস্টার। রঙ হয়নি অনেকদিন। উঁচু উঁচু খিলানের সঙ্গে বড় বড় জানালা। রোদ হাওয়া বৃষ্টি আটকাতে কাঠের খড়খড়ি। একটা কাক তিন তলার কার্নিশে, টি.ভি অ্যানটেনার পাশাপাশি গম্ভীর মুখে, ঘাড় বেঁকিয়ে বসে কিছু একটা লক্ষ করছিল। আরশাদ এসব কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না।

মহসিনা পাশের ঘরে। এ ঘরে এখনও একটি চব্বিশ ঘন্টার নার্স আছে। আমায় সময়মতো অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টাসিড, হজমের দাওয়াই। পানি। ইউরিনাল, বেড প্যান দেওয়া, দরকার মতো।

ডান পায়ের পায়জামার পায়াটি গুটিয়ে কোমরের কাছে গোঁজা। তার তুঁতে রঙে একটি বড় সড় নীলচে মাছি যেন বারে বারে উড়ে এসে বসতে চাইছিল কোথা থেকে। মাছি ঘা খোঁজে।

কীভাবে কীভাবে যেন ছড়াল পায়ের ক্যানসারটি। ভাবতে ভাবতে হাত দিয়ে মাছিটাকে দূরে সরাতে চাইল আরশাদ। আর তখনই একতলার এই ঘরের জানালায় ঠোকর দিয়ে গেল ছাদে বসা সেই কাকটি। তার শব্দে সামান্য চমকে আরশাদ হাত দিয়ে কাকটাকে তাড়াতে তাড়াতে বলল, হুস্! হু-স্...।

সাদা চুনকাম করা দেওয়ালে একটা সস্তার ইলেকট্রনিক কোয়ার্জ আছে। সেখানে বেলা দুটো। এখনও প্রায় দু ঘন্টা। ঠিক চারটেয় চা দেবে সিসটার। তার সঙ্গে একটা থিন বিস্কুট। ফ্লাস্কে গরম পানি আছে। আমি সিসটারকে বললেই টি ব্যাগ দিয়ে গ্রিন টি বানিয়ে দেবে। নাহ্, থাক। একটু পরেই হবে। সিসটার হয়তো বাইরের বারান্দায় চেয়ারে বসে ভাত-ঢুলুনি ঢুলে নিচ্ছে। ডাকলেই চটকা ভেঙে যাবে আরামের।

ইনডিয়ার যে সব জার্নালিস্ট বন্ধু আছে, তারা অনেকেই অবাক হয়ে যায় শুধু ঢাকা থেকেই আশিটা ডেইলি পেপার বেরোয়, এটুকু জানতে পেরে। তারপরই প্রশ্ন— ফান্ডামেন্টালিস্টদের পেপার কোনটা?

ইনকিলাব। জামাত-এ-ইসলামির।

সার্কুলেশন কেমন?

খুব ভাল।

জামাত তো চট্টগ্রামেও খুব স্ট্রং, তাই না? ওখানে মেয়েদের নাকি খুব বোরখা?

আছে বেশ কিছু।

ওখান থেকে কর্ণফুলি বলে একটা কাগজ বেরোয় না?

বেরোয় তো।

আচ্ছা, গোলাম আজমের কী হবে?

এ প্রশ্ন শুনে একটু চুপ করে থাকি। খবরের কাগজে আমারও তো তিরিশ বছর হয়ে গেল প্রায়। পাকিস্তান, বাংলাদেশ—দু রকম রাষ্ট্রেই খবরের কাগজে কাজ করেছি—বড় বড় কভারেজ, মুক্তিযুদ্ধ, মুজিবর রহমান, মুজিবরের ছেলেরা, জিয়া, এরশাদ, খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা

কী হবে গোলাম আজমের?

ঘাতক দালাল বাহিনী নির্মূল, আরও নানান আন্দোলন চলছে। বুদ্ধিজীবীরা এ ব্যাপারে সোচ্চার হয়েছেন।

ফাঁসি হবে কি গোলাম আজমের?

আবারও চুপ করে থাকি। ভাইরা, বাবরি মসজিদ যারা ভেঙে মাঠ করে দিল, আপনারা কি তাদের কোনওরকম বিচার করতে পারলেন? শাস্তি তো দূরের কথা—এসব বলা হয়ে ওঠে না আরশাদ আলির। বরং তার জার্নালিস্টিক ক্যারিশমার আড়াল দেওয়া মুখ মিটি মিটি হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে পাইপে তামাক ঠাসে। তামাক ঠাসা পাইপের কাছাকাছি লাইটারের আগুনটুকু এনে অল্প অল্প ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দেখতে পায় ফরাক্কা বাঁধের সেই বিশাল দেওয়াল, এপারে, ইন্ডিয়ার দিকে জলে স্রোতে ফুলে ফেঁপে ওঠা গঙ্গা। আর ওপারে শুকিয়ে, প্রায় মরে যাওয়া নদীর বুক। মাইলের পর মাইল ধু ধু বালি। কোথাও পানি নেই। হায় আল্লা, হায় পানি, বাংলাদেশের মানুষ তো এমনই বলে।

আচ্ছা, দিনের পর দিন হিন্দুরা কেন চলে আসছেন বলুন তো এপারে? তার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরাও। যারা আসছে, তারা আর এপার থেকে ফিরছে না। রেশন কার্ড, ভোটার লিস্টে নাম, তারপর নিয়মমতো ভারতের নাগরিক। এত চাপ, কেমন করে সামলাবে পশ্চিমবঙ্গ? অনুপ্রবেশের এই ধাক্কায় আমাদের ইকনমি তো ক্রমশ..।

ঠোঁটে পাইপ রেখে এসব কথারও জবাব দেওয়া হয়ে ওঠে না আরশাদের। বর্ডার পেরিয়ে, বি ডি আর, বি এস এফ-কে টাকা-পয়সা দিয়ে এপার-ওপার করে মানুষ। ফরাক্কা বাঁধ কেড়ে নেয় হকের পানি। আমি একজন সাংবাদিক হিসেবে এর কী-ই বা জবাব দিতে পারি? আর এখন এই ডান পাটি কুঁচকির কাছ থেকে কাটা যাওয়ার পর এ-বাড়ির সাদা দেওয়ালে কাঠের পুরনো ডিজাইনের ব্রাকেট আলনার আংটায় বেতের নতুন ঘাড় বাঁকানো লাঠি ঝোলে। তার পাশে আজমির শরিফের কাচবন্দি ছবি। কাঠের ছোট টেবিলের ওপর ওষুধের শিশি, ট্যাবলেটের রুপোলি, সোনালি স্ট্রিপের পাশাপাশি গরম পানি রাখার ফ্লাস্ক, তুলো। সিসটারের প্রেসার মাপার মেশিন। থার্মোমিটার। কমপ্ল্যান-এর একটা বড় ডিবা—সব মিলিয়ে কেমন যেন গ্যানজাম হয়ে আছে টেবিলটি। টেবিলের পরই একটি সবুজ পর্দার আড়াল দেওয়া দরজা। দরজার গাঢ় চকোলেট ফ্রেমের কপালে রুপোলি আর নীলে স্টিকারে ৭৮৬—আরবি হরফে। পর্দার ওপারেই মহসিনা। আমার বিবি। একটু বিশ্রাম নিচ্ছে—দুপুরে গড়িয়ে নেওয়া যাকে বলে।

সেকেন্ড কোর্স কেমোথেরাপিও কমপ্লিট করব ইন্ডিয়াতেই। তারপর ফ্লাইটে ঢাকা। আবার নতুন করে শুরু করা সেই পুরনো জীবন। কাগজের অফিস। রিপোর্টিং। এক্সক্লুসিভ স্টোরি।

ঢাকার রাস্তায় রিকশারা এখন বড় জোরে ছোটে। আর সেই জেনেভা ক্যাম্পের বিহারি মুসলমানরা। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় যাদের আটকে রাখা হয়েছিল। আরশাদ তাদের কাউকে কাউকে এখনই দেখতে পায় চোখের সামনে।

এদের নিয়ে একটা বড় লেখা লেখেন না। আমার কাছে আসা কেউ কেউ বলেন।

কী লিখব? আমি কি ঔপন্যাসিক, না গল্পকার! পাইপের ধোঁয়ার আড়ালে নিজের মুখের রেখা লুকোতে লুকোতে আরশাদ তার ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট বন্ধুটির দিকে তাকায়।

নাহ্, উপন্যাস কেন! ইনফরমেটিভ লেখাই লিখুন। যেমন ধরুন পাকিস্তানে ভারত থেকে চলে যাওয়া মোহাজিররা—তারা তো এখন খুব লড়ছে। রেগুলার গান-ব্যাটল, পাকিস্তানি পুলিশ মিলিটারির সঙ্গে, নিজেদের আইডেনটিটির জন্যে। তেমনি জেনিভা ক্যাম্পের বিহারি মুসলমানরা, যাদের মধ্যে বয়স্কদের স্বপ্নে এখনও পাকিস্তানই ফাদারল্যান্ড, আপনিও তো একদিন বলছিলেন।

মনে ঠিকমতো স্মৃতি ভেসে ওঠে না সব সময়। হয়তো বলেছিলাম, কিংবা বলিনি—এরকম একটা মাঝামাঝি অবস্থায় ওপর ওপর রাখা জোড়া বালিশে ঠেস দেওয়া আরশাদ খানিকটা সোজা হয়ে বসে বলতে শুরু করে, আসলে জেনিভা ক্যাম্পের এই যে বিহারি মুসলমানরা, এরা তো বেশির ভাগই ইন্ডিয়া থেকে গেছে। আর মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পাকিস্তানও এদের দায়িত্ব নিতে চাইল না। কিন্তু এদের ভেতর বয়স্কদের মধ্যে কেউ কেউ স্বপ্নে তো পাকিস্তানকেই রাখল। কিন্তু কমবয়সীরা তেমন নয়। তারা অনেকেই হাতের কাজ করে। ছোটখাটো সারাইয়ের কাজ। ওদের সঙ্গে মিশে দেখেছি। আইয়ুব খানের রেজিমে, 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' যখন শুরু হল, তার কাছাকাছি সময়েই হবে হয়তো, এদের কাউকে কাউকে গ্রামের দিকে চাষবাসের জমি দেওয়া হয়েছিল। ওরা কিন্তু জমি নিয়ে খুব খুশি ছিল না। সাত তাড়াতাড়ি জমি বিক্রি করে শহরে চলে আসে। ছোটখাটো ব্যবসা-পত্তর শুরু করে। ওদের আর



একটা ব্যাপার—খুব বড় বড় কথা বলে। বাড়িয়ে বাড়িয়ে আর কি! ওদের ভাষাটাও বেশ মজার।

বাইরে বিকেল নামছিল। বছর পঁচিশের ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টটি, যে বাঙালি ও একটি বেশ চালু বাংলা দৈনিকে রিপোর্টারের চাকরি করে, জানতে চাইছিল আচ্ছা, আল বদর আর রাজাকার এদের মধ্যে কী ফারাক, আসলে এসব তো আমরা ভাল করে জানিই না।

জি! কথাটা প্রথমটায় ধরতে পারিনি। ফলে তার মুখের দিকে তাকাই। মাথার ভেতর কেমোথেরাপির কোর্সের ব্যাপারটা খামচাখামচি করছিল—ডক্টর মৈত্র বলেছেন, রাইগার হতে পারে—সারা শরীর জুড়ে কাঁপুনি, বমি হবে—নশিয়া। বমি বমি ভাব। চুল উঠে যাবে। তবু তো জীবন আগলাতে চাই। আহা, একটাই জীবন। ঠিক মুক্তিযুদ্ধের বছরে জন্মানো সাংবাদিকতা করা এই ছেলেটি, তার নাম সম্ভবত কৃশাণু, কৃশাণুই কি, নাকি অরিন্দম—কিংবা অরিন্দম হয়তো সেই ফটোগ্রাফারটির নাম, যে গতকাল বিকেলে আমার কাছে এসেছিল, এই ছেলেটি হয়তো দুটি নামের কোনটাই বয়ে বেড়ায় না, জিজ্ঞেস করছিল রাজাকার, আলবদর...

জি! রাজাকার আসলে তেমন কোনও ব্যাপার নয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় খান সেনাদের সঙ্গে থাকত। পথ দেখাত। একটু লুটপাট করা। মেয়েছেলে ধরে টানাটানি। এদের কাছে বড় জোর রাইফেল থাকত। শহুরে লুমপেন, গ্রামের গরিব চাষি—এরাই মূলত রাজাকার হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়। পাকিস্তানি অফিসাররা ঐ সময় এদের মানুষ বলেই মনে করত না। ব্রিজ পাহারা দেওয়াত। মেয়ে তুলে আনতে বলত। একটু ভাল চেহারার রাজাকার ছেলেকে দেখে খান সেনাদের পাঞ্জাবি বা বালুচ অফিসারের খাই চাপলে, সে তো এক হোমোসেকসুয়াল কেচ্ছা—বলতে বলতে বালিশে পিঠ আরও টান হল আরশাদের। তারপর নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে বলল, রাজাকারদের সম্বন্ধে অনেক ইনফরমেশন আপনি পাবেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প-উপন্যাসে। বাংলাদেশের খুব পাওয়ারফুল রাইটার। ও হ্যাঁ, আর যা বলছিলাম—

শার্টের বুকপকেট থেকে পাতলা নোটবই বের করে সাংবাদিকটি কী যেন লিখতে চাইছিল।

নোট করবেন না। নোট করবেন না। এসব ছাপার জন্য নয়। আপনি জানতে চাইছেন বলে—বলতে বলতে একটু ঠেলে আরও খানিকটা সোজা হয়ে বসতে চাওয়া আরশাদ সামনে তাকায়।

তাড়াতাড়ি নোটবইটি বন্ধ করে বুক পকেটে গুঁজে দিতে দিতে সামনে বসা শুভজিৎ বসু, আসলে এতক্ষণে ওর নামটি মনে পড়ে আরশাদের, বলে ওঠে—আমি লিখব না কোথাও। এমনি নোট নিচ্ছিলাম।

আরশাদ তখনই যেন বা বগুড়ায় নিজের গ্রামের বাড়ি থেকে আট কিলোমিটার দূরে মহাস্থানগড় যাওয়ার রাস্তাটি দেখতে পায়। সেই রাস্তার পাশে ঝাড়ালো নিমের ছায়ায় রোদের ইকড়ি মিকড়ি। করতোয়া নদীর সরু ধারাটি নিয়ম করে বয়ে চলেছে। এখন নদীর বুক মজে এসেছে। স্রোতে তেমন জোর নেই। কবে কোন্ বইতে যেন পড়েছিলাম মহাভারতেও রয়েছে করতোয়ার নাম। যেমন আছে গঙ্গা। করতোয়ায় অবগাহন স্নান করলে নাকি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। আমি তো কতবার গিয়ে গোসল সেরেছি করতোয়ার পানিতে। দূরে আকাশের গায়ে তখন মধ্যদিনের সূর্য। সূর্যের ছায়া, আকাশে ভেসে বেড়ানো ডানা মেলা চিলের ছবি নদী বুকে নিয়ে ভাসে। ভাসায়। এই নদী নিয়ে আরও কী কী সব লেখা আছে 'করতোয়া-মাহাত্ম্য'-তে। সে সব এখন আর পর পর মনে পড়ে না।

আলবদর!

জি। বলতে বলতে কী এক ঘোরের ভেতর আবারও করতোয়ায় ভেসে থাকা আস্ত একখানা নীল আকাশ, তাতে প্রায় বিন্দু হতে হতে মুছে যাওয়া কোনও পাখি দেখতে পায় আরশাদ আর তার মনে পড়ে—

*যমুনার উপনদী করতোয়ার উৎপত্তি সিকিমের পার্বত্য অঞ্চলে। ইহার উপনদী ঘোড়ামারা, সাহু ও চাউকি। পূর্বে তিস্তার প্রধান স্রোত আত্রাইয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার কালে করতোয়ার মধ্য দিয়াও প্রবাহিত হইত। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিস্তার গতি পরিবর্তনের ফলে করতোয়ার উত্তর অংশ উত্তর-পশ্চিম জলপাইগুড়ির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আত্রাই নদীতে পড়িয়াছে। কিন্তু দক্ষিণে করতোয়ার বিচ্ছিন্ন অংশ দক্ষিণে-পূর্বে প্রবাহিত হইয়া ঢাকা-পাবনা সীমান্তে যমুনায় পড়িয়াছে।*

হয়তো ঠিক ঠিক এভাবেই মনে পড়ে না। কিন্তু করতোয়ার ওপর দিয়ে মেঘ উড়ে যাচ্ছিল। আরশাদ নদী দেখতে পাচ্ছিল। আর মহাস্থানগড়ের সেই সব মুখ ফাঁক করা কুয়ো। যাদের ভেঙে ফেলবে ঐ সব ফরাসি মাটি-খুঁড়িয়েরা। তার আগে মডেল তৈরি করে নেবে এই সব কূপের। ঘাড় অবধি সোনালি চুলের সেই ফরাসিনী আমায় বলেছিল, আড্ডার মুডে। তার হাতে কাচের গ্লাসে তখন টলটলে রেড ওয়াইনের রঙবাহার। আমরা দুজনে যেমন ইংরেজি জানি, তাতে দুজনেরই চলে যায়। কুয়োর নিচে কুয়ো। তারও নিচে কুয়ো। পাতলা পাতলা পোড়ামাটির কত যে ইট। কত হাজার বছর আগের বৌদ্ধ

বিহার। সংঘারাম। বুদ্ধের মূর্তি। থাম। হয়তো তারও আগের কোনও হিন্দু মন্দির। এক জনপদের সরের ওপর অন্য জনপদ। এক ধর্মের সরের ওপর অন্য ধর্ম। ভিন্ন সভ্যতা। তাহলে শিকড় কোথায়? মানুষ আসলে কোথা থেকে এসেছে?

আলবদর, বলছিলেন যে— শুভজিৎ আরশাদকে আলোচনার সূত্রো ধরিয়ে দিতে চাইছিল।

অত্যন্ত ডেনজারাস, অর্গানাইজড ফোর্স। ফান্ডামেন্টালিস্ট। জামাত-এর ফাইটিং ফোর্স বলতে পারেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় এরা বেছে বেছে প্রগতিশীল মানুষদের কতল করেছে। এদের পেছনে বড় বড় ব্রেন আছে। থিয়োরিটিশিয়ানস্। পুরো ব্যাপারটাই তত্ত্ব আর আদর্শের ওপর দাঁড়িয়ে, অত্যন্ত অর্গানাইজড ওয়েতে। আপনারা, ইন্ডিয়ার অনেকেই গুলিয়ে ফেলেন রাজাকার-আলবদর। এই ধরন না মুক্তিযুদ্ধের সময়, রাজাকারদের হয়তো বলা হয়েছে নদী দিয়ে মুক্তিসেনাদের অস্ত্র বোঝাই নৌকো দেখলে খান সেনাদের খবর দিতে হবে। রাজাকার দেখছে পানিতে ভাসতে ভাসতে নাও আসছে। তার ভেতর মুক্তিযোদ্ধারা। কিন্তু রাজাকার এসবই দেখি না দেখি না করে টেলে দিল। পরে এমনও তো হয়েছে, যখন মুক্তিবাহিনী ঢুকছে গ্রামে, রাজাকাররাই প্রথমে 'জয় বাংলা' বলে চিৎকার করে উঠেছে। আলবদর কিন্তু এমন কাজ কখনও করবে না। করেনি।

ফাঁকা ঘরে দেওয়ালে কাঁটা নাড়ানো ইলেকট্রনিক কোয়ার্জের দিকে নজর পড়ে। এখন পৌনে চারটে। আরও পনের মিনিট পর বিকেলের চা। গরমের লম্বা দুপুর আর কাটতে চায় না। তাও তো মাস দেড়েক হতে চলল প্রায়, কলকাতায় আমার পুরনো বন্ধু ওয়াসিম হাসানের বাড়ির একতলায়। ঢাকাতে ক্যারিয়ারের গোড়ার দিকে একসঙ্গে সাংবাদিকতা করেছি। আইয়ুবের রেজিমে প্রপার্টি এক্সচেঞ্জ করে ইন্ডিয়ায় চলে এল— মিলিটারি সেনসরশিপ আর ডিকটেটরশিপে সাংবাদিকতা করা যায় না, এই যুক্তিতে। বিয়ে করল ইন্ডিয়ায়, বর্ধমানে। তারপর থেকে পশ্চিমবাংলায়। আসলে চৌষট্টির দাঙ্গার সময়েও অনেক সম্পত্তি বদল হল— এপারে ওপারে, তাই সেই সময়টায় খুব অসুবিধে হয়নি ওয়াসিমের।

তারপর মুক্তিযুদ্ধ শেষ হলে একাত্তরে ঢাকা গেছিল ওয়াসিম। ভাবি সমেত। আমার থেকে বছর দুয়েকের বড়। তাই ওর বিবিকে তো ভাবি বলতেই হয়। তো আমরা ঢাকা থেকে বগুড়া গেলাম। তারপর আবারও সেই মহাস্থানগড়।

সব ঠিক ঠিক আবিষ্কার হলে হয়তো হরপ্পা-মহেঞ্জদারো থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে মহাস্থানগড়। সভ্যতার আলো এখান থেকেই কি হেঁটে গেছিল পশ্চিমে! হরপ্পা-মহেঞ্জদারোর বহু যুগ পরের এই সব বৌদ্ধ বিহার, মূর্তি, রাজা রামপাল, কবি সন্ধ্যাকর নন্দী, কৈবর্ত বিদ্রোহী ভিম, দিব্যোকের কাহিনী শুনতে শুনতে, ভিমের জাঙাল ঘুরে দেখতে দেখতে আমার যেন কেমন মনে হয়— একটা ঘোরের ভেতর থাকি। আমরা দুই বন্ধু, ভাবি— আঞ্জুমান, মহসিনা— আমরা সবাই মহাস্থানগড়ের কাছাকাছি মিউজিয়ামের ভেতর অশোকের শিলালিপির সামনে দাঁড়িয়েছিলাম।

সম্রাট অশোক তাঁর শিলালেখে বলেছিলেন, পুণ্ড্রনগরে কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়েছে। এই আদেশবলে পুন্দনগরে (পুণ্ড্রনগরে) যিনি মহামাত্র আছেন, তাঁকে বলা হচ্ছে,

কী বলা হচ্ছে, কাচের বেড়ার ওপরে পাথরের ওপর খোদাই করা প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপিরা আমাদের দিকে তাকিয়েছিল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কথা বলে উঠছিল। প্রথম আদেশটির পয়লা লাইনটি ভেঙে যাওয়াতে ঠিকমতো বোঝা যায় না। দ্বিতীয়টিতে দেওয়া হয়েছে, বিপদপীড়িত প্রজাদের (এক মতে সংবন্ধীয়দের; অন্যমতে ছবগণীয় ভিক্ষুদের, সে যাঁরাই হোন, তাদের নেতার নাম ছিল গালদন) ধান আর সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় গগুক ও কাঞ্চনিক মুদ্রায় অর্থসাহায্য দেওয়ার আদেশ। এই সহায়তা ঠিক দান নয়, ধার। কারণ শিলালেখে রাষ্ট্র ও রাজা আশা আর ইচ্ছে প্রকাশ করছেন, এই সাময়িক সাহায্যে প্রজারা তাদের বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারবে আর তাদের সুদিন ফিরে আসবে। নতুন করে চাষবাসে দেশ শস্যসমৃদ্ধ হয়ে উঠলে প্রজারা রাজকোষে অর্থ আর রাজকোষ্ঠাগারে ধান ফিরিয়ে দেবে।

শিলালিপি কথা বলে যাচ্ছিল। এক একটি ব্রাহ্মী অক্ষর উড়ে উড়ে বসে যাচ্ছিল মাথার ভেতর।

বাইরে বিকেল হয়ে আসছে। দূরে থেকে হাওয়ায় ভেসে আসছিল বকুলগন্ধ। বাতাসে গরম। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে কয়েক মাস আগে। ভারতীয় ফৌজ তখনও সরে যায়নি। মহাস্থানগড়ের হাওয়ায় হাওয়ায় ফিস ফিস করে ভেসে বেড়াচ্ছিল— বৈরাগীর হাওয়ায় হাওয়ায় ফিস ফিস করে ভেসে বেড়াচ্ছিল— বৈরাগীর ধ্বংসাবশেষ। গোবিন্দভিটা খুঁড়ে ফেলে পাওয়া গেছে আরও মন্দির।

হাওয়া কথা বলছিল। বকুলের গন্ধ মিশিয়ে দিচ্ছিল মহাস্থানগড়ের ইটে, টিপিতে, মিউজিয়ামের কাচের শো কেসের গায়ে।

হিউয়েন সাঙ তো তাঁর বিবরণে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধস্তূপ আর বিহার দেখেছিলেন। অন্যান্য জনপদ— কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি, সমতটেও তিনি সম্রাট অশোকের তৈরি বৌদ্ধস্তূপ আর বিহার দেখতে পেয়েছিলেন। করতোয়ার পশ্চিম তটে জেগে থাকা মহাস্থানগড়ের ইট, কুয়ো আর মাটির টিপির ওপর দিয়ে বেলা



গড়িয়ে যাচ্ছিল। পোড়ামাটির ইতিহাস লাগা ইটেদের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম।

এবার ফিরে আয় এখানে। এখন তো আর আইয়ুব খান আর ইয়াহিয়া নেই। আরশাদের গলায় আন্তরিকতা।

একবার ছেড়ে চলে গেলে আর ফেরা যায় না। বলতে বলতে মাথা নিচু করে প্যান্টের পাশপকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল ওয়াসিম। কী একটা পাখি ডাকছিল দূরে। কাচের শো কেসে শিলালিপির ওপর আশেপাশে আমাদের দুই বন্ধু আর তাদের বিবিদের মাথামাখা ছায়া।

কেন, এখন তো সব অন্যরকম। নতুন দেশ। নতুন সরকার। জাতীয় সঙ্গীতও নতুন। আমরা স্বাধীন—

ওয়াসিম কোন উত্তর দিল না।

আপনার চা। সামনে নার্স এসে দাঁড়িয়েছে। ঘড়িতে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় চারটে। চা দেওয়ার সময় সিসটার একবার হাসবে। তখন তার গজদাঁতের এক কুচি হঠাৎই চোখে পড়ে যাবে। আর তখনই টলটলে পাতলা গ্রিন টি, দামি ক্রকারিজে নিতে নিতে আমার মনে পড়ে যায় অপারেশনের দিন চারেক পরে নার্সিংহোমে অন্য একজন সিসটার যখন বলে উঠেছিলেন, আপনার অপারেশন সাকসেসফুল— খুব ভাল হয়েছে। এখন সুস্থ হয়ে যাবেন। নর্মাল লাইফ।

অপারেশন নয়। অ্যামপিউট। আমি বুঝি একটু চিৎকার করেই বলেছিলাম।

সিসটারের পাশে দাঁড়ানো ঢাকার কলেজে ইংরেজি পড়ানো আমার ছোট ভাই। আমার বড় ছেলে। ছোট ছেলে। দু ছেলেই তাদের চাচার সঙ্গে ফ্লাইটে এসেছে। আবার প্লেনেই ফিরে যাবে।

অ্যামপিউট! অ্যামপিউট সাকসেসফুল। এ সব বলার সময় বেশ জোরেই চিৎকার করে উঠেছিলাম। কয়ের কাছে থুতু জমেছিল। দু একি ফোঁটা ছিটকে হয়তো বা বাইরেও।

কেউ কোন কথা বলতে পারছিল না। পরে জেনেছিলাম ভাই ঢাকা থেকে মরণচাঁদের মিষ্টি নিয়ে এসেছিল, আমি ভালবাসি।

আচ্ছা, এই সিসটারের হাসিতে কি মহাস্থানগড় থেকে পাওয়া শঙ্খের তৈরি সেই নারীমুখের মিল আছে? কোথায় কোথায়? আরশাদ চায়ের প্লেট হাতে স্মৃতি হাতড়াচ্ছিল। চোখের কোণে, ভ্রূভঙ্গিতে কি? নাকি চিবুকের ডৌলে? নাকের বাঁশিতে? কবে কি?

আরশাদ আলি দেখতে পাচ্ছিল গরমের কোন এক নেমে আসা সন্ধ্যায়, এই তো গত বছরই হবে, পাখিরা ডানা নেড়ে নেড়ে ঘরে ফিরছে, নিমের সবুজ সবুজ কচি পাতায় হাওয়ার দোল-দোলানি, ভাঙা ইটের পাঁজার ওপর ছড়িয়ে থাকা হলুদ হলুদ কলকে। মাথা নিচু করে ছিল সেই ফরাসিনী। খুঁড়তে খুঁড়তে পেয়ে যাওয়া শঙ্খের তৈরি মেয়েমুখের নানা টুকরো সিনথেটিক আঠায় জুড়তে জুড়তে, সে তো একটা আস্ত মুখই তৈরি করে নিতে পারে, যার চিবুকে বেলা শেষের গান। আর ফরাসিনীর টাইট ফেডেড জিনসে, সাদা চামড়ার ওপর টিলেঢালা লাল গেঞ্জিতে শেষ সূর্য লুটোচ্ছিল একটু আগেও। সেই নারীমুখ নিয়ে আর এক নারী প্রায় ফিসফিস করে বলে উঠছিল— আর্য। আর্য রমণী। এক সময় ট্রেডে যোগাযোগ ছিল বাইরের সঙ্গে—

কোথায়, কোথায় আর্য? কে আর্য? তুমি কি ওর চিবুকের ডৌল, ঠোঁট, সামান্য চাপা নাক দেখোনি? ও তো বাংলার মেয়ে। এই বাংলার। আমি বলতে চাইছিলাম। তার মোটা ঠোঁটের কোণে ফুটে থাকা বিষাদ, নাকি টুকরো হাসিই হবে হয়তো, সেই মুছে আসা বেলায়, আলোর নিসর্গে টুকরো জোড়া দেওয়া শঙ্খের সেই মুখ এক এক কোণ থেকে এক এক রকম দেখতে লাগছিল। তার অল্প ভারি ঠোঁটের বিষাদে, নাকি টুকরো হাসির রেখায় মহসিনা বসেছিল কি? আমার শাদি করা বিবি! আমি বুঝতে পারছিলাম না। আবার তার নাকফুল বসানো চাপা নাকে কি ওয়াসিমের বিবি— আঞ্জুমান! আমাদের ভাবি! কিংবা আরও কত কত নারী, যাদের দেখেছি এই জীবনে— কলকাতায়, ঢাকায়— বারে বারে? তার গাল, কানের গড়নে আমার মা-ও কি ছিল না?

আপনার চায়ে মিষ্টি ঠিক আছে?

চমকে উঠল আরশাদ আলি।

জি! ও হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঠিক আছে সিসটার। আমি তো মিষ্টি কমই খাই।

কেন, সুগার নেই তো আপনার— বলতে বলতে আবারও মেয়েটি গর্জনত টিপে হাসে। তার শ্যামলা মুখে কলকাতার রোদ ছুঁয়ে যায়। আর তখনই এই এক তলায়, ঘরের ভেতর মহাস্থানগড়ের সেই মহিলা-মুখ হেসে উঠতে থাকে। তার ওষ্ঠভঙ্গিতে কত হাজার বছরের মানুষের ইতিহাস।

বিস্কুট দেব আপনাকে?

নাহ্। মাথা নাড়ল আরশাদ।

আপনি একবার মহসিনাকে ডাকুন না প্লিজ— আরশাদ নিজের স্ত্রীর মুখে তখনই কিছু একটা পড়ে নিতে চাইছিল।

মহাস্থানগড়ের পাতাল থেকে উঠে আসা সেই শঙ্খমুখ কী যেন কী বলতে চাইছিল, পরিষ্কার বাংলাতেই। তার পাশে হাঁ হাঁ করে থাকা অন্ধকার-মুখ কুয়োরা। আরশাদ আর কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। □

# ঔপনিবেশিক পূর্বভারতে হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

বিনয় চৌধুরী

*(পূর্ব প্রকাশিতের পর)*

(৮)

আদিবাসীরা নানাভাবে হিন্দু সমাজসংগঠনের অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে—এ ধারণার সমর্থনে বিজলির দেওয়া দৃষ্টান্ত থেকে দুটো প্রবণতা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। অন্তত কয়েকটা ক্ষেত্রে (যেমন ভূমিজ, রাজবংশী) হিন্দু রীতি ও আচার গ্রহণে মুখ্য উদ্যোগ ছিল আর্থিক প্রতিপত্তিশীল কয়েকটা পরিবারের; তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল নিজেদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা; বৃহত্তর আদিবাসী সমাজের কল্যাণ-চিন্তার কোন প্রভাব এখানে ছিল না। বরং হিন্দু প্রভাবের ফলে এ সমাজের সঙ্গে তাদের ব্যবধান ক্রমেই দুস্তর হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, যেখানে এ সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের প্রস্তুতি হিসাবে ব্যাপক জনসমর্থনের দরকার ছিল, সম্পন্ন পরিবারগুলি নানাভাবে এ সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করেছে। সমর্থন মিললেও তার সামাজিক ভিত্তি ছিল একান্তই সীমিত। হিন্দু রীতি ও আচার গ্রহণের নানা নির্দেশ নানা কারণে জনসাধারণের কাছে গ্রহণীয় ছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কার আন্দোলনের নেতারাই চাননি যে সামাজিক মর্যাদা-দ্যোতক প্রতীক এবং আচার সবাই সমানভাবে গ্রহণ করুক।

সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ এবং হো সমাজে হিন্দুপ্রভাব বিস্তারের পটভূমিকা ও চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এ বিস্তারের ইতিহাস সব সময় একই রকম ছিল না। দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস এবং নানা ধরনের সংযোগের ফলে আদিবাসীরা হিন্দু-সংস্কৃতির কোন কোন দিক স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছে। বস্তুত, হিন্দু সমাজও আদিবাসী প্রভাব এড়াতে পারেনি। এ সাংস্কৃতিক সংযোগ বৃটিশ শাসনের অনেক আগে থেকেই দেখা গেছে। কিন্তু হিন্দু প্রভাবের দ্রুত প্রসার প্রধানত ঔপনিবেশিক আমলেই বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এ প্রসারের একটা বিশিষ্ট পটভূমিকা ছিল। তা হল, তার সঙ্গে আদিবাসীদের প্রতিরোধ আন্দোলনের একটা নিগূঢ় যোগ। স্বভাবতই প্রতিরোধের লক্ষ্য ও সংগঠনও হিন্দু প্রভাবের চরিত্রকে বহুলাংশে নির্ধারিত করেছে। আদিবাসীরা বিশ্বাস করত, প্রতিরোধের সফলতার জন্যই হিন্দু-সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষ দিক গ্রহণ অপরিহার্য। আর এ প্রতিরোধ গোটা সমাজের স্বার্থেই। পক্ষান্তরে, ভূমিজ বা রাজবংশী সমাজে হিন্দু প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে প্রতিরোধ আন্দোলনের কোন যোগ সচরাচর ছিল না। হিন্দু-সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ কয়েকটি বিশেষ আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; তাদের মূল লক্ষ্য ছিল নিজেদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, অন্যান্যদেরও তারা তাদের কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছে, কিন্তু একান্তই নিজেদের স্বার্থে।

(৮.১)

প্রথমে আমরা সাঁওতালদের কথা বলব। সরকারি দলিলের বিক্ষিপ্ত উল্লেখ থেকেও কয়েকটি জিনিস স্পষ্ট হয়। নানা কারণে নতুন আবাদের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়া নানা সাঁওতাল গোষ্ঠী বহু হিন্দু-প্রভাবিত অঞ্চলে গ্রাম পত্তন করে। জমিদারেরাও এ বিষয়ে স্বভাবতই উদ্যোগী ছিল, বিশেষ করে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে বিপুল জনক্ষয়ের পর। কিন্তু কৃষিকাজে নিপুণতা সত্ত্বেও সাঁওতালদের হিন্দু জমিদারেরা নিজেদের সমাজ-সংগঠনে গ্রহণ করেনি। সাঁওতাল উপনিবেশ ছিল গ্রাম-সীমানার বাইরে। হিন্দুদের গরুর দুধও তারা দুইতে পারত না। বুকাননের 'ভাগলপুর বিবরণ' [৯৮] থেকে জানতে পারি, এ নিষেধের ব্যত্যয় ঘটলে গোটা হিন্দু সমাজ প্রতিবাদ করত। সম্ভবত এ ধরনের নিষেধ শুধুমাত্র ভাগলপুরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কিন্তু বর্ণহিন্দুগোষ্ঠীর এ মানসিকতা সত্ত্বেও হিন্দু ও সাঁওতাল সংস্কৃতির মধ্যে দূরত্ব এবং ব্যবধান কোথাও সম্পূর্ণ দুর্লঙ্ঘ্য হয়নি।



হিন্দু সমাজেও সাঁওতাল প্রভাব পড়েছে। ১৮৬৮ সালে লেখা বীরভূমের উপর হাণ্টারের বিবরণীতে এর দৃষ্টান্ত মেলে। এটা ধরে নেওয়া যায়, এ প্রভাব একেবারে সাম্প্রতিক কালে ঘটেনি। এ প্রসঙ্গে হাণ্টার হিন্দু সমাজে প্রচলিত কোন কোন ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচারের উল্লেখ করেছেন[৯৯]: যেমন গ্রাম-দেবতার পূজা, অমঙ্গলের দ্যোতক নানা দেবদেবীর পূজা, অশুভ উদ্দেশ্যে মন্ত্র ও যাদু শক্তির প্রয়োগ। হাণ্টারের এ সিদ্ধান্ত অবশ্য বিচার-সাপেক্ষ। তাঁর যুক্তি হল: ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং অনুশাসনের সঙ্গে এ সব বিশ্বাস ও আচার সংগতিপূর্ণ নয়; তাই এদের উৎস অন্য জায়গায়; যেহেতু হিন্দুদের সংস্পর্শরিক্ত প্রতিবেশী সাঁওতাল সমাজে এ সবের চল ব্যাপক, হিন্দুরা সেখান থেকেই এ সব গ্রহণ করেছে। হাণ্টারের এ যুক্তি সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। এমনও বলা চলে, হিন্দু সমাজের সব স্তরে ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন সমান কার্যকরী ছিল না। কোন কোন হিন্দুগোষ্ঠী হয়তো বহুলাংশে এ প্রভাব-বর্হিভূত ছিল; তাই সেখানে এ সব প্রচলিত বিশ্বাস টিকে ছিল। এবং যে কারণে সাঁওতাল সমাজে এদের উদ্ভব হয়েছিল, তা হিন্দু সমাজের এ সব গোষ্ঠী সম্পর্কেও প্রযোজ্য। যেমন প্রকৃতির শক্তি নিয়ন্ত্রণের অধিকার সীমিত বলেই মন্ত্রশক্তি ও যাদুবিদ্যা, টুক্-তাক্ ইত্যাদির উপর নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়েছে, যদিও এ অধিকার আয়ত্তে এলেও এ ধরনের বিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়ে যায় না। তাই এ সব বিশ্বাসের প্রচলন শুধুমাত্র সাঁওতাল সমাজের বৈশিষ্ট্য তা বলা যায় না।[১০০]

হাণ্টার কিন্তু সাঁওতাল সমাজের উপর হিন্দুবিশ্বাস, আচার ইত্যাদি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রভাবের কথা বলেননি। তার একটা ধারণা ছিল, সাঁওতালরা যথা সম্ভব নিজেদের হিন্দু সমাজ থেকে সচেতনভাবে আলাদা করে রেখেছে। তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন ব্যবহারিক জীবনে এ বিচ্ছিন্নতা মোটেই সর্বব্যাপী ছিল না। কারণ অর্থনৈতিক কারণে কোন কোন হিন্দুগোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীলতা ছিল অপরিহার্য। যেমন কামার।[১০১] এ একটা মাত্র হিন্দু গোষ্ঠীকে সাঁওতালরা সহজে মেনে নিয়েছে। সাঁওতালদের সব ধরনের লোহার কাজ কামারেরা করে দেয়। আরও এক হিন্দু সম্প্রদায়কে তারা গ্রামে বাস করার অনুমতি দিত—অবশ্য গ্রামের একেবারে প্রান্তস্থ সীমায়। তারা বাঁশ বা পাতা দিয়ে নানা ধরনের ঝুপড়ি বানাত। হাণ্টার অবশ্য বলেছেন হিন্দু হিসাবে এ দুই গোষ্ঠীরই স্বাতন্ত্র্য ক্রমেই লোপ পেয়েছে। দীর্ঘদিন এক সঙ্গে থাকার ফলে তারা প্রায় সাঁওতাল সমাজের অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল।

হাণ্টার লক্ষ করুন বা না করুন, বৈষয়িক ক্ষেত্র ছাড়াও সাঁওতাল সমাজের উপর হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবের প্রমাণ নানা দিক থেকে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। সম্ভবত এ প্রভাবের প্রসার দীর্ঘদিন ধরে ঘটছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫) সম্পর্কিত সরকারি চিঠিপত্রে এ প্রভাবের নিদর্শন মেলে। এর চরিত্র সম্পর্কেও মোটামুটি একটা ধারণা করা সম্ভব। ১৮৭০-এর দশকের সরকারি দলিলে অনেক বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হিন্দু প্রভাবের নানা দৃষ্টান্ত এর সঙ্গে তুলনা করলে বিদ্রোহোত্তর সময়ে এ প্রভাব বিস্তারের নতুন বিশিষ্ট প্রবণতাগুলি ধরা পড়বে এবং এ বিস্তারের পটভূমিকাও বোঝা যাবে।

এ সম্পর্কেও একটা কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে। যে সব ঘটনা আমরা হিন্দু-প্রভাবের নিদর্শন বলে ধরে নিচ্ছি, তা সাঁওতাল সমাজের একান্ত নিজস্ব পরিবর্তনের ফলও হতে পারে। এ বিষয়ে যে কোন সিদ্ধান্ত আরও গবেষণা-সাপেক্ষ। আমরা অবশ্য সে সব দৃষ্টান্তই উল্লেখ করব, যেখানে হিন্দু-প্রভাব সম্ভবত অনেক বেশি সক্রিয় ছিল।

(৮.২)

প্রথম দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা বিদ্রোহ শুরু হবার কয়েক সপ্তাহ আগে দুই প্রধান নেতা সিধু ও কানুর একটা ঘোষণা[১০২] উল্লেখ করতে পারি। তা হল: ভগবান প্রত্যক্ষভাবে তাদের কাছে আবির্ভূত হয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গেছেন। শত্রুর বিনাশের জন্য সাঁওতালরা সম্মিলিত বিদ্রোহ করুক; তাদের জয় অনিবার্য, কারণ দিব্য অতিপ্রাকৃত শক্তি তাদের হয়ে লড়বে। সিধু কানু এ ভগবানকে সব সময় 'ঠাকুর' বলে উল্লেখ করেছে; কিছুদিনের মধ্যেই তারাও সাঁওতাল মানসে রূপান্তরিত হয়ে গেল ঠাকুরে।[১৩]

এ ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলা দরকার। কোন বিশেষ ব্যক্তির কাছে ভগবানের আবির্ভাবের ঘটনা প্রাচীন সাঁওতালি ধর্মচিন্তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। সাঁওতাল পুরাণে পরম স্রষ্টা অদৃশ্য; এ অদৃশ্য শক্তির মূর্তরূপে প্রকাশের কোন উল্লেখ তাতে নেই। এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সাঁওতাল গুরু 'কলিয়ান' ১৮৭১ সালে সাঁওতালি ঐতিহ্যের যে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে এ ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাসের কোন কথা নেই। তিনি এমন কোন কথাও বলেননি যে, কোন বিশেষ সাঁওতাল পরমস্রষ্টার অবতার হতে পারে।

সাঁওতালি ধর্ম-পুরাণে পরম-স্রষ্টার নাম মারাঙ বারু[১৪]; সিধু-কানু তাদের প্রথম ঘোষণা বা পরবর্তী কোন নির্দেশে তাদের কাছে আবির্ভূত দেবতাকে এ নামে উল্লেখ করেনি। তাদেরও অনুগামীরা ঠাকুরজি বা ঠাকুর-সুরা বলে ডেকেছে। সাঁওতালদের পূজার্চনার নির্দিষ্ট জায়গা 'মাঝিস্থান' এবং 'পবিত্র কুঞ্জ' (Jaher)[১৬] নতুন দেবতার আরাধনার কোন কথা বলা হয়নি। সিধু কানু গোটা সাঁওতালজাতিকে বলেছে, সবাই যেন ভাগনাহিহির সে জায়গায় আসে, যেখানে ঠাকুর আবির্ভূত হয়ে তাদের কাছে 'হুলের' (বিদ্রোহের) নির্দেশ দিয়ে গেছেন। 'ঠাকুরে'র পুজার

জন্য নির্বাচিত জায়গার বিশেষত্ব এমন কিছু ছিল না। সাধারণত সাঁওতালদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রধান ভূমিকা 'মাঝি' (গ্রামপ্রধান) বা 'নায়েক'-এর (গ্রাম পুরোহিত)। এখানকার অনুষ্ঠানে তাদের কোন দায়িত্ব ছিল না। অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ ভার ছিল সিধু-কানু বা তাদের বিশেষ বিশ্বাসভাজন কয়েকজন মাত্র অনুগামীর উপর। পূজানুষ্ঠান সম্পূর্ণ বাহুল্যবর্জিত; কিন্তু পরিবেশ পবিত্রতামণ্ডিত; পূজার উপকরণের মধ্যেও এ শুচিতার আভাস। নতুন 'ঠাকুরে'র প্রত্যক্ষ দর্শনের জন্য যারা আসবে, নির্দেশ ছিল পূজার নৈবেদ্য হিসাবে তারা যেন প্রত্যেকে এক ঘটি দুধ আনে।[৭৭] ঠাকুরের মাথায় তা ঢালা হবে। তাছাড়া, দোয়া মাঝির কাছে পাঠানো সিধু-কানুর এক 'পরওয়ানা'য় বলা হয়েছে পূজার উপকরণ হিসাবে সোনা, রুপো, তামা, পেতল, লোহা, ষাঁড়, গরু ইত্যাদি যা যা জিনিস অনুগামীরা আনবে, দোয়া মাঝি সব কিছুই খুব যত্ন করে পরখ করে দেখবে।[৭৮] দুই নেতা ঠাকুর দর্শনার্থীদের বিশেষ করে বলেছিল, তারা যেন অত্যন্ত শুচি ও নিষ্কলুষ মন নিয়ে আসে। পরে যুদ্ধক্ষেত্রে সাঁওতালদের ব্যাপক বিপর্যয় আর ক্ষয়ক্ষতির কথা তাদের বলা হলে, নেতারা কারণ হিসাবে বলে, অনুগামীরা যথার্থ শুদ্ধাচারী ছিল না।

আগেই বলেছি, 'ঠাকুরের' এ ধারণা, সাঁওতাল ধর্মীয় ঐতিহ্যসম্মত নয়। সাঁওতালদের দীর্ঘকালের উপাস্য কোন দেবদেবীর সঙ্গে এ 'ঠাকুর' তুলনীয় নয়; সাঁওতালদের পরমস্রষ্টা নিরাকার; কিন্তু ভাগনাদিহির ঠাকুরের এক মূর্তি কল্পনা করা হয়েছে; একটা বর্ণনা অনুযায়ী তা গরুর গাড়ির চাকার মতো।[৭৯]

'ঠাকুরের' ধারণা, সিধু-কানুর কাছে তার আবির্ভাব এবং তার নির্দেশে সব রকমের নিপীড়ন-শোষণহীন পরম সমৃদ্ধিময় এক সাঁওতাল সমাজের আসন্নতা সম্পর্কে দুই নেতার প্রত্যয়-দৃপ্ত ঘোষণা—এ সবের উপর কেউ কেউ খ্রিস্টীয় ধারণার প্রভাবের কথা বলেছেন। সাঁওতাল বিদ্রোহ-সংক্রান্ত বিপুল পরিমাণ সরকারি দলিলে এ সম্পর্কে একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। সিধু বলেছিল, কিছু কাগজপত্র, বই আকাশ থেকে তার বাড়ির প্রাঙ্গনে পড়েছিল। মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট সেগুলি পরীক্ষা করে দেখেন, আসলে 'তা সেন্ট জন্ কথিত সমাচারের অনুবাদ' মাত্র।[৮০]অন্য কোন সূত্র থেকে এর সমর্থন মেলে না। সরকারি আমলাদের কাছে সিধু-কানু এবং তার অনুগামীদের বিস্তারিত জবানবন্দিতে এর কোন উল্লেখ নেই। এমনকি রাজপুরুষদের কাছে পাঠানো ও সব অঞ্চলের খ্রিস্টান মিশনারিদের লিখিত বিবৃতিতেও এ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। ১৮৭১ সালে নরওয়ের এক মিশনারির (Skrepsrud) কাছে সাঁওতাল 'গুরু' কলিয়ানের সাঁওতাল ঐতিহ্যের বর্ণনায় সাঁওতালদের ভগবানকে 'ঠাকুর' বলা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'ঠাকুর' অভিধাকে হিন্দু প্রভাবের নিদর্শন বলে মনে করা হয়েছে; এবং সাঁওতাল ঐতিহ্যের আরও কোন কোন দিকে সুস্পষ্ট হিন্দু প্রভাবের কথা বলা হয়েছে।[৮১] সাঁওতাল বিদ্রোহ-সংক্রান্ত সরকারি দলিলেও এর প্রমাণ মেলে। বিদ্রোহীদের ঘাঁটি থেকে পাওয়া সিধু-কানুর নির্দেশ-সম্বলিত একটা লিখিত বার্তায় বলা হয়েছে: 'সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, সব যুগেই ন্যায়, নীতি আছে'।[৮২] এখানে অবশ্য বিভিন্ন যুগের স্বাতন্ত্র্য, তাদের সঙ্গে জড়িত উৎকর্ষ, অপকর্ষ, শুভ, অশুভ বোধের কোন উল্লেখ নেই। মুণ্ডা-আন্দোলনের নেতা বীরসার ঘোষণায় নিরবচ্ছিন্ন সুখ, শান্তি এবং উৎকর্ষের প্রতীক হিসাবে 'সত্য' যুগের কথা বলা হয়েছে। বিদ্রোহী সাঁওতালদের অন্য কোন কোন মঙ্গলাচারের মধ্যেও হিন্দু প্রভাব সুস্পষ্ট। যেমন একটা চিঠিতে উল্লেখ আছে, বীরভূমের সাঁওতালরা পরম নিষ্ঠায় দুর্গাপূজার আয়োজন করছে; ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য ছাড়া এ পূজা অসম্পূর্ণ থাকবে বলে বিদ্রোহীরা দুজন ব্রাহ্মণকেও নিয়ে এসেছে, সম্ভবত খানিকটা জোর খাটিয়ে; যে সব গ্রাম বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে, এ দুই ব্রাহ্মণের বাস সেখানেই।[৮৩]

## (৮.৩)

বিদ্রোহের সময় সাঁওতালদের হিন্দু-সংস্কৃতির কোন কোন দিক গ্রহণের তাৎপর্য সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যার বিচার এখানে প্রাসঙ্গিক হবে।[৮৪] এ ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এ গ্রহণ এবং সচেতন অনুকরণ বিদ্রোহীদের প্রভুগোষ্ঠীবিরোধী মানসিকতার একটা বিশিষ্ট দিক।

এ প্রভুত্বকে সংঘবদ্ধভাবে অমান্য করার প্রয়াস এবং মনোভাব নানাভাবে প্রকাশ পায়। প্রতিরোধের মুখ্য লক্ষ্য অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত এ প্রভুত্বের অবসান ঘটানো, যদিও এই লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলাদা হতে পারে। যেখানে এ প্রভুত্ব-চেতনা কতগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রভুশ্রেণীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়াসের মধ্যে প্রকাশিত হয়, প্রতিরোধের রূপও সেখানে আলাদা। যেমন, সামাজিক আদব-কায়দায়, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছেদ, যানবাহন ইত্যাদির ব্যবহারে, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য প্রভুগোষ্ঠীর লোকেরা অধীনস্থদের উপর নানা বাধানিষেধ আরোপ করে। অভ্যস্ত দৈনন্দিন জীবন-যাপনে এ নিষেধ সাধারণত মানা হত বলে এ প্রভুত্ব-চেতনার মূলও ক্রমেই দৃঢ় হয়। সম্মিলিত প্রতিরোধের সময়ে বিদ্রোহীরা এ নিষেধকে আর মানে না। কারণ এ নিষেধ ভাঙ্গার মাধ্যমেই প্রভুত্বের অস্বীকার প্রকাশ্যে ঘোষিত হয়।

পূর্বোল্লেখিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী সাঁওতালদের হিন্দু বিশ্বাস, আচার গ্রহণও এ বিদ্রোহী মানসিকতারই একটা প্রকাশ। যে ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার ও রীতি প্রভুগোষ্ঠীর মূল্যবোধের একটা বিশিষ্ট দিক সাঁওতালদের তা গ্রহণ করার অর্থ, এ মূল্যবোধ



শুধুমাত্র প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; অধীনস্থ সাঁওতালরাও তাকে তাদের জীবন-চর্যার অংশ হিসাবে আত্মসাৎ করে নিচ্ছে। ব্যাখ্যাকার মনে করেন, এটা প্রভুশ্রেণীর কর্তৃত্বের উপর অধীন সাঁওতালদের সুপরিকল্পিত আঘাত।

সাঁওতালদের হিন্দু ধর্মীয়-আচার অনুকরণের কয়েকটা দৃষ্টান্ত[৮৫] তিনি দিয়েছেন, বিশেষ করে শুদ্ধাচারসম্মত ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের। যেমন, এক সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিদ্রোহীদের পরিকল্পনা ছিল, পূজান্তে গঙ্গায় স্নান সেরে তারা রাজমহলের দিকে এগোবে; বিদ্রোহীদের এক নেতা কানু নিজেই মহেশপুরের যুদ্ধের এক সংকটময় মুহূর্তে পূজার আয়োজন করেছে; আর এক নেতা তার ভাই সিধুরও নাকি ইচ্ছা ছিল, এবার খুব ধুমধামের সঙ্গে, জাঁকজমক করে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করবে; এ অনুষ্ঠান যাতে পূর্ণাঙ্গ হয়, তার জন্য দু'জন ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে বিদ্রোহীরা জোর করে নিয়ে এসেছে।

এ সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পিছনে বিদ্রোহীদের মনোভাব সম্পর্কে এ ধরনের সিদ্ধান্ত বিচার-সাপেক্ষ। এ বিচার অবশ্যই কঠিন। সরকারি প্রতিবেদনে কয়েকটা বিক্ষিপ্ত উল্লেখ ছাড়া এ সিদ্ধান্তের সমর্থনসূচক অন্য কোন উপকরণ নেই। বিদ্রোহীরা এ সম্পর্কে সত্যি কী ভাবত, তাও জানি না। কিন্তু শুধুমাত্র এ ধরনের উপকরণ নেই বলেই এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়, এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অসঙ্গত হবে। এ ব্যাখ্যার বিচার প্রসঙ্গে তাই কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানা প্রয়োজনীয়। যেমন, সাঁওতালদের দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান বা তাতে যোগদান কি বিদ্রোহের সময়ই প্রথম ঘটেছিল? যেখানে দুর্গাপূজার কথা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি, সেখানে সরকারি প্রতিবেদনে উল্লেখিত 'পূজা'র অর্থ কী? দুর্গাপূজায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের ভূমিকা বা পূজা শেষে স্নান ইত্যাদি কি অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

আলোচ্য ব্যাখ্যায় কোথাও পরিষ্কার করে বলা হয়নি যে, সাঁওতালদের দুর্গাপূজা এর আগে কখনও হয়নি। এটা ধরে নেওয়া যায় আগেও এ ঘটনা ঘটেছে; কারণ কোন পূর্ব-পরিচয় ছাড়া শুধুমাত্র প্রভুশ্রেণীর কর্তৃত্বকে আঘাত করার জন্যই সাঁওতালরা সম্পূর্ণ নতুন এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা আচার অনুকরণ করবে, তা ঠিক যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। এটা লক্ষণীয় যে পূজানুষ্ঠানের দৃষ্টান্তগুলি প্রধানত বাঙালি-অধ্যুষিত বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ অঞ্চল থেকে নেওয়া। সম্ভবত দীর্ঘকাল বাঙালিদের পাশাপাশি বসবাসের ফলে হিন্দুদের সর্বশ্রেষ্ঠ পূজোৎসব দুর্গাপূজার সঙ্গে তাদের পরিচিতি এবং তাতে নানাভাবে যোগদান স্বাভাবিক ছিল। বিশেষ করে, এ অনুষ্ঠানে যোগদান ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রেরণায় হয়েছে, তা মোটেই নয়। কারণ অন্যান্য অনেক উৎসবের মতো দুর্গোৎসবও আনন্দের উৎসব; আনন্দ পাবে বলেই সাঁওতালরা এতে যোগ দিয়েছে।

কিন্তু সাঁওতালদের নিজস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মূল প্রেরণা শুধুমাত্র এ আমোদ-প্রিয়তা নয়। এটা তাদের বিশিষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত; তার আচারবিধিও সুনির্দিষ্ট। মিশনারির কাছে সাঁওতাল ঐতিহ্যের বর্ণনায় সাঁওতাল 'গুরু' কলিয়ান (১৮৭১) এ পার্থক্যের কথা বলেছেন। "দিখুদের থেকে মাঝে মাঝে আমরা কোন কোন উৎসব নিয়েছি। তবে তাদের মধ্যে মাত্র একটাই আমরা গ্রামের সবাই পালন করি। তা হল করম উৎসব[৮৬]। সে সময় আমরা বেলাওঞ্জা ফুল, আতপ চাল, দুর্বাঘাস, তেল আর সিঁদুর কর্মু এবং ধর্মু ঠাকুরকে দিই। দিখুদের থেকে নেওয়া অন্যান্য উৎসবে শুধুমাত্র সে ব্যক্তিই পুজো করে, যে এসব উৎসব পালন করে; আমরা শুধু যাই দেখার জন্য; আমরা পুজো করিনা। দুর্গোৎসবে তারা দুর্গাকে, কালীপুজোর উৎসবে কালীকে, মনসার উৎসবে মনসাকে ... তারা অঞ্জলি দেয়; ...কিন্তু এ সব উৎসব সাঁওতালদের নয়; তাই অন্য জাতের 'বোংগাদের' এ ধরনের অঞ্জলি দেওয়া সাঁওতালদের পক্ষে ঠিক কাজ নয়। ফলে আমাদের বোংগারা আমাদের উপর বিরক্ত হয়। এটা যেন একই সঙ্গে এক স্ত্রী এবং সতীন নিয়ে ঘর করা; আমরা কাকেও সন্তুষ্ট করতে পারি না।"[৮৭]

কলিয়ানের বিবরণ থেকে দুটি জিনিস স্পষ্ট হয়। সাঁওতালদের হিন্দু উৎসবে যোগদান মোটেই সাম্প্রতিক ঘটনা নয়। বস্তুত দীর্ঘদিন পাশাপাশি থাকার ফলে দুই সংস্কৃতির মধ্যে ব্যবধানও ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে গেছে। সাঁওতাল গুরু কলিয়ানের ধারণা, সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকাই বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু কলিয়ান এ কথাও পরিষ্কার বলেছেন, 'অন্য জাতির বোংগা'কে 'অঞ্জলি' দিলেও সাঁওতালদের একেবারে নিজস্ব রীতিতে, নিজেদের দেবদেবীর পুজোও অব্যাহত ছিল। তাছাড়া দিখুদের থেকে নেওয়া উৎসবে সাঁওতাল গ্রাম-পুরোহিতের কোন ভূমিকা ছিল না। এখানে যথারীতি ব্রাহ্মণের ভূমিকা অপরিহার্য ছিল।[৮৮] বিদ্রোহের সময় দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের উপস্থিতি সম্ভবত এ কারণেই অপরিহার্য ছিল। পুরোহিত ছাড়া পুজো সম্পূর্ণ হয় না অথচ সাঁওতাল পুরোহিত দুর্গাপুজোয় পৌরোহিত্য করবে না। সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুই ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে প্রায় জোর করে নিয়ে আসা হয়েছে। এরও একটা ব্যাখ্যা সম্ভব। পুরোহিতদের গ্রাম তখন বিদ্রোহীদের অধিকারে। যে কোন কারণেই হোক[৮৯], হিন্দুগ্রামে দলবদ্ধ বিদ্রোহীদের আগমন ব্যাপক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। আতঙ্কে অনেক হিন্দু তাই সাময়িকভাবে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিল। সম্ভবত, এ দুই ব্রাহ্মণ পুরোহিতও তাদের মধ্যে ছিল। অথচ তাদের ছাড়া দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। তাই জোর খাটিয়ে ওদের আনতে হয়েছিল।

সরকারি রিপোর্টে উল্লেখিত 'পূজা' এবং শুদ্ধাচার হিসাবে 'গঙ্গায় স্নান'ও হিন্দু আচার অনুকরণের দৃষ্টান্ত না হতে পারে। 'পূজা' বলতে হিন্দু-আচার-সম্মত পুজো নাও হতে পারে। অন্যান্য অনেক ধর্মের মতো, সাঁওতাল ধর্মেও পুজো একটা নির্দিষ্ট অংশ। এর সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস জড়িত। বিদ্রোহের সময় এ পুজোর আলাদা মূল্যও সম্ভবত ছিল। (আমাদের আলোচ্য ব্যাখ্যাতেও এ-কথা বলা হয়েছে)।[৯০] বিদ্রোহীরা হয়তো ভেবেছিল, বিদ্রোহে তাদের সাফল্য পুজোতে খানিকটা সুনিশ্চিত হতে পারে। শুদ্ধাচারের অঙ্গ হিসাবে নদীতে স্নানও সাঁওতাল ধর্মীয় বিশ্বাসসম্মত। অবশ্য সাঁওতালদের পুরাকথায় তাদের এ পবিত্র নদী গঙ্গা নয়, দামোদর। তাদের ধর্মীয় চেতনায় এ নদীর বিশিষ্ট প্রভাব। দামোদরের জলে তারা সম্মিলিতভাবে মৃত পূর্বপুরুষদের চিতাভস্ম ফেলে[৯১]। হান্টার বীরভূমের সাঁওতালদের ক্ষেত্রে এ প্রথার ব্যাপক প্রভাবের কথা লিখেছেন। বছরে অন্তত একবার দামোদর না যাওয়া সাঁওতাল সমাজ ভাল চোখে দেখত না; এর ফল সামাজিক মর্যাদাহানি।[৯২]

আমরা বলতে চেয়েছি, বিদ্রোহের সময় সাঁওতালদের নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রভুশ্রেণী হিন্দুদের সাংস্কৃতির মূল্যবোধের উপর সচেতনভাবে আঘাত হানার দৃষ্টান্ত হিসাবে গণ্য না করলেও চলে। এর সম্ভাব্য বিকল্প ব্যাখ্যা আমরা নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছি। এটা অনস্বীকার্য যে বিদ্রোহের আগে থেকেই হিন্দু প্রভাব নানা ভাবে সক্রিয় ছিল।

(৯)

বিদ্রোহের সময়কার নানা ঘটনায় হিন্দু প্রভাবের কোন কোন নিদর্শন দেখা গেলেও তা স্বতন্ত্রভাবে সক্রিয় ছিল না। সাঁওতালদের একান্ত নিজস্ব বিশিষ্ট ঐতিহ্যের সঙ্গে তা অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গিয়েছিল। বস্তুত, বিদ্রোহীদের মানসিকতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাঁওতালি ঐতিহ্যের প্রভাব অপেক্ষাকৃত অনেক গভীর ছিল। বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য এবং শত্রুকে প্রতিরোধ করার নানা উপায় সম্পর্কে বিদ্রোহী নেতাদের দৃপ্ত ঘোষণা এবং গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহের দ্রুত পরিবর্তমান সমাজ সংগঠনের উপর নানা ধারণার প্রভাব আলোচনা করলে এটা স্পষ্ট ধরা পড়ে।

আসলে ঘোষিত উদ্দেশ্যের বিশিষ্ট প্রকৃতির জন্যই বিদ্রোহীদের মানসিকতায় সাঁওতালি ঐতিহ্যের প্রভাব গভীর এবং সুদূরপ্রসারী হতে পেরেছিল। নেতারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিল, বিদ্রোহের লক্ষ্য শুধুমাত্র সাঁওতালদের দীর্ঘদিনের নানা অভিযোগের আংশিক প্রতিকার নয়। তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, বিদ্রোহের সাফল্যে সম্পূর্ণ নতুন এক সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হবে; সাঁওতালদের ক্রমবর্ধমান দুর্দশা এবং সার্বিক বিপর্যয়ের মূল উৎস 'দিখু' কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ঘটবে; আর পুনপ্রতিষ্ঠিত হবে স্বাধীন 'সাঁওতাল রাজ'। সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং 'সাঁওতাল রাজ' ফিরে পাবার নিশ্চিত আশ্বাস না থাকলে সাঁওতালি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে বিদ্রোহীরা এতখানি সচেতন হত না।

এ সচেতনতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে নেতাদের ঘোষণায় ও নির্দেশে ব্যবহৃত নানা প্রতীক ও উপমায়, যাদের উৎস প্রধানত সাঁওতালি লোকগাথা এবং পুরাকাহিনী। কোন কোন শব্দের ব্যবহার হিন্দু প্রভাবকেও সূচিত করে; কিন্তু সাঁওতালি ঐতিহ্য-সম্পৃক্ত প্রতীকের অনুষঙ্গ এ শব্দের ব্যঞ্জনাকে ছাপিয়ে উঠেছে।

কয়েকটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। বিদ্রোহের কিছু সময় আগে দিখু গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে প্রচারিত প্রকাশ্য পরওয়ানায় নেতারা দ্ব্যর্থহীন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল যে, সাঁওতালদের সম্পর্কে তাদের অভ্যস্ত নীতি ও মানসিকতা না পাল্টালে সর্বাত্মক বিদ্রোহ অনিবার্য হবে এবং এর ফলে দিখুরা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হবে। সতর্কবাণীগুলির মধ্যে একটা ছিল 'সাহেব'সুবাদের সম্পর্কে। সাহেবদের উপস্থিতি এবং কর্তৃত্ব ছিল সাঁওতালদের কাছে সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত; কারণ শাসক হয়েও নানা উৎপীড়ন থেকে তারা সাঁওতালদের রক্ষা করার কোন চেষ্টা করেনি। নেতারা তাই বলেছিল, তারা স্বেচ্ছায় সাঁওতাল এলাকা থেকে কর্তৃত্ব ছেড়ে চলে যাক। এটা বোঝানোর জন্য নেতারা বলেছিল, যদি সাহেবকুল তাদের পরওয়ানা মানতে সম্মত না হয়, তারা যেন গঙ্গার 'অপর পারে' চলে যায়; সাঁওতালদের সম্পর্কে তাদের চিরাচরিত মনোভাব পাল্টালেই গঙ্গার 'এপারে' তাদের উপস্থিতি সাঁওতালরা মেনে নেবে।[৯৩] গঙ্গার 'এপার' 'ওপার'-সম্পর্কিত নেতাদের এ ধারণার সংগে সাঁওতাল বসতি বিস্তারের ইতিহাস জড়িয়ে আছে।[৯৪] নিশ্চিত জীবিকার জন্য নতুন জমির সন্ধান অনিবার্য হলেও একটা বিশেষ ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করার কথা সাঁওতালদের 'পূর্বপুরুষেরা' অনুমোদন করেনি। এককালে অনুমোদিত শেষ সীমা ছিল অজয় নদী। 'অজয় পার হয়ে যাবে না'—এ ছিল নিষেধ। সতর্কবাণী ছিল, এ নিষেধ অমান্য করার ফল হবে মারাত্মক; যেমন অমান্যকারী পরিবারের ক্ষেত্রে ভ্রূণস্থ সন্তানের বিনাশও বিধেয়। কিন্তু জীবনধারণের অপ্রতিরোধ্য প্রয়োজনে এ নিষেধ অনবরতই লংঘিত হয়েছে। এ লংঘনের সীমা ক্রমেই বেড়ে চলেছে বলে সাঁওতাল গুরু কলিয়ান নিজের আশংকা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছিলেন: 'কেউ কেউ রাজমহল পেরিয়ে গঙ্গার অপর পারে চলে গেছে। ঠাকুর কেন যে আমাদের এ ভাবে শাস্তি দিচ্ছেন, তা তো জানি না'।[৯৫] গঙ্গার 'অপর পার' যে সাঁওতালি জগৎ



থেকে বিচ্ছিন্ন, অন্য গোষ্ঠীপ্রভাবিত এলাকা, এবং ঐ অপর পারে যাওয়া যে সাঁওতাল সমাজে অনুমোদিত ছিল না, এ ধারণা নিঃসন্দেহে অনেক আগে থেকেই গড়ে উঠেছে।

সাবেক বসতি ছেড়ে গঙ্গা পার হয়ে যাওয়া সাঁওতালি ধারণায় গর্হিত কাজ বিবেচিত হলেও শত্রু-বিনাশে 'গঙ্গা-মায়ের' বিশিষ্ট ভূমিকার কথা কিন্তু বিদ্রোহী-নেতা সিধুর পরওয়ানায় বারবার বলা হয়েছে।[৯৬] অধ্যাত্ম বিষয়ে গঙ্গার বিশিষ্ট স্থান সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণা সিধুর এ বিশ্বাসকে সম্ভবত প্রভাবিত করেছে।

বিদ্রোহী নেতাদের অন্যান্য নানা ঘোষণায় সাঁওতাল লোকগাথা ও পুরাকাহিনীতে উল্লেখিত ধারণার প্রভাব আরও স্পষ্ট। নেতারা প্রথম থেকেই বলেছে, শুধুমাত্র সাঁওতালদের নিজস্ব চেষ্টায় 'হুল' সফল হবে না; তাদের সাবেকি হাতিয়ারে পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ দুঃসাধ্য; এ 'হুল' ঐশীশক্তি নির্দেশিত; তাই শত্রুর পরাভবে এ শক্তির হস্তক্ষেপ অনিবার্য। সিধুর পরওয়ানায় এ হস্তক্ষেপের নানা রূপের বর্ণনা আছে। এর একটা হল আকাশ থেকে অবিরাম অগ্নিবৃষ্টি;[৯৭] 'নিজের হাতে ঠাকুর সাহেবকুলকে খতম করে দেবেন'।

আকাশ-ঝরা এ অগ্নিবৃষ্টি আসলে সাঁওতালি সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্পর্কিত এক কাহিনীর অংশ। এ কাহিনীমতে, এ বৃষ্টি কলুষ-অনাচার-পূর্ণ পৃথিবীকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সৃষ্টি করার একটা পরিকল্পনা মাত্র। 'গুরু' কলিয়ানবর্ণিত এ কাহিনীর প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য: মানবজাতির ক্রমবর্ধমান ভ্রষ্টাচারে অত্যন্ত রুষ্ট ঠাকুর ঠিক করলেন, এর বিনাশ ঘটক। তিনি মানুষদের ডেকে তাঁর কাছে ফিরে আসতে বললেন। মানুষেরা কিন্তু তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। ঠাকুর তাই এক দম্পতি পিলচু হারাম এবং পিলচু বুধিকে ডেকে বললেন—'মানুষেরা আমার কথায় কান দেয়নি; তাই আমি তাদের নিপাত ঘটাব। কিন্তু তোমরা দুজন হারাতা পর্বতের গুহায় আশ্রয় নাও; তাহলে তোমরা রক্ষা পাবে'। তারা ঠাকুরের নির্দেশমতো পর্বতের গুহায় চলে গেল। তারপর শুরু হল, সাতদিন সাতরাত অবিশ্রান্ত অগ্নিবৃষ্টি। মানুষ ও পশুকুল সব ধ্বংস হল—শুধুমাত্র পিলচু দম্পতি ছাড়া। এ বৃষ্টি থামার পর তারা গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এলে ঠাকুর তাদের পরবার পোষাক দিলেন। হারাতা পর্বতের পাদদেশে তারা নিজেদের জন্য নতুন বসতি বানাল। তাদের সন্তান-সন্ততি থেকে মানুষের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকল।[৯৮]

সাঁওতালি সৃষ্টিতত্ত্বে 'অগ্নিবৃষ্টি' আসলে সার্বিক প্রলয় ও ধ্বংসের পর সম্পূর্ণ নতুন, কলুষহীন, শুদ্ধ এক সৃষ্টির প্রতীক। সিধুর পরওয়ানায়ও এ প্রতীকের ব্যবহারে শুধুমাত্র দিব্যশক্তির হস্তক্ষেপে শত্রুর বিনাশ সূচিত হয়নি। বিদ্রোহের নেতাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, হুলের ফলে শোষণ-হীন এক আদর্শ সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হবে। 'হুলে' দিব্যশক্তির সক্রিয় সাহায্যের কথা বললেও নেতারা কখনও ভাবেনি যে 'হুল' একান্তভাবে এ শক্তি-নির্ভর। বার বার বলা হয়েছে, সাঁওতালদের নিজস্ব উদ্যোগ ঐশীশক্তির কার্যকারিতাকে সুনিশ্চিত করবে।

এক্ষেত্রেও সাঁওতালদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাব লক্ষণীয়। 'ঠাকুর' বা 'গঙ্গামায়ে'র কথা বারবার উল্লেখ করা হলেও ঐশীশক্তি বলতে শুধুমাত্র এক এবং অদ্বিতীয় 'পরমস্রষ্টা'কেই বোঝানো হয়নি। সাঁওতালরা আরও বহু অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করত; বরং দৈনন্দিন জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সুদূর 'ঠাকুরে'র থেকে এ সব শক্তির সংগেই সাঁওতালদের (এবং অন্যান্য অনেক আদিবাসীদেরও) যোগ ছিল অনেক প্রত্যক্ষ এবং নিবিড়। যেমন কোন নতুন গ্রাম-প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হত না, যতক্ষণ না তারা বুঝতে পারত, এ অঞ্চলের অধিষ্ঠাতা দেবতা এ প্রতিষ্ঠাকে অনুমোদন করেছে। বিদ্রোহীরা তাই বিশ্বাস করত, তাদের লড়াই শুধুমাত্র জীবিকার অবলম্বন জমি এবং জমির ফসলের নিরাপত্তার জন্য নয়; দিখুদের দ্বারা তাদের গ্রাম ও জমি আগ্রাসনের ফলে দীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠিত গ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত এই অতিপ্রাকৃত শক্তিগুলির অস্তিত্বও তাতে বিপন্ন হয়ে পড়েছে; তাদের লড়াই এ সংযোগ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যও।[৯৯]

নেতাদের বিশ্বাস ছিল, সাঁওতালদের কোন কোন বিশেষ উদ্যোগ এ অতিপ্রাকৃত শক্তিগুলিকে বিদ্রোহের স্বপক্ষে আরও বেশি সক্রিয় এবং শক্তিশালী করবে। এ সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের প্রধান নির্ভর একটা সাঁওতালি দলিল— মিশনারি সূত্রে পাওয়া এক সাঁওতাল ছোত্রে দেশমাঝির (Chotrae Des-Manjhi)[১০০] বিবৃতি। ছোত্রের এ বর্ণনামতে: 'বিদ্রোহ শুরু হবার আগে সিধু এবং কানু প্রত্যেকটা গ্রামে পাতার থালায় পাঠাল আতপ চাল, তেল আর সিন্দুর; তাঁদের নির্দেশ ছিল অতিপ্রাকৃত শক্তিগুলির ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এ সবের ব্যবহার করতে হবে; তাহলে, এ শক্তিগুলি লড়াইয়ের সময় সাঁওতালদের সাহায্য করবে।

প্রধানত মিশনারি সূত্রে পাওয়া[১০১] মূল সাঁওতালি উপকরণ থেকে বিদ্রোহী মানসিকতার অন্যান্য যে প্রকাশ দেখি তাতেও সাঁওতালি লোকগাথা, পুরাকাহিনী, লোকাচার এবং সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য হিন্দু প্রভাবের অনুপ্রবেশ লক্ষণীয়। বিদ্রোহের অব্যবহিত আগে এবং বিদ্রোহের সময় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া নানা জনশ্রুতিকে এ মানসিকতার প্রতিফলন হিসেবে গণ্য করা যায়। তাদের বিশ্লেষণ থেকে বিদ্রোহী সংগঠনের উপর সক্রিয় নানা প্রভাবের রূপ আন্দাজ করতে পারি।

অন্যান্য অনেক ব্যাপক গণআন্দোলনের সময়কার গুজব বা জনশ্রুতির ক্ষেত্রেও যেমন, এখানেও এদের উৎস খুঁজে পাওয়া প্রায় অসাধ্য[১০২]। দু'একটা ব্যতিক্রম অবশ্য আছে, যেখানে

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশকে কেন্দ্র করেই এ জনশ্রুতি গড়ে উঠেছে। ছোত্রে দেশমাঝির বিবরণ থেকে এ রকম একটা জনশ্রুতির কথা জানতে পারি।[১০৩]

সাঁওতালদের উপাস্য নানা অতিপ্রাকৃত শক্তি সক্রিয় করার জন্য সিধুর পাঠানো নির্দেশের কথা একটু আগেই বলেছি। শুদ্ধাচারের মাধ্যমে অতিপ্রাকৃত শক্তির সঙ্গে সংযোগ দৃঢ়তর হবে—এ ছিল সিধুর ধারণা। কোন্ প্রক্রিয়ায় এটা ঘটবে, সেটা অবশ্য বলা হয়নি। আলোচ্য জনশ্রুতিটি সম্ভবত সিধুর এ নির্দেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ছোত্রে দেশমাঝির বিবরণে এর উল্লেখ আছে। বিদ্রোহ শুরু হবার কিছু আগে এর ফলে 'ব্যাপক এক আলোড়নের' সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রামে গ্রামে রটে গেল, গ্রামের প্রতিটি রাস্তা নিখুঁতভাবে সাফাই করতে হবে। 'প্রতিটি রাস্তার শেষে আমাদের নিশান টাঙাতে হবে। তার থেকে ঝুলবে কাঠের তৈরি গরুর গলার ঘণ্টা, পুরনো ধান ঝাড়ার কুলো আর পুরনো একটা ঝাঁটা। গুজব রটল, এ সব যদি না করা হয়, তাহলে সে গ্রামে কোন [ভয়ংকর] একটা কিছু ঘটবে। এর ফল হল, সব রাস্তা এবং বসতবাড়ির সামনের [সোলা] জায়গা সাফাই হয়ে গেল'।

এ সময়কার অন্যান্য জনশ্রুতিতে সাঁওতালি পুরাকাহিনী, লৌকিক বিশ্বাস এবং লোকাচারের প্রভাব অনেক বেশি। এর কয়েকটি[১০৪] মাত্র উল্লেখ করছি। একটা গুজব রটল, দুটো ভয়ংকর 'নাগ-নাগিনী' ধেয়ে আসছে মানুষকে গিলে খাবে বলে। আসন্ন এ বিপদ থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে পাঁচ গ্রামের লোক মিলে অন্য পাঁচ গ্রামে গিয়ে মিলেমিশে পরম ভক্তিভরে পুজো দিল। গ্রাম-প্রধানের (মাঝির) বাড়ির সামনের রাস্তায় তারা ঘুরে ঘুরে নাকাড়া বাজিয়ে নাচল; কোমরে বাঁধা কাঠের এবং ধাতুর ঘণ্টা। দুজন অবিবাহিত কিশোর পৈতে পরে, একটা ডালাতে নিম ও বেলকাঠের তৈরি দুটি ছোট সিঁদুর মাখানো লাঙ্গল নিয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পাঁচ গ্রাম ঘুরে তারা শেষের গ্রামের একটা ফাঁকা মাঠে সবাইকে ডেকে জড়ো করল। বেলপাতা, আতপ চাল ও সিঁদুর দিয়ে নাগ-নাগিনীর পূজা দিল। অনুষ্ঠানের গানগুলি আর সবাইকে শিখিয়ে দিল। আবার শুরু হল অন্য পাঁচ গ্রাম পরিক্রমা।

সংহতিরক্ষার অপরিহার্য প্রয়োজন সম্পর্কে নতুন নৈতিক বোধকে ঘিরে কয়েকটা গুজব তৈরি হয়েছিল। যেমন, সমান সংখ্যক সন্তান আছে, এমন মায়েরা সই পাতায়। কাপড় দেওয়া-নেওয়া, খাওয়া-দাওয়া এর অঙ্গ। কারণ হয়তো এই যে এদের সবারই মন এর ফলে এক সূত্রে বাঁধা হবে। বিদ্রোহের সময় পরস্পরের নামে কেউ যেন কথা না লাগায়। সব কথাবার্তা যেন গোপন থাকে। আর একটা গুজব ছড়াল, সিধু-নিধনের জন্য কেউ একজন আসছে; সাঁওতালদের যাতে আলাদা করে বোঝা যায়, সে জন্য বলা হল তারা যেন রাস্তার মোড়ে গরুর চামড়া ও এক জোড়া বাঁশি টাঙিয়ে রাখে। এ নির্দেশ সবাই মানল।

এ সব জনশ্রুতির কোন-কোনটায় হিন্দু প্রভাবের নিদর্শন হিসেবে কিশোর বালকের উপবীত ধারণ এবং পুজোর উপকরণ হিসেবে আতপ চালের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করতে পারি। একটা গুজব থেকে বোঝা যায়, হিন্দু সমাজের বর্ণ-বৈষম্যের ধারণাও সাঁওতালদের প্রভাবিত করেছে। গুজবটা ছিল: 'কোন এক ডোমের ছোঁয়া লেগে গঙ্গা নদীতে সোনা-বোঝাই নৌকা ডুবে গেছে। তাই সব ডোমকে মারা হবে। ডোমরা ভয়ে বনের শিকারি পশুর মতো পালাতে লাগল। সাঁওতালদের মতো তারা পোষাক পরত, আর সাঁওতাল বাড়িতে থাকত'। ডোমরা ছিল হিন্দু সমাজের নিম্নতম অস্পৃশ্যা জাতিগুলির অন্যতম। জনশ্রুতিগুলির অন্যান্য প্রধান অংশগুলিতে সাঁওতালি সমাজের লৌকিক বিশ্বাস ও লোকাচারের প্রভাব অনেক বেশি প্রত্যক্ষ। অবশ্য লৌকিক বিশ্বাস ও লোকাচারের অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু ও আদিবাসী সমাজের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা কঠিন। এ কথা আমরা আগে বলেছি।

## (৯.১)

বিদ্রোহের সময় সাঁওতাল জগতে হিন্দু প্রভাবের চরিত্র সম্পর্কে আমাদের আলোচনার কয়েকটা প্রধান সিদ্ধান্ত আবার নির্দেশ করতে চাই।

(ক) বিদ্রোহীদের কোন কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান আসলে প্রভুশ্রেণী হিন্দু গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উপর সুপরিকল্পিত আক্রমণ—এ ধারণা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়।

(খ) বিদ্রোহী মানসিকতার বিশিষ্ট কয়েকটি রূপ বিশ্লেষণ করলেও হিন্দু প্রভাবের সীমাবদ্ধতা আরও স্পষ্ট হয়। যেমন, প্রতিরোধ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য এবং সংগঠন সম্পর্কে নেতাদের ঘোষণায় ব্যবহৃত নানা প্রতীক এবং উপমার উৎস ছিল প্রধানত সাঁওতালি লোকগাথা ও পুরাকাহিনী। বিদ্রোহের ঠিক আগে এবং বিদ্রোহের সময় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া নানা জনশ্রুতিতেও বিদ্রোহী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। এগানেও সাঁওতালি পুরাকাহিনী, লৌকিক বিশ্বাস ও লোকাচারের প্রভাব অনেক বেশি প্রত্যক্ষ এবং গভীর। হিন্দু প্রভাবের নিদর্শনও মেলে, কিন্তু সাঁওতালি ঐতিহ্যের মূল প্রবাহে তা মিশে গেছে এবং তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। *(পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়)*



**পাদটীকা**

৬৮. Buchanan Hamilton, **Bhagalpul Journal** (1810-11), (Patna 1930)। ১৮০৭-১৮১৪, এ সময়কালের মধ্যে বুকানন বাংলা ও বিহারের কয়েকটা জেলায় ঘুরে ঘুরে নানা বিষয় অনুসন্ধান করেন।

৬৯. 'I have now reviewed the religion of the aborigines as practised among the mountaineers of Beerbhoom, and I think it may safely be concluded that the Hindus have borrowed their household god and its secret rites from the primitive races whom they enslaved; that they have borrowed their village gods with the ghosts and demons that haunt so many trees and that they have borrowed the Sanguinary deity (Siva) who is now universally adored by the lower orders throughout Bengal.' W.W. Hunter, **The Annals of Rural Bengal** (First Edn.). I have used the Calcutta (1965) Edn.

৭০. উত্তরভারতের 'লৌকিক' ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারের আলোচনা প্রসঙ্গে Crooke-এর সিদ্ধান্ত এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর মতে, বহু ক্ষেত্রে এ সব বিশ্বাসের উদ্ভব এবং বিকাশ ব্রাহ্মণ্য-ধর্মধারণার মূল স্রোতের সঙ্গে সম্বাসরি যুক্ত নয়। (W. Crooke, **The Popular Religion and Folklore in Northern India**), (First Edn, 1893) (Third Reprint, Delhi, 1968): 'Preface to the First Edition', P. VI.

৭১. বীরভূমের সাঁওতাল সমাজ সম্পর্কে Hunter-এর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'The only Hindu they [Santals] tolerate among them is a blacksmith, one of whom is attached to each village, and whose posterity in process of time become natutralized Santals'. [W.W. Hunter, পূর্বোল্লেখিত, পৃ: ১১০]

৭২. বিদ্রোহের শুরু ৭ বা ৮ জুলাই, ১৮৫৫। দেওঘর 'আবির্ভাবে'র ঘটনা ঘটে এপ্রিলের মাঝামাঝি কোন সময়ে।

৭৩. এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: বিনয় চৌধুরী, **'ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন, ১৮২৪-১৯২০'**। 'চতুরঙ্গ', ডিসেম্বর, ১৯৮৮, Sections ৯.২ / ৯.৩; পৃ: ৬৯২-৬৯৪

৭৮. সিধু-কানুকে অনুগামী সাঁওতালরা 'ঠাকুরজি' বলে উল্লেখ করত।

৭৫. সাঁওতাল 'গুরু' কলিয়ানের মতে, আদিতে সাঁওতালরা এক 'পরম স্রষ্টা'র অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। 'ঠাকুর' বলে তাকে বলা হয়েছে। সম্ভবত এ নাম পরবর্তী কালের। হিন্দুদের থেকে এ নাম নেওয়া হয়েছে। 'পরম স্রষ্টা' ছাড়াও সাঁওতালরা পরে পরে নানা দেবদেবীর উপাসনা করেছে। প্রচলিত মতে, সবার শীর্ষে মারাং বারু। 'The head of the Santal pantheon is Marang Baru. Baru means a mountain; but as every mountain is supposed to be the residence of some spirit, the word has come to be applied to a spirit. Thus Marang Baru means Great Mountain.' L.S.S O'Malley. **Bengal District Gazetteers, Santal Parganas** (First edn, Calcutta 1910. Reprint 1984); p. 120 (Reprint).

৭৬. 'মাঝিস্থান' প্রধান কোন রাস্তার ধারে। এটা আসলে একটা মাটির ঢিবি; পাঁচটা খুটি পোঁতা, চারধারে চারটি; একটা মাঝখানে। মাঝের খুটির কাছে থাকত পাথরের টুকরো; কোন কোন ক্ষেত্রে খোদাই করা কাঠের টুকরো—আদি কোন মাঝির স্মৃতিজড়ানো। সাঁওতালরা এখানে পুজো করে, বলি ইত্যাদি দেয়। গ্রামের প্রবীনরা এখানে গ্রাম-সম্পর্কিত নানা বিষয় আলোচনা করে। 'পবিত্র কুঞ্জে'র (Jaher) অবস্থান গ্রামের সীমানায়। আসলে নানা গাছ দিয়ে ঘেরা। প্রধান পাঁচ ধরনের গাছের গোড়ায় থাকে পাথরের টুকরো। গ্রামবাসীদের পুজোর জায়গা এটা। 'The gods of the Jaher are national deities worshipped by all Santals, and the Sacrifices are performed by the village naekes' (**Ibid** , পৃ: ১১৬-১১৭)

৭৭. বিনয় চৌধুরী, পূর্বোল্লেখিত, 'চতুরঙ্গ', পৃ: ৬৯৫.

৭৮. Bengal Judicial Proceedings: 30 Aug, 1855, No. 130; 'Paper' No. 4.

৭৯. পাদটীকা নং ৭৭ দ্রষ্টব্য। পৃ: ৬৯৫।

৮০. ঐদেব; পৃ: ৬৯৬।

৮১. **Traditions and the Institutions of the Santals** (যা আসলে সাঁওতাল 'গুরু' কলিয়ানের (Kolean) সাঁওতাল ঐতিহ্যের নানা বিবরণের সংকলন)-এর সম্পাদক Sten Konow এ প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। কলিয়ান-বিবৃত এ ঐতিহ্য সম্পর্কে Konow বলেছেন: 'We cannot say how far back these traditional tales can be carried from generation to generation.... They are evidently the result of a comparatively long development..... it is evident that there are borrowings from Aryan Sources, but it is

also clear that a considerable portion is genuine Santal Lore, and it is often difficult to distinguish between both elements. Thus the name Thakur of the Vague Supreme god seems to be Aryan; and such is certainly the case with his additional designation Jiu, 'Soul, Spirit'. But that need not imply that the whole conception is Aryan'. (Editor's Preface)

৮২. 'Virtue lives in all **joogs** [epochs], **Saththu** [Satya], **Tretta** [Treta], **Dapur** [Dwapar] and **Kole** [Kali]' পাদটীকা নং ৭৮ দ্রষ্টব্য। 'Paper' No. 15.

৮৩. Bengal Judicial Proceedings; 4 Oct 1855; No 87; Birbhum Magistrate (H. Raden) to Commissioner of Burdwan Division; Para 3

৮৪. এ ব্যাখ্যা রণজিৎ গুহের। Ranajit Guha, **Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India** (Delhi, 1983), পৃ: ৭২-৭৩

৮৫. তদেব; পৃ: ৭১-৭২

৮৬. করম উৎসবের নামকরণ সম্ভবত এর সঙ্গে যুক্ত একটা অনুষ্ঠানের জন্য। করম গাছের দুটো শাখা এনে বাড়ির উঠোনে পুঁতে দেওয়া হয়। এ উৎসব অন্যান্য আদিবাসী এলাকাগুলিতে প্রচলিত ছিল। সাধারণত ভাদ্র মাসের একাদশীতে এ অনুষ্ঠান হত।

৮৭. **Traditions and Institutions of the Santal,** পৃ: ১৫৮

৮৮. 'In many villages the Santals join with the Hindus in celebrating the Durga Puja...and the Holi in honour of Krishna. Their own priests take no part in the ceremonial observances at those Hindu feasts; they are left to Brahmans'. E. T. Dalton, **Descriptive Ethnology of Bengal** (1st Edn. 1872, Calcutta), (Reprint, Calcutta, 1960) পৃষ্ঠাসংখ্যা এ পুনর্মুদ্রিত বইয়ের।

৮৯. হিন্দু এলাকায় বিদ্রোহী সাঁওতালদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবই প্রধানত দেখা গিয়েছিল। এর প্রধান কারণ, বিদ্রোহীদের নানা হিংসাত্মক কাজ। বিক্ষুব্ধ সাঁওতালদের তীব্র দিশু বিরোধিতার কারণ হিন্দুরা সহানুভূতির সঙ্গে বুঝতে চেষ্টা করেনি।

৯০. 'Involved in a bitter and bloody war against Hindu landlords and money lenders, the rebels took to Hindu religious practice with a vengeance. Certain forms of ritual worship **(puja)** regarded as conducive to spiritual merit by the Hindus was adopted by the insurgents too'. R. Guha, পূর্বোল্লেখিত; পৃ: ৭১।

৯১. 'It is the custon of the villagers to wait until a sufficient number of their fathers and mothers have died when they take their ashes and proceed in a body to throw them into the Damoodah [Damodar] River, which is to them a Sacred Stream'. (E.G. Man, **Sonthalia and the Santhals**, Calcutta, 1867, Reprint 1983 (Delhi) পৃ: ১৪৭

৯২. '...once a year the tribes make a pilmigrage to its [the Damodar's] banks, in commemoration of their forefathers. The ceremony is called the Purifying of the Dead; and the influnce anciently exerted by great rivers on the Santal beliefs has been of so permanent a character, that to this day the ommission to visit, at least once a year, the single river they possess, is visited among some families in the Beerbhoom hightands by loss of social privileges.' W. W. Hunter, **The Annals** ...(পৃ: ৮৬)

৯৩. 'সাহেবেরা' দেশের শাসক, অথচ প্রজার (যেমন সাঁওতালদের মঙ্গল বিধানে সম্পূর্ণ উদাসীন; স্থানীয় নিম্নবেতনভোগী দেশি আমলাদের হাতে এ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে। সাঁওতাল নেতা সিধুর পরওয়ানায় এ গাফিলতিকে বলা হয়েছে পাপ (Sin). 'This is a sin of the Saheb and it is from this that the Thakur has commanded me that the land does not belong to the Sahebs. If you do not obey these commands, you must reply to this by a Perwannah ... If you, Saheb, do agree you will remain in the other side of the Ganges; who so does not agree to this cannot remain on this side of the Ganges.' [Bengal Judicial proceedings, 23 Aug, 1855; No. 221] (গঙ্গার 'এপার' 'ওপার' বিষয়ে এখানে সম্ভবত ভাষাবিভ্রাট ঘটেছে।)

৯৪. এ সম্পর্কে সাঁওতালি ধারণার জন্য সাঁওতাল 'গুরু' কলিয়ানের বিবরণ উল্লেখযোগ্য। **Traditions and Institutions of the Santals;** পৃ: ১৪



৯৫. 'Some people have gone past Rajmahal to the other side of the Ganges, who knows why Thakur is punishing us in this way'. **Traditions** etc... পৃ: ১৪

৯৬. সিধুর কাছে 'আবির্ভূত' 'ঠাকুর'ই তাকে 'গঙ্গামা'য়ের কথা বলেছেন বলে সিধুর পরওয়ানায় উল্লেখ করা হয়েছে। 'He [Thakur] says, "Let all the poor people fight ... The Thakur himself will fight. He who will be sent to the Thakur by Ganga Mayee will rain down fire..." ' [Bengal Judicial Proceedings, 23 Aug., 1855; No. 221]

৯৭. তদেব

৯৮. **Traditions and Institutions of the Santals,** পৃ: ৮-৯

৯৯. অংশত মূল সাঁওতালি উপকরণের উপর ভিত্তি করে লেখা 'হুলে'-র উপর প্রবন্ধে Culshaw and Archer-এর মন্তব্য এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য: 'a Santal's land not only provides economic security, but is a powerful link with his ancestors; and this applies to newly entered lands no less than the old, for he will not take possession till the spirits approve. The land is a part of his spiritual as well as his economic heritage. Hunger drove them to despair, but their attachment to the land provided also an emotional basis without which the rebellion might not have taken place. Hence the conviction that they were impelled by the spirits, and their preparations included elaborate precautions to align themselves with Supernatural powers' W. J. Culshaw & W.G. Archer, 'The Santal Rebellion', **Man in India,** December 1945, পৃ: ২৯১

১০০. ছোত্রের বিবৃতি মূল সাঁওতালিতে লেখা। ১৯৩৮ সালে Santal Mission of the Northern Churches-দ্বারা প্রকাশিত। ছোত্রে চৌদ্দ বা পনেরো বছর বয়সে হুলে অংশগ্রহণ করে। Culshaw এবং Archer ছোত্রের বিবরণকে বলেছেন 'the only autobiography of a Santal hitherto published'। তদেব, পৃ: ২২০; পাদটীকা নং ১।

১০১. 'Additional Account by Old Jugia', in **Traditions and Institutions of the Santals**, Ch. XIII এ সব জনশ্রুতির বিস্তারিত বিবরণের জন্য: বিনয় চৌধুরী, **'ধর্ম ও পূর্ব ভারতে কৃষক আন্দোলন...',** চতুরঙ্গ, ডিসেম্বর, ১৯৮৮, পৃ: ৬৯২-৬৯৩

১০২. বস্তুত, এ যৌক্তি অর্থহীন। এ সব জনশ্রুতির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হল, তাদের মধ্য দিয়ে কোন্ যৌথ ইচ্ছা অভিব্যক্ত হয়েছে। গুজব ছড়ানোর প্রাথমিক পর্বে কোন ব্যক্তিবিশেষের উদ্যোগ সম্ভবত ছিল; কিন্তু, তার প্রেক্ষাপটে সমাজ ও অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তনের জন্য বহু মানুষের তীব্র কোন আকুতি যদি না থাকত, তাহলে এ জনশ্রুতি এত ব্যাপকতা লাভ করতে পারত না।

১০৩. **Man in India**, December, 1945, পৃ: ২২০

১০৪. ১০১ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

# অসমে জনবিন্যাস ও জাতিসত্তার সঙ্কট— একটি পর্যালোচনা

সঞ্জিত চক্রবর্তী

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বর্তমানে সাতটি রাজ্য। অসমিয়া ভাষায় এদের বলা হয় সাতভনী। এই শব্দবন্ধ-চয়ন হলে হয়েছে এবং তার এক নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট রয়েছে যা এখানে আলোচনা করছি না।

সাত বোনের এক এই অসম (আয়তন ৭৮৫২৮ বর্গ কি: মি:) নানা দিক দিয়ে বিশিষ্ট। জল ও খনিজ সম্পদে অসম সমৃদ্ধ। চা, অপরিশোধিত খনিজ তেল ও প্লাইউড নির্মাণে অসম এখনও দেশের মধ্যে শীর্ষে। রাজ্যের বনজ সম্পদের (দু'দুটি বৃহৎ অভয়ারণ্য— মানস ও কাজিরাঙ্গা সহ) বিশ্বজোড়া নাম। আর অসমের বৈশিষ্ট্য জনবিন্যাসেও। বহু উপজাতি / জনজাতি ও সমতলীয় জাতির সহাবস্থান এখানে হয়েছে। এখানে জাতিগঠনের প্রক্রিয়া থেমে নেই। সম্ভবত আর কোন রাজ্যে জাতিগঠনের প্রক্রিয়া এত সচল নয়।

তবু অসম অশান্ত। গত পঞ্চাশ বছরের অধিক কাল থেকে এখানে মূল ভাষিক গোষ্ঠী অসমিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। গত ৩৬ বছর ধরে (১৯৬০ থেকে আজ অবধি) মাঝে মাঝে আক্রান্ত হচ্ছেন নির্দিষ্ট কিছু ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ, বিশেষত বাঙালিরা। বেশ কিছু জনজাতির এলাকায় বিভিন্ন দাবিদাওয়ার প্রেক্ষিতে পরিস্থিতি জটিল। এই অবস্থার বিশ্লেষণ করতে গেলে সঙ্কটের সমাধান খুঁজতে গিয়ে প্রাথমিকভাবে এসে পড়বে অসমে বিপুল অভিবাসন ও বিচিত্র জনবিন্যাসের কথা।

যুগ যুগ ধরে এই অঞ্চল বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। সুপ্রাচীন কালে অসমে প্রোটো অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর অবস্থানের নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ রয়েছে। অবিভক্ত অসমে ও বর্তমানে মেঘালয়বাসী খাসি ও সিন্টেং অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ। পরবর্তীকাল অসমে প্রবেশ করেছে মঙ্গোলীয়রা। তারা ব্রহ্ম-তিব্বতি (Tibeto Burman) ভাষা পরিবারের। এক সময় চীনের হোয়াংহো নদীর অববাহিকা থেকে বার্মা (বর্তমান মায়ান্মার) হয়ে তারা অসমে তথা উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রবেশ করেছিল। অসমের আদিবাসী এরাই। এই নৃ-গোষ্ঠী একদা বৃহৎ বোড়ো পরিবার নামে পরিচিত ছিল। বোড়ো কাছাড়ি, ডিমাসা কাছাড়ি, লালুং বা টিয়া, রাভা, চুতিয়া ও মরান বৃহৎ বোড়ো পরিবারভুক্ত। মেঘালয়ের গারো ও ত্রিপুরার টিপরা এই বৃহৎ নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

আজকাল একমাত্র বোড়ো কাছাড়িরা বোড়ো নামে পরিচিত। অন্যান্য উপজাতীয় / জনজাতীয় মানুষের চেয়ে তাদের জীবন-প্রণালী স্বতন্ত্র। অধিকাংশ ইন্দোমঙ্গোলীয়রা পাহাড়ে বনাঞ্চলে প্রথমে বসবাস শুরু করেছিল। বোড়োরা প্রথম থেকেই সমতল অঞ্চলে— ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় নিজেদের আস্তানা নির্বাচন করে নেয়। বোড়োরা পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা উন্নত অসমিয়া সমাজের কাছাকাছি থেকেও নিজেদের ভাষাসংস্কৃতি সংরক্ষণে সচেষ্ট ছিল। বৃহত্তর অসমিয়া সমাজে অনুন্নত জনজাতি হিসাবে তাদের মিলে যাওয়াটা ছিল ইতিহাসের সাধারণ নিয়ম। বৃহৎ বোড়ো গোষ্ঠীর অন্যান্য অনেক শাখা এবং পরাক্রমশালী আহোমরা মূল স্রোতে কালে-কালে মিশে গেছে। বোড়োরা এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। আলাদা বোড়োল্যান্ড রাজ্যের দাবি সাম্প্রতিক হলেও, বোড়োদের জন্য ষাটের দশকে পি টি সি (Plains Tribal Council) প্রথম স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলেছিল। এটি ছিল একটি রাজনৈতিক মঞ্চ। ধীরে ধীরে আবসু ও বি পি এ সি (যথাক্রমে ছাত্র সংগঠন ও একশন্ কমিটি)-র নেতৃত্বে স্বায়ত্তশাসনের দাবি জোরদার হয়। বোড়োদের একাংশ সন্ত্রাসবাদের পথেও যায়। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটির নাম বোড়ো সিকিউরিটি ফোর্স।

আবসু ও বি পি এ সি-র সঙ্গে সরকারের এক চুক্তি হয়েছে— যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে বোড়োদের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ সালে এই চুক্তি সম্পাদিত



হলেও স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণে এখনো চূড়ান্ত ফয়সালা হয়নি বোড়োদের কিছু বিতর্কিত দাবির জন্য।

বোড়োদের নিজস্ব সাহিত্যসভা রয়েছে। তাদের মধ্যে হিন্দু, খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায় রয়েছেন। তারা রোমান লিপি ভাষার ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে। এক শ্রেণীর বোড়োদের উগ্র আঞ্চলিকতাবাদী কাণ্ডকারখানা সমর্থনযোগ্য নয়। তবে রাজনৈতিক তথা প্রশাসনিক সততার জোরে তার মোকাবিলা করা যায়। বোড়ো সন্ত্রাসবাদ অচিরে অবসান হওয়ার কথা। কারণ তার বিশেষ কোন ভিত্তিমূল নেই।

কারবি আংলং জেলার অধিবাসীরা মূলত কারবি। তাদের অনেকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। একটি বিশেষ বামপন্থী দলের প্রভাব কারবি আংলং-এ রয়েছে। এদেরই প্রভাবে কারবিরা স্বায়ত্তশাসনের জন্য লাগাতার ও জোরদার আন্দোলন চালিয়ে গেছে। অসমের মধ্যে কারবিরা প্রথম উপজাতি যারা স্বায়ত্তশাসন আদায় করেছিল— জেলা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে। কারবিদের মধ্যে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা অসমিয়া ভাষা বলতে পারে। নিজেদের মধ্যে কারবি ভাষা প্রচলিত। কারবি ভাষায় একটি রামায়ণ রয়েছে যা গবেষকদের কাছে যথেষ্ট কৌতূহলের কারণ। মেঘালয়ে সংযুক্ত হবার আহ্বান কারবিরা প্রত্যাখান করেছিল। এতে মনে হয় বৃহত্তর অসমিয়া জীবনধারায় বা এ রাজ্যের মূল স্রোতে যুক্ত থাকার প্রবণতা এই পাহাড়ি জেলার অধিকাংশেরই রয়েছে।

পাহাড়ঘেরা উত্তর কাছাড়ের মূল বাসিন্দা হল ডিমাসা কাছাড়ি। তারা বোড়ো কাছাড়ির মতো অসমের প্রাচীন অধিবাসী। কাছাড় জেলা থেকে নাগাল্যান্ড-সংলগ্ন অবিভক্ত শিবসাগর জেলার কিছু অংশ পর্যন্ত তাদের বসবাসের চিহ্ন রয়েছে। বর্তমানে নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর ও কাছাড়ের খাসপুরে ডিমাসা রাজার রাজধানী ছিল। তারা নিজেদের ভাষাসংস্কৃতি রক্ষা করার চেষ্টায় ব্রতী। ধর্মে হিন্দু। তারা উত্তর কাছাড় ও কাছাড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। নানা কারণে পরিণত জাতি (self contained race) হিসাবে আত্মপ্রকাশে তাদের যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা আছে, যার কিছুটা রাজনৈতিক, কিছুটা ভৌগোলিক। তাদের কাছাকাছি বোড়ো কাছাড়ির মতো এক ভাষা পরিবারে (ব্রহ্ম তিব্বতি)-র অবস্থান হলে সংমিশ্রণের সহায়ক উপাদানগুলি বৃহৎ বোড়ো জাতি গঠনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত অবশ্যই করত। রুজি-রোজগার ও শিক্ষার খাতিরে তাদের অনেকে এ প্রজন্মে বরাক উপত্যকায় ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় যথাক্রমে বাংলা ও অসমিয়া শিখে নিচ্ছে।

মিশিং বা মিরি অরুণাচল-সংলগ্ন লক্ষীমপুর জেলার বাসিন্দা, শিবসাগরের একাংশেও তারা বসবাস করছে। তারা নিজস্ব (প্রাচীন) ধর্মীয় রীতিনীতি যেমন পালন করছে তেমনই হিন্দুদের ধর্মাচার ধীরে ধীরে গ্রহণ করে নিচ্ছে। মহাপুরুষ শঙ্করদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব মিশিংদের উপর যথেষ্ট। কারণ তারা নামকীর্তনও করে। অসমিয়া ভাষাকে তারা বৃহৎ জীবনে মাতৃভাষারূপে মেনে নিয়েছে। আবার ঘরোয়া জীবনে মিশিং ভাষায় কথা বলে— যা বলাবাহুল্য ব্রহ্মতিব্বতি (Tibeto Burman) পরিবারসম্ভূত। ধর্মপালন ও ভাষাচর্চার এই দ্বিত্ব আরও কিছু উপজাতিদের মধ্যে রয়েছে। মূলস্রোতে স্বাভাবিক নিয়মে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থাটা অলঙ্ঘনীয়।

ডিমাসা কাছাড়ির মতো সোনোয়াল কাছাড়িও ইন্দো-মঙ্গোলীয় গোষ্ঠী ও ব্রহ্মতিব্বতি ভাষাপরিবারভুক্ত। পূর্ব অসমে অবিভক্ত ডিব্রুগড় জেলায় তাদের মূল বাসস্থান। আহোম রাজারা এদের নদী থেকে কুড়ানো সোনা ধোওয়ামোছার কাজে নিয়োগ করতেন। সোনা-সম্পর্কিত পেশা থেকে তারা সোনোয়াল। তারা অসমিয়াকে সম্পূর্ণভাবে মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছে।

লালুং বা টিওয়া মধ্য অসমে অবিভক্ত নগাঁও জেলার বাসিন্দা। এখনও কিছু উপজাতীয় আচারব্যবহার মেনে চললেও অসমিয়া ভাষাসংস্কৃতিকে তারা বরণ করে নিয়েছে।

রাভারাও মোটামুটি মূল অসমিয়া স্রোতে মিশে গেছে। সীমাবদ্ধ ভাবে কিছু লোক নিজ ভাষায় কথা বলা ও সামাজিক আচারব্যবহার অনুসরণ করলেও রাভারা অসমিয়া ভাষাসংস্কৃতির অংশীদার। তাদের সংখ্যা বর্তমানে দুই লক্ষের কিছু বেশি। একদা আর সি পি আইয়ের বিপ্লবী সংগঠক হিসাবে যে মহান শিল্পী হাতে বন্দুক তুলে নিয়েছিলেন ও পরে সি পি আই ও গণনাট্য সঙ্ঘে যোগ দেন, অসমের সর্বজনশ্রদ্ধেয় সেই মানুষটি হলেন কলাগুরু বিষ্ণু প্রসাদ রাভা। তিনি রাভা সম্প্রদায়ের।

সমতলবাসী কোচরাও অসমের প্রাচীন অধিবাসী। কোচদের রাজত্ব এক সময় বিস্তৃত ছিল পশ্চিম অসম থেকে উত্তর বাংলার কোচবিহার জলপাইগুড়ি ও রংপুর পর্যন্ত। ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত তারা রাজত্ব করেছে। নরনারায়ণ ছিলেন কোচ বংশের বিখ্যাত রাজা। কোচবিহার থেকে অসমে লক্ষীমপুর পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তা তৈরি ও ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান কামাখ্যার বর্তমান মন্দির নির্মাণ তার রাজত্বকালে হয়েছে।

কোচরা অসমের পশ্চিম প্রান্তে বর্তমান কোকড়াঝাড় (অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জেলায়) এবং উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে রাজবংশী নামে পরিচিত। আবার মধ্য ও পূর্ব অসমে তারা কোচ নামে পরিচিত। অসমের সমস্ত কোচ বা রাজবংশী অসমিয়াকে মাতৃভাষা রূপে স্বীকার করে নিয়েছে। ধর্মে তারা হিন্দু। এখানে একটি কথা বলা প্রাসঙ্গিক। অসমে হিন্দুধর্মের প্রচারকারীরা ছোট বড় উপজাতিদের নিজেদের ধর্মমতে আকৃষ্ট করবার জন্য নানাবিধ সামাজিক স্বীকৃতির সংস্থান রেখেছিলেন। নৃতত্ত্ববিদ ও গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীভুবন মোহন দাসের একটি নিবন্ধ (Assam, Its people) থেকে জানা

গেছে যে বিভিন্ন জনজাতি ও উপজাতি, যেমন রাভা কাছাড়ি গারো টিওয়া (লালুং) হিন্দু ধর্মে দীক্ষা নিলে কোচ বা রাজবংশী হতে পারতেন। কোচ বা রাজবংশীদের জীবনধারালীতে অ-উপজাতীয় লক্ষণ দীর্ঘকাল থেকে পরিস্ফুট। তাই কাছাকাছি থাকা ছোট ছোট উপজাতিদের উন্নত অবস্থান্তরপ্রাপ্ত কোচদের সঙ্গে সংমিশ্রণের এই পথটি লক্ষণীয়। কোচ জাতি ইতিহাসের পটে শতাব্দীকাল নিজেদের শৌর্যবীর্যের স্বাক্ষর রেখেছিল, তারা পরবর্তী কালেও বৃহত্তর অসমিয়া সমাজ গঠনে সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে।

অসমে অন্যতম ইন্দো-মঙ্গোলীয় উপজাতি হিসাবে আহোমরা ১৩শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্মার উত্তর ভাগ থেকে উত্তরপূর্ব দিক দিয়ে অসমে প্রবেশ করেছে। তারা টাই বা শান গোষ্ঠীর লোক। কর্মক্ষম ও সাহসী আহোমরা প্রথমে হাজার খানেক স্বজাতির লোক নিয়ে অসমে প্রবেশ করেছিল। তারপর তারা ছ'শত বছর এখানে রাজত্ব করেছে, বিভিন্ন রাজপাট নিজেদের অধীনে এনে সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা জুড়ে তারা রাজত্ব কায়েম করেছে। তাদের প্রথম রাজা চুকাফা ১২২৮ সালে সিংহাসনে বসেন। ধীরে ধীরে স্থানীয় মানুষদের— যথা মরান, বরাহি, মিশিং ও চুটিয়া প্রভৃতির সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে তারা সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি হিসাবে গড়ে ওঠে। তাই ভাষার চর্চা, নিজস্ব দেবদেবীর পুজো, কালপঞ্জী (chronicle) লেখা এসব আহোমদের বৈশিষ্ট্য ছিল। ধীরে ধীরে ইন্দো-এরিয়ান প্রভাবে তাদের ধর্মাচার ও ভাষার বদল হয়। ১৬৫৪ সালে আহোম রাজা জয়ধ্বজ সিংহ আনুষ্ঠানিক ভাবে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেন। তার আগে আহোম রাজারা এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন। অসমিয়া ভাষা আহোমরা গ্রহণ করেছে, আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দু ধর্ম গ্রহণের পূর্বে। ১৬১৬ সালে প্রতাপ সিংহ নামে আহোম রাজার একটি প্রস্তরফলকে মোঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের কথা উৎকীর্ণ রয়েছে। বস্তুত আহোমরা অসমিয়া জাতির অন্যতম সবল স্তম্ভ। অথচ বর্তমান সময়ে মাঝে মাঝে টাই আহোমদের মধ্যে কিছু কায়েমি চক্র কাজ করে বিচ্ছিন্নতার ডাক দিয়ে মূল অসমিয়া সমাজ থেকে তাদের আলাদা করতে চাইছে। তাদের এই অপচেষ্টার মূলে বর্ণ হিন্দুদের পরোক্ষ আধিপত্যবাদের জের বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করেন। অবশ্য বিশেষ স্বার্থগন্ধী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে টাই আহোমদের নিয়ে জলঘোলার প্রয়াস নিষ্ফল হতে বাধ্য। কারণ আহোমরা অসমিয়া সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এঁদের মধ্য থেকে আমরা পেয়েছি ড. হীরেন গোঁহাই-র মতো আদশনিষ্ঠ চিন্তাবিদ। দেশের বুদ্ধিজীবী মহলে সুপরিচিত এই নাম। তেমনই প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক, 'আজকালের' প্রাক্তন প্রতিনিধি হেমেন বরগোঁহাই ও আরও অনেকে অসমিয়া সাহিত্যসংস্কৃতির জগতে যশস্বী। সদাপ্রয়াত বিতর্কিত মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়া একজন আহোম।

আহোমদের পর বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছোট ছোট দল ১৮শ ও উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর বর্মা থেকে এসে পূর্ব অসমের নানা স্থানে বাস করছে। এরা নিজেদের মধ্যে টাই ভাষায় কথা বলে। হীনযান বৌদ্ধ এই সব ছোট ছোট গোষ্ঠীর সংসারা ধর্মচর্চায় হিন্দুপ্রভাবিত নয়। বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে অসমিয়া ভাষা তাদের প্রধান মাধ্যম। এরা হল আইতন, খামতিস ও টুরুঙ্গ প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, এরাও আহোমদের মতো মঙ্গোলীয় (শান)।

এতক্ষণ আমরা মূলত পাহাড় ও সমতলবাসী উপজাতি (যারা আজকাল অনুসূচিত জনজাতি নামে পরিচিত)-র কথা আলোচনা করেছি। অসমিয়া সমাজ গঠনে ট্রাইব বা উপজাতির মতো অ-উপজাতীয় মানুষও যথেষ্ট রয়েছেন। এখানে প্রসঙ্গত বলে নেওয়া সঙ্গত খ্রিস্টাব্দের প্রথমদিক থেকে আর্য-ভারতীয় (Indo Aryan) মানুষদের কামরূপ (তৎকালীন অসম)-এ যাতায়াতের প্রমাণ মেলে। পঞ্চম শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্তর এলাহাবাদ শিলালিপি ও সপ্তম শতাব্দীতে ভাস্করবর্মণের নিধনপুর শিলালিপি তার প্রমাণ। হিউয়েন সাং-এর বিবরণে (সপ্তম শতাব্দীতে) কামরূপের ভাষায় ইন্দোএরিয়ান ভাষার প্রভাবের ইঙ্গিত রয়েছে। এ ভাষা ছিল আর্য ভারতের সুপ্রচলিত মাগধি ভাষা থেকে কিঞ্চিৎ আলাদা। গবেষকরা এর নাম দিয়েছেন পূব মাগধী অপভ্রংশ। মূলত সংস্কৃত থেকে এই ভাষার উৎপত্তি। ওড়িয়া ও বাংলার মতো একই উৎসমুখ থেকে নির্গত এই ভাষা স্থানিক প্রভাবে, বিভিন্ন ভাষাপরিবারের মানুষের সংমিশ্রণে আজকের অসমিয়া ভাষার রূপ নেয়।

পূর্ব ভারত থেকে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অন্যান্য উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা এসে অসমে বসতি স্থাপন করেছিলেন। উন্নত সমাজ গঠনের জন্য কোচ, আহোম প্রভৃতি রাজ্যরা এদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, ভূমিদান করে বিস্তীর্ণ অকর্ষিত অনাবাদি জমিতে ফসল ফলিয়ে যে আর্থ-সামাজিক কাঠামো— অবশ্যই সামন্ততান্ত্রিক— গড়ে তুলতে রাজাদের সাহায্যে করেছেন তার বাইরেও ভাষাসংস্কৃতির বিকাশে এইসব উচ্চকুলোদ্ভব মানুষের ভূমিকা হয়ে পড়েছিল অপরিহার্য।

কিন্তু প্রদীপের নীচেই অন্ধকার থাকে। তেমনই ভারতের অন্যত্র বর্ণবাদী সমাজব্যবস্থার প্রভাব থেকে তারা মুক্ত ছিলেন না। তা মধ্যযুগে নদীয়া থেকে আগত ব্রাহ্মণকুল, কনৌজের পণ্ডিতবর্গ বা অব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণীয় সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। এই তমসা সঞ্চারিত হয়েছিল তাদের উত্তরপুরুষেও। তাই পরবর্তী কালে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত অসমিয়ারা নিজেদের ভাষাসংস্কৃতির ব্যাপারে যত সংবেদনশীল ও আবেগিক ছিলেন— এইসব অনুন্নত জনজাতি / উপজাতির ক্ষেত্রে বা তাঁদের ভাষাসংস্কৃতি সংরক্ষণের



ক্ষেত্রে তেমনই ছিলেন উদাসীন। ঠিক যেমন একশ্রেণীর শিক্ষিত বাঙালি একসময় অসমিয়াদের সম্পর্কে উন্নাসিক ব্যবহার করতেন, হীন ধারণা পোষণ করতেন। সুতরাং ঐসব অনুন্নত গোষ্ঠীর মানুষরা বৃহৎ অসমিয়া সমাজে নিরিড়ভাবে মিলে যাওয়ার পরিবর্তে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হতে লাগল। উদাহরণস্বরূপ বোড়ো ও কাবিদের কথা উল্লেখ করা যায়। আর অসমিয়া মধ্যবিত্ত সমাজে অসমের হিন্দু বাঙালিরা হয়ে উঠল প্রতিদ্বন্দ্বী তথা শত্রু। শুরু হল মানবিক মূল্যবোধরহিত আক্রমণ, অবশ্যই বিভিন্ন আন্দোলনের নামে। প্রগতিশীল মানুষরা রুখে দাঁড়িয়েছেন এসব আঞ্চলিকতাবাদী অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে।

অসমে বাঙালি মুসলমান ও হিন্দুর অভিবাসন শুরু হয়েছিল ১৮৩৬ সালের পর থেকে। এই ধারা অব্যাহত ছিল এই শতকের গত দু দশক আগেও। কিন্তু তারও আগে এখানে শিখরা এসেছে, এসেছে তুর্কি পাঠান মোগলরা।

শিখরা গুরু তেগবাহাদুরের সঙ্গে সতেরশো সালের মাঝামাঝি এসেছিল। কিছু শিখ সৈন্যকে এক আহোম রাজার আমলে আনা হয়। এরা এখানে থেকে যায়। এখানকার মানুষের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে। বর্তমানে তারা ধর্মে শিখ হলেও মাতৃভাষা অসমিয়া। মূলত নগাঁও জেলার একটি গ্রাম (বরশলা) ও দরং জেলার কিছু জায়গায় এরা রয়েছেন।

অসমিয়া জাতি গঠনে মহত্ত্বপূর্ণ অবদান যুগিয়েছে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমান আক্রমণকারীদের সঙ্গে আসা আহোমদের বিজিত সেনারা। কুতুবউদ্দিনের তুর্কি সৈন্যদের হারিয়ে আহোমদের জয় শুরু হয়। তারপর মোগলদেরও একাধিক আক্রমণ তারা প্রতিহত করে। এই সব বিজিত সৈন্যদের আহোম রাজারা নানা কৌশলে এখানে থাকবার সুযোগ দেন। তারপর এখানে আনা হয়েছে মুলসমান কারিগরদের। এসেছেন ধর্মপ্রচারকরা। মধ্য যুগের এই সব মুসলিমরা এখানকার সামাজিক গোঁড়ামিমুক্ত সমাজে মিশে যায়। তাদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই ভাবে তারা বৃহৎ সমাজে অসমিয়া পরিচয়ে একাত্ম হয়ে গেছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুর জটিল মানসিকতা থেকে তারা চিরকাল মুক্ত থেকেছেন। অবশ্য এর নানাবিধ কারণ রয়েছে। যেমন অসমের অপেক্ষাকৃত নতুন হিন্দু সমাজে মূল বর্ণবাদী ব্যবস্থা সেভাবে কায়েম হয়নি। দুই, যে রাজশক্তির সৌজন্যে নতুন অঞ্চলে তাঁরা বসতি স্থাপন করেছেন এবং মুদ্রা তৈরি, চিত্রাঙ্কন ও যুদ্ধে প্রাপ্ত পারসি সংকেতলিপির অর্থ বের করার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন সেই আহোমরা তথাকথিত উচ্চবর্ণের নয়। অবশ্য সবচেয়ে বড় কথা মহাপুরুষ শঙ্করদেব-প্রবর্তিত নব বৈষ্ণব ধর্মের মহিমা। এই ভক্তিবাদী আন্দোলনের জোয়ারে তখন হিন্দু সমাজশিরোমণিদের দাপটে ভাঁটা পড়ে। উবে যায় আচারসর্বস্বতার বিধান, বন্ধ হয় তন্ত্রসাধনার নামে নিষ্ঠুর নরবলির। এই উদার পরিমণ্ডলে উন্নত নৃগোষ্ঠীর পুরুষদের সঙ্গে (ভিন্ন ধর্মের হলেও) সামাজিক সম্পর্কস্থাপনে বাধা থাকার কথা নয়।

বর্তমান শতকের প্রথম থেকেই পূর্ব বাংলার বিশেষত ময়মনসিংহ জেলা থেকে, সরকারি নীতি অনুসারে, লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন কৃশলী চাষিদের এনে কামরূপ, নগাঁও ও গোয়ালপাড়া জেলার বিস্তীর্ণ অনাবাদি উর্বর জমিতে বসানো হয়। অনেকে আবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভাগ্য অন্বেষণে এ অঞ্চলে চলে আসে। এরকম কিছু সম্পন্ন চাষিপরিবার নগাঁও জেলায়, সিলেট ও কাছাড় থেকেও, এসেছিল। যাইহোক ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথ পরিবর্তনকালে যে বৃহৎ চর সৃষ্টি হয় পলিমাটিসমৃদ্ধ সেসব অঞ্চলেও এসব চাষিরা অজস্র ফসল ফলায়। এমনকি জনজাতিঅধ্যুষিত ও সংরক্ষিত বনাঞ্চলের দিকে তাদের বসতি স্থাপন করতে দেখা যায়। সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হবার আশঙ্কায় তখন এদের অভিবাসন নিয়ন্ত্রিত করতে লাইন সিস্টেম নামে একটি প্রথা চালু হয়। মুসলিম লিগের শাসনকালে, ত্রিশের দশকে, এই প্রথা কার্যত অচল হয়ে পড়ে। এবং ১৯৫০ সাল পর্যন্ত, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই অভিবাসন বন্ধ করতে হিন্দুপ্রধান কংগ্রেস সরকারও আগ্রহ দেখায়নি। ১৯৫১ সালে পাসপোর্ট প্রথা চালু হবার পর এদের আগমন ব্যাহত হয়। ১৯৪১ সালে এদের সংখ্যা শুধু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ছিল ২৩৯। স্বাধীনতার পর গণভোটের প্রহসন করে সিলেট জেলাকে পূর্ব পাকিস্তানে ঠেলে দেওয়া হয়। এতে ১২ লক্ষ মুসলিম অসম থেকে কমে যায়। কিন্তু আসা শুরু হয় শরণার্থী হিন্দুদের। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশ থেকে ১৯৫০, ১৯৬৪ ও ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মতো অসমেও শরণার্থীর ঢল নামে।

তারও আগে ১৮৩৬ সালের পর থেকে ব্রিটিশরা প্রশাসনিক কাজের জন্য অসমে বহু বাঙালি আমলা নিয়ে আসে। কারণ ব্রিটিশ শাসকরা অসমের নিম্ন আদালত ও স্কুলে বাংলা ভাষা চালু করেছিল। প্রায় ৩৭ বছর এভাবে বাংলা চলার পর আমেরিকান মিশনারিদের উদ্যোগে ও লক্ষীনাথ বেজবরুয়া, আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন প্রভৃতি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের সংগঠিত প্রতিবাদে বাংলার স্থানে ১৮৭৪ সালে অসমিয়া চালু করা হয়। অসমে সরকারি স্তরে বাংলা ভাষার প্রবর্তন নিঃসন্দেহে একটি নিন্দার্হ ঘটনা কিন্তু এটা আজ প্রমাণিত সত্য যে সেটি ব্রিটিশ শাসকদেরই সিদ্ধান্ত ছিল। তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের প্রধান রবিনসন ও অসমের বেঙ্গলি কমিশনার জেনকিন্স সাহেব অসমিয়া ভাষা বাংলার বিকৃতরূপ এই অজ্ঞতাপ্রসূত কারণ দেখিয়ে অসমে বাংলা প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। এতে রাজকোষে ব্যয়সংকোচ হত। ১৯৩১ সালে অসমিয়াভাষীর সংখ্যা ছিল

১৯,৯২,৮৪৬ জন (৩১.৪%)। কুড়ি বছর পর ১৯৫১ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৯,৬৫,১২৯ জন (৫৬.৭%) অর্থাৎ তিন গুণের মতো বেশী। ১৯২১ সালে অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধির কোন জৈবিক কারণ নেই। পরবর্তীকালে 'বঙ্গাল খেদা' গণ্ডগোলের পরিপ্রেক্ষিতে, যা ১৯৬০ সালে সংঘটিত হয়েছিল, সাংসদদের এক ডেলিগেশনদের কাছে অসম সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে বাঙালি মুসলমানরা অসমিয়াভাষী হিসাবে পরিচয় দেওয়ায় সেন্সাসের রিপোর্টে অসমিয়ার এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। এদিকে ১৯৭১ সালের লোক গণনায় অসমিয়াভাষীর সংখ্যা ছিল ৬০.৪৪%। ১৯৮১ সালে কোন গণনার কাজ অসমে করা যায়নি। কারণ ৮০ থেকে ৮৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় দীর্ঘ ছ'বছর 'বিদেশি খেদা' আন্দোলনের জন্য উত্তাল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পরিস্থিতি লোকগণনার অনুকূল ছিল না।

১৯৯১ সালে সেন্সাসে জনজাতীয় লোকদের মধ্যে অনেকে স্ব স্ব ভাষীর পরিচয় পঞ্জিভুক্ত করিয়েছে। বাঙালি মুসলমানরা অসমিয়া না বাঙালি বলে নিজেদের তুলে ধরবে এ নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। অল অসম মাইনরিটি স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন এ ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত ছিল। যাই হোক, সরকারি ভাবে এখনও পর্যন্ত ১৯৯১ সালের ভাষাগত সেন্সাস রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। সম্ভবত তাতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তবে যতদূর জেনেছি অসমিয়াভাষীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি রয়েছে। পঞ্চাশ ভাগের কম নয়। তবু অসমিয়ারা উদ্বিগ্ন।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি স্থানবিশেষে দরং শিবসাগর ও কামরূপ জেলার অনেক স্থানে বাঙালিরা (হিন্দু) বিশেষত যারা কায়িক পরিশ্রম করে দিন গুজরান করে, ধীরে ধীরে অসমিয়া ভাষাকে মাতৃভাষা বলে মেনে নিয়েছে, বিশেষত এই প্রজন্মের অনেকে। আবার বাঙালি মুসলমান ব্যাপকভাবে যে সেন্সাসে অসমিয়া বলে নাম লিখিয়েছিল তার কথা তো আগেই উল্লেখ করেছি। এবং একথাও সত্যি নানা কারণে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাঙালি মুসলমানরা অসমিয়া বলে নাম লেখানোর পর ষাট ও সত্তরের দশকে তারা ন' অসমিয়া নামে বৃহত্তর অসমিয়া সমাজে স্থান পায়। কিন্তু ৮০-র দশকে বাঙালি হিন্দুর মতো তারাও হয়ে ওঠে বিদেশি। অনাবাদি জমিতে কঠোর পরিশ্রম করে যারা ফসল ফলিয়েছে, যারা অসমের খাদ্যভাণ্ডারে শস্যের জোগান দিয়েছে, পঞ্চাশ বছরের অধিক কাল ধরে থেকেও তারা রাতারাতি বিদেশি হয়ে গেল। চর এলাকায় ও সরকারি খাস জমিতে বসবাস করলেও দীর্ঘকাল তারা জমি মালিকানা দেশানোর মত পাট্টা বা পাকা দলিল পায়নি। নদীপথ পরিবর্তন করলে ভাঙনের কবলে পড়ে কত হাজার চাষি এক চর থেকে আরেক স্থানে মাথা গোঁজার স্থান করে কোন রকমে জীবনধারণ করছে— তারা বিদেশির শিরোপা পেল। নিজভূমে পরবাসী হবার মতো ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা বোধহয় কিছুতে নেই। তাই সংক্ষুব্ধ সংখ্যালঘুরা মূলস্রোতে মিশতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত শুধু নয় নিগৃহীত হয়েছে, সেন্সাসে তারা সকলে যে অসমিয়াভাষী রূপে পরিচয় তুলে ধরবে না তা বোঝা গেছে। তাছাড়া উপজাতি/জনজাতিদের একাংশ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন হয়েছে। আংশিকভাবে হলেও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদগুলির মাধ্যমে বোড়ো ও কারবিরা জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে। মিশিং ও টিয়াদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। এদিকে অসম থেকে বেরিয়ে গেছে গারো খাসি ও মিজোরা। তারা স্ব স্ব প্রদেশ গঠন করেছে। ফলে অসমের আয়তন কমে ৭৮,৫২৮ বর্গ কি.মি দাঁড়িয়েছে। কিন্তু অন-অসমিয়া মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি তথা নিজেদের সংখ্যাধিক্য হারানোর ভয়— যাতে জাতিসত্তা বিলোপের শঙ্কা (xenophobia) নিহিত, কাজ করে চলেছে। এক শ্রেণীর যুবক তাই অস্ত্র তুলে নিয়েছে। ১৯৭৯ সালে জাতীয় মুক্তি বাহিনী, সংক্ষেপে আলফা নাম দিয়ে ভারত থেকে বেরিয়ে স্বাধীন ও শোষণমুক্ত অসম গড়ার লক্ষ্যে তারা লড়াই শুরু করেছে। তাদের ভূমিকায় স্ববিরোধিতা ও ভ্রান্তি যতই থাক এটা ঠিক কথা যে অসমিয়া মানস থেকে জাতিসত্তা বিলোপের ভয় দূর না হলে অসম থেকে সন্ত্রাসবাদ দূর হবে না। জন্ম নেবে আরও সন্ত্রাসবাদী। কিছুদিন আগে একটি অসমিয়া সাপ্তাহিকের সম্পাদক, যিনি আশির দশকে বিদেশি খেদার নামে সংখ্যালঘু নিপীড়নের বিরুদ্ধে ও ভ্রান্ত উগ্র আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন কলম ধরেছেন— তিনি ইদানিং অসমিয়াদের সংখ্যালঘু হবার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। এরকম ইঙ্গিত আরো কিছু সৎ ও আপসহীন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের লেখায় পেয়েছি, যা অবশ্যই ভাবনার বিষয়।

অসমে প্রতেকটি বৈধ নাগরিককে জাতিধর্মের বৈষম্য না করে যেমন স্বাধীন জীবিকা অর্জন করতে দেওয়া উচিত তেমনই উচিত প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বিকাশের সুযোগ। কিন্তু তা করতে হবে ঐতিহ্যশালী ও প্রধান সংযোগরক্ষাকারী ভাষা অসমিয়ার বিকাশ অক্ষুণ্ণ রেখে। আমাদের মনে রাখা দরকার এভাষা শুধু অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নয় নাগালাণ্ড ও অরুণাচলের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর ভাব প্রকাশের সংবাহক (Lingua franca)।

দীর্ঘদিন ধরে পূর্বাঞ্চলে ফেডারেল ভিত্তিতে রাজ্যগুলির গঠন তথা ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস দাবি করে আসছে। দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের সীমাহীন ঔদাসীন্য ও অসমের সম্পদ শোষণের বিরুদ্ধে এই দাবির যাথার্থ্য উড়িয়ে দেওয়া বোধহয় যায় না। তবে শ্রদ্ধেয় ড. হীরেন গোঁহাই-র কথা দিয়ে বলছি — "যদি



ফেডারেল কাঠামো এক গণতান্ত্রিক পথ বলে ভাবা হয় তাহলে একমাত্র গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি একে কার্যকরী করতে পারবে।"

ফেডারেল পদ্ধতিতে ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস ও সেই সঙ্গে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ক্ষমতায় আসার অপেক্ষায় অসমের সঙ্কটময় পরিস্থিতি বসে থাকবে না। তবে আশার কথা সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদী ঐতিহ্যের ধারায় পুষ্ট অগপ এবার নির্বাচনের আগে অসাম্প্রদায়িক সরকার রাজ্যবাসীকে উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। একদা বামপন্থীদের অনেকে এদের চক্ষুশূল ছিলেন। ছিলেন আশির দশকে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী আন্দোলনের শিকার। আজ সেই আন্দোলনকারীরা বামপন্থীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে শাসনে এসেছে। সংখ্যালঘুর ভোটও পেয়েছে। তখন অগপ-র অবস্থান নেহাৎ কৌশলগত না সত্যার্থে প্রাগ্যোধিক (truly Pragmatic) পরবর্তী কালিক অবস্থা তা নির্ণয় করবে।

তবে ভুলে গেলে চলবে না ব্রিটিশ অসম দখল করার পর (১৮২৬ সাল) থেকে এ রাজ্য ছিল এক এক্সপেরিমেন্টাল স্টেট। ১৯০৫ সালে অসমকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল পূর্ব বাংলার সঙ্গে, আবার ১৯১২ সালে সিলেট, কাছাড়, গোয়ালপাড়া— এই তিন বাংলাভাষী প্রধান জেলা সহ অসমকে আলাদা রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ৪৮ সালে সিলেট পূর্ব পাকিস্তানে সংযুক্ত হবার পর অসমের বিযুক্তিকরণ থেমে থাকেনি। ১৯৬০ থেকে ১৯৭২-এর মধ্যে একে একে নাগাল্যান্ড, অরুণাচল, মিজোরাম ও মেঘালয় প্রদেশ সৃষ্টি হয়ে অসম ভৌগোলিক দিক থেকে ক্রমশ আরও সংকুচিত হয়ে পড়ে। তদুপরি বিশেষ ভাষাগোষ্ঠীর ধারাবাহিক অভিবাসন এবং ঐ ভাষিক গোষ্ঠীর মধ্যে একটি ধর্মবাদীদের রাষ্ট্রমুখীনতার প্রতি ঝোঁক (ধর্মের ভিত্তিতে) অসমিয়া শিক্ষিত মধ্য ও নিম্নবিত্ত সমাজকে যথাক্রমে ভাষা-সংস্কৃতির হানি ও বিচ্ছিন্ন হবার ভয় তাড়া করে ফিরেছে।

অসমে অনুপ্রবেশ আর অভিবাসন গুলিয়ে দিলে চলবে না। কার্যত বহিষ্কার করার যোগ্য অনুপ্রবেশ নির্ণায়ক হবে আন্দোলনকারীদের সাথে ভারত সরকারের ১৯৮৫ সালে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে ৭১ সালের ১৫ মার্চের পর থেকে। আর এতে যে অনুপ্রবেশকারী খুব একটা ধরা পড়েনি তা আগেই উল্লেখ করেছি। বরঞ্চ আমি স্বচক্ষে বহু বৈধ নাগরিককে হেনস্থা হতে দেখেছি রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছেও। অসমে অনুপ্রবেশ নয়, বিপুল অভিবাসন যে জনবিন্যাসের ভারসাম্য ক্ষিপ্তত প্রভাবিত করেছে এ কথা যেমন সত্য তেমনই সত্য বহুভাষাগোষ্ঠী মানুষের বহু যুগ ধরে বিবর্তিত এই ভূখণ্ডে অবস্থান। তাদের মধ্যে বাংলাভাষী ছাড়াও রয়েছেন চা শ্রমিক ও নেপালিরা। আমরা দেখেছি বহু বাংলাভাষী ও ছোট জনজাতীয় গোষ্ঠী অসমিয়া জাতি গঠনের প্রক্রিয়ায় অবদান জুগিয়েছে। তেমনই রুটি রোজগারের প্রয়োজনের ও শিক্ষার খাতিরে অসমিয়া জাতিধারার সঙ্গে নিবিড় হয়েছিল চা শ্রমিক ও নেপালিরা। এদের সকলের মিলিত সংখ্যা কম নয় আনুমানিক ২ কোটি, ২০ থেকে ২৫ লক্ষের মতো। এদিকে দু কোটি চব্বিশ লক্ষের উপর, মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের মতো, কাগজ কলমে অন-অসমিয়া। বাকিরা অসমিয়াভাষী। সহিষ্ণুতা ও দূরদৃষ্টি থাকলে বর্তমান রাজনৈতিক শাসকরা উগ্র আঞ্চলিকতাবাদকে প্রশ্রয় দেবেন না। তাতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। আঘাত প্রত্যাঘাত হয়ে ফিরবে। আশা করি তারা ১৯৬০ সালের ভাষা বিল, ১৯৭২ সালে অসমিয়াকে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম ও অগপ ৮৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর স্কুলে অসমিয়া বাধ্যতামূলক করে (SEBA) অনুজ্ঞাপত্র সার্কুলার জারির কুফল থেকে শিক্ষা নেবেন। তেমন আলাদা অস্তিত্ব বজায় রেখে যে সব সংখ্যালঘু জাতিসত্তা বেঁচেবর্তে থাকতে চায় তারাও মূল জাতীয় স্রোতধারায় অসমিয়া ভাষার গরিষ্ঠ এবং বিশেষ স্থান তুলে থাকলে চলবে না। এভাবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উপর অসমে আগামী প্রজন্মের সার্বিক নিরাপত্তা নিহিত। পরিশেষে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ও বহুভাষী ধর্মনিরপেক্ষ দেশ মালয়েশিয়ার দৃষ্টান্ত তুলে (ভূমিপুত্র ৭%, মালয়ী ৪৭%, চীনা ৩৪% ও ভারতীয় ৮%) বলা যায় অসমে সুস্থিতি বজায়ের প্রয়াস সম্ভব। অবশ্য মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার নানা সীমাবদ্ধতার জন্য তা আমাদের কাছে একমাত্র মডেল হতে পারে না। প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হয়তো একদিন সমূহ সমস্যার সমাধান করবে। আমরা সে দিনের প্রতীক্ষায় রয়েছি। □

**সাহায্য স্বীকার :**

1. A Socio economic and Cultural History of Medieval Assam — by Prof. S. N. Sarma.
2. Modern Assamese Life & Culture — Edited by Dr. Birendra Nath Dutta & Dr. Amarjyoti Chowdhuri.
3. Anatomy of North East — by Mahitosh Purkayastha.
4. ডেউকা (মে, ১৯৯১)

নাটক

# থিয়েটারের জনপ্রিয়তা : দর্শকরুচির রূপান্তর

মেঘ মুখোপাধ্যায়

'কতকগুলি ব্যাধি-অমনোযোগিতা, উপেক্ষা, হালকাভাবে নেওয়ার মানসিকতা এবং প্রচণ্ড আত্মতুষ্টি আমাদের থিয়েটারকে আজ একটা প্রায় দুরারোগ্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। এ অবস্থাটা ক্রমশ হয়তো আরও খারাপ হবে। এটা কোন ভবিষ্যদ্বাণী নয়, এর ভিত্তিতে রয়েছে কিছু সঞ্চিত অভিজ্ঞতা।... অন্তত আট দশ বছর আগে থিয়েটারের যে একটা রমরমা ছিল, জাস্ত ভাব ছিল, বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা ছিল, তা এখনকার থিয়েটারে দেখা যাচ্ছে না। আগের মত তাপ উত্তাপ আর নেই—একটা ম্রিয়মান অবস্থা দেখা যাচ্ছে। ...কলকাতার নাটকের দলগুলোর ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, কেউবা দু বছরে, কেউবা চার বছরে একটা প্রোডাকশন নামাচ্ছেন, বছরে একটা প্রোডাকশনও তাদের হয় না। চেতনা, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, থিয়েটার কমিউন—এরা দুচার বছর পর পর একটা নাটক নামাচ্ছে।' মোহিত চট্টোপাধ্যায় এক যুগ আগে ৮৪ এর জুলাইতে 'শুধু থিয়েটার' নামের এক বুলেটিনে লিখিত 'নাট্যসমস্যা' নামে প্রবন্ধ শুরু করেছিলেন এই কথাগুলি দিয়ে। তিনি আরও বলেছিলেন—'আগের তুলনায় এখন থিয়েটার একটু নিস্তেজ বলে আমার মনে হয়।'

গত দশকের মাঝামাঝি নাগাদ ভাল থিয়েটার তথা গ্রুপ থিয়েটারের দর্শকসংখ্যা এমন হ্রাস পেয়েছিল যে থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত সকলেই কমবেশি চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। যাঁরা নাটক করেন, নাটক দেখেন অনেকেই মোহিতবাবুর মতো অনুভব করেছিলেন এক নিস্তেজ, ম্রিয়মান দশা। কলকাতার থিয়েটার যেন তার সেই আকর্ষণী শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল যার প্রভাবে 'নবান্ন' থেকে শুরু করে পরবর্তী ৫০, ৬০ ও ৭০-এর দশকে থিয়েটার একটা আন্দোলনের চেহারা নেয়। থিয়েটার দেখতে আসা মানুষের সংখ্যায় এই ভাঁটার টান দেখে তখন হতাশা-বিস্ময়-বিহ্বলতা-খেদ প্রকাশ পেয়েছিল নানা দিকে। থিয়েটারের ভিতরের ও বাইরের অনুরাগীরা নিজের নিজের অভিজ্ঞতা ও বোধ দিয়ে বিষয়টাকে বিচার করে বুঝতে চেয়েছিলেন কেন এমন হল। কী করে এই দশা উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কেউ কেউ ভাবতে শুরু করেছিলেন একটা বামপন্থী স্থিতিশীল সরকার যখন রাজ্যে কায়েম হয়েছে এবং পরবর্তী বছরগুলিতেও কায়েম থাকবার আশা-আকাঙ্ক্ষা চারদিকে পরিস্ফুট—তখন ভাল থিয়েটারের পাল থেকে এভাবে হাওয়া উধাও হয়ে গেল কেন! বরং উল্টো ব্যাপারটাই তো ঘটা উচিত ছিল। অভিপ্রেত ছিল নাকি যে সৎ শিল্পের চর্চা একটা সুস্থ, স্থিত বামপন্থী সরকারের ছত্রছায়ায় দিকে দিকে ব্যাপ্ত হবে—গভীর হবে, ভাল নাটকের, ভাল সিনেমার দর্শক আরও বাড়বে? নতুন প্রজন্ম আরও বেশি বেশি করে ভাল নাটক দেখতে ভিড় করে আসবে যখন তাদের আজ আর সত্তরের ঝোড়ো দিনগুলি পার হতে হচ্ছে না? কিন্তু অভিজ্ঞতা হচ্ছিল অন্যরকম।

অনেকে আবার মনে করেছিলেন টেলিভিশনের আবির্ভাবের ফলেই দর্শক আর মুখমুখী হচ্ছে না—ঘরকুনো বনে গিয়েছে। আমাদের সমাজে টেলিভিশন তখন এক নতুন মনোলোভা বিনোদনের মাধ্যম রূপে তার ছলাকলা বিস্তার করছে। থিয়েটারের দর্শক কি তবে টিভিসুন্দরীর ফাঁদে ধরা দিয়ে সন্ধেবেলায় গৃহবন্দী হল? কিন্তু ভাল নাটকে যে-দর্শক বাংলার নাট্য আন্দোলনের গর্বের অর্জন—তারা কি এত সহজে এক লহমায় তার ভালবাসার, প্রাণের নাটককে পরিত্যাগ করতে পারে? ভাল থিয়েটারের দর্শকও তার নাটাকর্মীদের মতো সমান দায়িত্ববান বলেই আমরা জেনেছি, বিশ্বাস করেছি। দূরদর্শনের মোহিনীশক্তি কি এতই তীব্র যে সে নাটকের ঘরের ছেলেদের কেড়ে নিয়ে গেল? তবে মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটকের অন্দরমহলের যে দুরারোগ্য ব্যাধির সংক্রমণ



ঘটার আঁচ পেয়েছিলেন তা কি মিথ্যে? তাঁর মন্তব্যের তিন বছর পরেই ৮৭-এর সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত বহুরূপী পত্রিকার সম্পাদকীয়র সূচনায় কুমার রায় লিখলেন—

> নাট্য আন্দোলনে গ্রুপ থিয়েটারের ভূমিকা সম্পর্কে সকলেই সাম্প্রতিক কালে উদ্বিগ্ন বোধ করছেন। ছোট ছোট পত্র-পত্রিকা থেকে শুরু করে বড় পত্রিকা পর্যন্ত এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এর থেকে একটা কথা বোঝা যাচ্ছে যে এই নাট্য আন্দোলন বা গ্রুপ থিয়েটারকে অস্বীকার করার উপায় নেই। একরকমভাবে গুরুত্ব পেয়েই যাচ্ছে। এটা ভালো কথা। কেননা বোঝা যাচ্ছে বহু মানুষ এই থিয়েটার সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু সত্যিই কি সচেতন? নাকি আমরাও থিয়েটার সম্পর্কে ভাবি—এই রকম একটা ইমেজ বজায় রাখবার জন্যে?

বাংলার নাট্য আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কুমার রায় সেদিন কীরকম বিচলিত হয়েছিলেন জানা যাবে ওই সম্পাদকীয় থেকে। সেদিনকার নানা দিকে ছড়িয়ে থাকা উদ্বেগ-চিন্তাকে তিনি সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করার জন্য বহুরূপীর ওই সংখ্যায় কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী নিবন্ধ রচনা করে একটা পথের দিশা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। গ্রুপ থিয়েটারের আয়ু কি ফুরিয়ে গেল? কেন দর্শক আনুকূল্য কমে গেল? গণনাট্য আন্দোলনের মতো আর একটা আন্দোলন কি তৈরি করা যায় না এর পুনরুজ্জীবনের জন্য? এবংবিধ প্রশ্নকারীদের এবং হইচই পাকানো পত্রপত্রিকাদের তিনি যে খুব একটা আমল দেননি তা বোঝা যায় তাঁর এই কটাক্ষে—

> এইসব প্রশ্নকারী পত্রপত্রিকা নাট্যচিন্তায় ভীষণভাবে মগ্ন এরকম একটা ভাব দেখাচ্ছেন— যেন এইসব প্রশ্নের উত্তরের সূত্রে তাঁরা একটা কিছু আবিষ্কার করে নিদান হাঁকবেন কেমন করে ভালো নাটক করা যায়, কেমন করে ভালো থিয়েটার গড়ে তোলা যায়।

সেদিনের সেই ঘুলিয়ে-ওঠা আবহাওয়ায় কুমারবাবু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় থিয়েটারের সকল তরফকে বলেছিলেন—

> নাটকের কোন উপকার হচ্ছে এসব প্রশ্ন এবং উত্তরের দ্বারা? বলা হবে আত্মসমীক্ষা। আত্মসমীক্ষার কাজটা তো যাঁরা কাজটা করছেন তাঁদেরই করার কথা— নিজেদের তাগিদে।...কিছু কিছু কথা স্পষ্ট করে বলা ভালো। গ্রুপগুলি নিজেরাই নিজেদের পথ বেছে নিতে পারেন কিংবা পথ হারাতে পারেন। অন্য কেউ বর্তমান সমস্যার সমাধান বাৎলে দিতে পারেন না।

মহৎ শিল্পীর মুখে এক মোক্ষম উচ্চারণ।

আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে গ্রুপ থিয়েটারের দর্শকভাগ্যে একটা ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে এবং পরবর্তী কয়েক বছরে কয়েকটি নাটকের সাফল্য থিয়েটারের দর্শককে আবার ফিরিয়ে এনেছে রঙ্গালয়ে। প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিত দলগুলির নবতম প্রযোজনাগুলির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি নবীন দলের নাটক দেখতে নিয়মিত দর্শকসমাগম হয়েছে / হচ্ছে। গ্রুপগুলি যে নতুন নতুন নাটক নামাতে উৎসাহ-উদ্দীপনা পাচ্ছে যে-কোনদিনের আনন্দবাজার পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় নাটকের বিজ্ঞাপন প্রকাশের কলাম দেখলেই টের পাওয়া যায়। রবিবারের আনন্দবাজার পত্রিকায় নাটকের বিজ্ঞাপন থাকে অন্যান্য দিনের চেয়ে আরও বেশি। খ্যাত-অখ্যাত-সদ্যখ্যাত কত দলের কতরকমের নাটক! এরকমটা বছর কয়েক আগে লক্ষ করা যেত না।

সাফল্য পাওয়া নাটকগুলি সারা বছর ধরে কিংবা বলা ভাল বছরের পর বছর ধরে নিয়মিত কলকাতার নানা মঞ্চে এবং নিকট ও দূর মফস্বলের নানা শহরে অভিনীত হচ্ছে। বাংলার বাইরেও উত্তর ভারতের যে সমস্ত শহরে বাঙালিরা বাস করেন গ্রুপগুলি গিয়ে সেখানে তাঁদের নামকরা প্রযোজনাগুলি দেখিয়ে আসছেন। নাট্যদলগুলি তাঁদের নাটকের এক মাসের বা পরবর্তী দু-তিন মাসের নির্দিষ্ট অভিনয়সন্ধ্যার তারিখ ও স্থান বিজ্ঞাপিত করে দিচ্ছেন সগর্বে। একটি দর্শকধন্য সফল প্রযোজনার বিগত ও পরবর্তী অভিনয়ের মোট সংখ্যার ঘোষণা জ্বলজ্বল করতে দেখা যাচ্ছে এই সমস্ত বিজ্ঞাপনে। এসব কিছুর একটাই অর্থ—নবইয়ের দশকে দর্শক ভাল নাটক দেখছেন। নাটকের দর্শক ফিরে এসেছে। নাটক ভাল হলে, ভাল লাগলে দর্শক কখনও মুখ ফিরিয়ে থাকে না। অন্য কোনও মাধ্যমের, অন্য কোনও জাতের বিনোদনের প্রলোভনই তাকে রঙ্গমঞ্চ থেকে সরিয়ে দিতে পারে না।

এক দশক আগের কয়েক বছর ব্যাপী দর্শক-প্রত্যাখ্যাত থিয়েটারের এক নীরস ও নিস্তেজ পর্ব কাটিয়ে ওঠার পিছনে তিনটি প্রযোজনার অভিঘাত হয়েছিল সবচেয়ে তীব্র এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। এই নাটক তিনটি হল থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'বেলা অবেলার গল্প' (১৯৮৬), অন্য থিয়েটার-এর 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা' (৮৮) এবং সায়কের 'দায়ভঙ্গ' (৯১)। নাটক তিনটির নির্দেশক যথাক্রমে অশোক মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী এবং মেঘনাদ ভট্টাচার্য। পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী কিংবা অরুণ মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত কোন নাটক দেখতে মানুষ যেরকম ভেঙে পড়ত—একটি নাটক কিছু মুগ্ধ-আলোড়িত দর্শক বারবার দেখতে আসতেন— সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হতে দেখা গেল এই তিনটি নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে। সমাজের নানা শ্রেণীর ও স্তরের দর্শক বছরের পর বছর যেন কী

এক প্রেরণায় আলোড়িত হয়ে এই নাটকগুলি দেখতে ভিড় করে এসেছেন এবং এখনও এই নাটকগুলির অভিনয়ে চোখে পড়ার মতো দর্শকসমাগম হচ্ছে। নাট্যবস্তু বা প্রযোজনার নিরিখে তুলনামূলক গুণবিচারের দিকে না গিয়ে বলা যায় দর্শক আকর্ষণের ক্ষমতার বিচারে 'দায়বদ্ধ' যে আলোড়ন জাগিয়েছিল তা আমাদের রক্তকরবী, পুতুল খেলা, অঙ্গার, কল্লোল, তিন পয়সার পালা অথবা মারীচ সংবাদ, জগন্নাথ-এর বিপুল দর্শক আকর্ষণের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

এই তিনটি নাটকের সাফল্য থেকে গ্রুপ থিয়েটারের দর্শক-সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে লাগল— এও বলা যায় যে হারানো দর্শক ফিরে এল। প্রবীণ ও নবীন নির্দেশকরা ভরসা পেলেন। একটা অসাড় নিস্তেজ সময় অতিক্রম করা গেল বলে আশা জাগল। এই তিনটি নাটক প্রধান ভূমিকা নিলেও আশির দশকের প্রথম দিকে কয়েকটি নাটক গ্রুপ থিয়েটারের প্রতি দর্শক সমাজের মনোযোগ ও আকর্ষণ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এদের মধ্যে কয়েকটি— বহুরূপীর রাজদর্শন ও আগুনের পাখি, সুন্দরমের সাজানো বাগান, থিয়েটার ওয়ার্কশপের শোয়াইক গেল যুদ্ধে, থিয়েটার কমিউনের জুলিয়াস সিজারের শেষ সাতদিন, পঞ্চম বৈদিকের নাথবতী অনাথবৎ। পরে নান্দীকারের শেষ সাক্ষাৎকার, সুন্দরমের অলকানন্দার পুত্রকন্যা, বহুরূপীর নিন্দাপঙ্কে এবং নব্বইয়ের দশকে আরও অনেক নাটক এসে এই শোভাযাত্রায় যোগ দিল। সঙ্গে হিন্দি ভাষার নাটক নিয়ে রইলেন রঙ্গকর্মী।

॥ ২ ॥

কিন্তু পরিস্থিতির মোড় ফেরার মুহূর্তে 'বেলা অবেলার গল্প' সেদিন কেমন আলোড়ন জাগিয়েছিল তা আমরা জানতে পারি আমাদের থিয়েটারের এক উজ্জ্বল সংগ্রামী পুরুষ তাপস সেনের উচ্ছ্বসিত মন্তব্য থেকে— 'সব মিলিয়ে 'বেলা অবেলার গল্প' অনেক দিন পরে একটা ভাল টিম ওয়ার্কের ফসল, একটা টোটাল থিয়েটার এক্সপিরিয়েন্স। ....আসলে বাঙলা নাটকের অবেলায় এই নাটক ভরসা জুগিয়েছিল। আন্তরিকভাবে একটা সিরিয়াস কাজ করলে এখনও তা অভিনন্দিত হয়, এইটুকুই আশার কথা।' (গ্রুপ থিয়েটার / ফেব্রু-এপ্রিল ৮৮) নাটকটির নির্দেশক ও নাট্যকার অশোক মুখোপাধ্যায় সাফল্যের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছিলেন— 'বেলা অবেলার গল্প থিয়েটার ওয়ার্কশপকে অনেক পুরস্কার এনে দিয়েছে, সম্মান দিয়েছে, অনেক অভিনয় ও অর্থ দিয়েছে। তবু আমাদের কাছে এ নাটকের আসল শিক্ষা দুটি। এক, সিরিয়াস নাটক সিরিয়াসলি করলে তা দেখার লোক আজও অনেক। দুই, আমাদের মতো গ্রুপ থিয়েটারের নাটক যা তৈরি করতে পারে তা হল বিতর্ক-আলোচনা।' (ঐ)

মাধব মালঞ্চী কইন্যা ছিল বাংলা থিয়েটারে যেন এক উজ্জ্বল আবির্ভাব। নাটকটির আলোচনা করতে গিয়ে থিয়েটারের বিদগ্ধ পণ্ডিত ড: বিষ্ণু বসু লিখেছিলেন — 'কিন্তু যে-কলকাতা একদিন আধুনিক থিয়েটারের শুধু জন্ম দেয়নি, তাকে দীর্ঘকাল লালনও করে এসেছে সেই কলকাতায় থিয়েটারের মৃত্যু হয়েছে এমন প্রচার (নাকি, অপপ্রচার) আমাদের বিমর্ষ, এমনকি হতাশাগ্রস্ত করে তুলছিল। এমন সময়ে বিভাস বাবুর 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা' যেন আমাদের উপর বিস্ফোরিত হল। এখন যেন অনায়াসেই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ধার করে লেখা যায়— পতাকা উড়াইয়া দাও, তাঁহাতে নাম লেখ 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা'।' (ঐ)

কাব্য সাহিত্য চলচ্চিত্র শিল্পের বিদগ্ধ ব্যক্তিরা সহ সর্বস্তরের মানুষ বিপুল উৎসাহ নিয়ে নাটকটি দেখেছেন এবং রোমাঞ্চিত ও মুগ্ধ হয়েছেন। কয়েকটি দিক দিয়ে এই প্রযোজনা বাংলা থিয়েটারে এক অভিনব অভিজ্ঞতা। হাবিব তনবীরের নয়া থিয়েটার, বাংলাদেশের ঢাকা থিয়েটার এবং কয়েকটি মারাঠি ও দক্ষিণী থিয়েটার লোকনাট্যের আঙ্গিকে ও কাহিনীসূত্রে কলকাতার বিদগ্ধ দর্শকদের চমৎকৃত করে দিয়েছিল। এর বিপরীতে কলকাতার থিয়েটারকে অনেকে মনে করছিলেন জোলো—যেন তার প্রাণশক্তি ফুরিয়ে এসেছে, রঙ মরে গেছে। এই থিয়েটারের উদ্ভাবনী শক্তি নিঃশেষ হয়েছে এবং বিদেশি নাটকের রূপান্তর ও পশ্চিমি নাট্যকৌশলের অন্ধ গতানুগতিকতা সম্বল করে বেশি দূর যেতে পারবে না বলে যখন অনেক বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন তখন 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা' আত্মপ্রকাশ করে সগর্বে জানিয়ে দিল যে বাঙালির থিয়েটার এখনও নতুন মাইলফলকের দিকে যাত্রা করতে পারে।

বিভাস চক্রবর্তী সে সময়কার এক সাক্ষাৎকারে নাটকটির সাফল্যের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেছিলেন— 'অনেকে বলেছে যে হারানো শৈশব ফিরিয়ে দিয়েছে, হারানো— আসলে এটা একটা বাঙালি নাটক হয়েছে— এক নম্বর। দু নম্বর— হারানো শৈশবটা ফিরিয়ে দিয়েছে। সৌমিত্রদার কথা আমি বলছি— সেটা হচ্ছে যে বাঙালি যে ভালো জীবনটা আকাঙ্ক্ষা করে, তার একটা ছবি সে দেখতে পায়। সেই ছবিটা পায় এই নাটকটা থেকে।' তিনি একথাও বলেছিলেন যে, 'এটা একটা রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্যা নিয়ে নাটক নয়।' তিনি চেয়েছিলেন বাঙালি দর্শককে এমন একটা নাট্য উপহার দিতে যা মানুষের কিছু সঞ্চিত বা হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিকে ফিরিয়ে দেবে, দেশজ একটা অনুভব গড়ে তুলবে তার মনোলোকে এবং তা সে উপভোগ করবে। বিভাসবাবু একশো ভাগেরও অধিক সফল হয়েছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না।



নাট্য আন্দোলনের অন্যতম শরিক সায়ক অনেকদিন ধরেই নাটক উপস্থাপনা করছিল। তাদের সব কটি প্রযোজনা দর্শক আকর্ষণে সমর্থ না হলেও দুটি নাটক দর্শকদের আকৃষ্ট করেছিল। বহু জায়গায় বহুবার অভিনীত হয়ে 'দুই হুজুরের গপ্পো' এবং 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল' সায়কের কাছে দর্শকদের দাবি বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু দায়বদ্ধ প্রযোজনার পর যে বিপুল দর্শক-সমাদর পাওয়া গেল তা তারা যে প্রথমে নিজেরাও অনুমান করেনি একথা জোর দিয়ে বলা যায়। আনন্দবাজার পত্রিকায় নাটকটির সমালোচনা করতে গিয়ে বিভাস চক্রবর্তী লিখলেন— '১৯৯১তে যখন বিস্ফোরিত হল দায়বদ্ধ, বোঝা গেল থিয়েটারের একটা বড় জায়গায় পৌঁছেছে সায়ক।' (৯/৮/৯১)— দেশ পত্রিকায় সমরেশ মজুমদার তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ করলেন এই ভাষায়— 'মেঘনাদ ভট্টাচার্য চন্দন সেনের এই নাটকটিকে আমাদের বুকের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে দিয়েছেন অদ্ভুত কিছু দমবন্ধ মুহূর্ত রচনা করে।' (২২/২/৯২)

কিছুকাল আগে 'দায়বদ্ধ'-এর সাফল্যের কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টায় পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা মেঘনাদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। জানতে চেয়েছিলাম 'দায়বদ্ধ'-এর অভাবনীয় দর্শকসাফল্য লাভের পিছনে কোন্ কোন্ দিক / গুণ উল্লেখ করার মতো বলে তিনি মনে করছেন। তাঁর প্রথম কথা ছিল যে দর্শকরা যেহেতু নাটকটাকে নিয়েছেন, কলকাতার মঞ্চগুলোতে ছাড়াও সারা বাংলার প্রায় প্রত্যেক শহরে নাটকটা দেখতে দর্শকরা এসেছেন তাই দায়বদ্ধ কেন ভাল লাগছে তাঁদের কাছ থেকেই জানার চেষ্টা করা উচিত। সেটাই হবে সবচেয়ে ভাল। দর্শকরাই তাঁদের ভাললাগার, একাধিকবার দেখার কারণগুলো ব্যক্ত করুন—এতে তিনিও উপকৃত হবেন।

মেঘনাদ নিজে যা মনে করেন তা হল এইরকম —

> দায়বদ্ধের উপস্থাপনার মধ্যে কোনো ভান নেই। সোজাসুজি সহজ বক্তব্য রয়েছে এতে। গল্প কাঠামো আর আন্তরিক অভিনয় হল এ নাটকের অভাবনীয় সাফল্যের প্রধান সম্পদ। প্রকাশভঙ্গিতে কোন অস্বচ্ছতা বা অহেতুক জটিলতা পাকানোর চেষ্টা নেই।
>
> সমাজের পক্ষে অ্যালার্মিং একটা বিষয়কে বৃহৎ প্রেক্ষাপটে দেখা হয়েছে। মানুষে মানুষের মধ্যে কীভাবে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা জন্ম নেয়, মানবিক সম্পর্ক নষ্ট করে, বিকৃত করে, সম্পর্ক কীভাবে গড়ে-ভেঙে যায় এই ছবিটা পরিস্ফুট করা গেছে।
>
> মানবিক সম্পর্কের রূপায়ণ— অভিনয়ে জীবন্ত করে তোলা— দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। সকলের অভিনয়ের স্বতস্ফূর্ততা দর্শকদের ভাল লেগেছে।
>
> নাটকটার গতি আগাম অনুমান করার স্কোপ নেই। ফলে দর্শকমনে কৌতূহল বজায় থেকেছে। বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে টেনশন চলেছে— নাটক ফ্ল্যাট হতে পারেনি।
>
> নাটকটার মধ্যে অনেকগুলো মোমেন্টস অফ ট্রুথ তৈরি হয়েছে— জীবনের ও মানবিকতার কিছু দুর্লভ, গভীর মুহূর্ত গড়ে উঠেছে।
>
> একটা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারকে কেন্দ্র করে নাটকটা গড়ে উঠলেও নাটকটা কিন্তু শুধু পরিবারকেন্দ্রিক একটা সংকীর্ণ গল্প হয়ে যায়নি। পরিবারের পরিধি ছাড়িয়ে বৃহৎ সমাজে ব্যাপ্ত হয়ে যেতে পেরেছে। 'দায়বদ্ধ' দর্শকদের কাছে তাদের জীবনের একটা বড় মেসেজ নিয়ে হাজির হয়েছে।

তিনি মনে করেন— দর্শকের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ। সায়কের 'যদিও স্বপ্ন' নাটকের মাত্র পঞ্চাশটা শো হয়েছিল — নাটকটা ভাল চলেনি। কিন্তু এর জন্য তিনি দর্শকদের দোষারোপ করেননি। দর্শকদের বোকা ভাবতে তাঁর আপত্তি। তাঁর বোধ হয় যে সেক্ষেত্রে নাটকটা করার মধ্যে কোথাও গণ্ডগোল ছিল। জনপ্রিয় প্রযোজনা যে হয়নি তার দায় তিনি পরিচালক হিসাবে নিজেই নিতে চান।

সাম্প্রতিক নাটকের দর্শকসমাগম বৃদ্ধি তথা নাটকের জনপ্রিয়তা নিয়ে অরুণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। যে চেতনা তথা অরুণ মুখোপাধ্যায়ের মারীচ সংবাদ এবং জগন্নাথ-এর বিপুল জনপ্রিয়তা বাংলা থিয়েটারে কিংবদন্তি হয়ে গিয়েছে অদ্ভুত ব্যাপার যে তাঁরই পরিচালনায় আশির দশকে 'চেতনা' রোশন, মা, জ্যেষ্ঠপুত্র, কবীর অভিনয় করে আশানুরূপ দর্শক আকর্ষণে সক্ষম হয়নি। নাটকগুলি কি বিষয়বস্তু, কি নির্দেশনা, মঞ্চ পরিকল্পনা, কি অভিনয়ে কোনও অংশেই শিল্পের মানে-ন্যূন ছিল না। সমাজ-সভ্যতার পক্ষে নাটকগুলি অভিনয়ের প্রয়োজন তিনি জরুরি মনে করেছিলেন বলেই ওই নাটকগুলি লিখেছিলেন / নির্বাচন করেছিলেন এবং অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু সোজা কথায় বলা যায় যে নাটকগুলি দর্শকে নেয়নি— যদিও সংবাদপত্র সহ বিভিন্ন সাময়িক পত্র প্রশংসাসূচক সমালোচনা করেছিল। নাট্যকেন্দ্রিক বিদগ্ধ দর্শকরা, তাঁর সতীর্থরা প্রযোজনাগুলিকে উল্লেখযোগ্য মনে করেছিলেন কিন্তু সাধারণ দর্শক টিকিট কেটে নাটকগুলি দেখতে ভিড় করে আসেনি। কলকাতার মঞ্চে আশানুরূপ দর্শকসমাগম না হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় নাটকগুলি সেরকম কল-শো পায়নি— যার ফলে সারা বাংলায় অভিনীত হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। শিল্পসম্মত এবং সমাজমনস্ক নাট্য প্রযোজনা করেও সাধারণ দর্শকের সমাদর না পেয়ে অরুণ মুখোপাধ্যায় দর্শকরুচির বিষয়ে চিন্তা প্রকাশ করেছেন।

তিনি জানালেন, ভাল নাটক দেখার একটা দর্শক সব সময়ই আছে। একটা ভাল নাটক প্রযোজনার খবর ছড়িয়ে পড়লেই

তাঁরা দেখতে আসেন, কিন্তু এই দর্শক সংখ্যাটা খুব বেশি নয়। এদের ওপর ভরসা করে তো সেভাবে একটা নাটক জনপ্রিয় হয় না বা নাটকটার বহু অভিনয় হতে পারে না। বিশেষ করে 'চেতনা'র মতো নাট্যদল যখন রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ নাটক প্রযোজনা করে সে নাটক দেখার জন্য চাই রাজনৈতিক দায়িত্ববোধে উদ্দীপ্ত দর্শকসমাজ। রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আশা জেগেছিল যে এই শ্রেণীর দর্শক বাড়বে— বামপন্থী রাজনৈতিক বা নানা ধরনের গণসংগঠন / ছাত্রসংগঠনের সদস্যরা আরও বেশি বেশি করে রাজনৈতিক বক্তব্যসমৃদ্ধ নাটক দেখতে ভিড় করবে। সংগঠনের কর্তারা তাঁদের সদস্যদের রাজনৈতিক চেতনার মান বাড়িয়ে তুলবেন এবং এক্ষেত্রে নাটক দেখা হবে একটা হাতিয়ার। কিন্তু মা, রোশন, কবীর সেরকম সাফল্য না পাওয়ায় বোঝা গেছে প্রত্যাশিত ঘটনাটা ঘটেনি। ট্রেড ইউনিয়ন বা গণসংগঠনের কর্মীরা একদা যেমন 'চেতনা'-র পাশে ছিলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁরা আর নেই। তাঁরা আর সেভাবে রাজনৈতিক নাটক দেখার দায়িত্ব বোধ করছেন না। ফ্রন্ট আমলে রাজনৈতিক কর্মীরা থিয়েটারবিমুখ হয়ে গিয়েছে। এই দর্শকশ্রেণীকে একদা চালিত করতেন যে-সংগঠন নেতৃত্ব তাদের মধ্যে আত্মতৃপ্তি এসে গিয়েছে। যাঁরা একদা গ্রামেগঞ্জে কলকারখানার মাঠে চেতনাকে ডেকে নিয়ে যেতেন নাটক করানোর জন্য তাঁরা আজ 'চেতনা'র নাটকের বদলে জনপ্রিয়তা লাভ করা মানবিক আবেগসমৃদ্ধ নাটক নিয়ে যাওয়াই পছন্দ করছেন। একটা বলিষ্ঠ বক্তব্যবাহী, রাজনৈতিক চেতনায় উজ্জ্বল কিন্তু প্রথম কিছু শো'র পর তথাকথিত জনপ্রিয়তা না পাওয়া নাটক নিয়ে যেতে তাঁরা চাইছেন না। অথচ তাঁরা ডাকলে, অভিনয়ের সুযোগ পেলে চারদিকে বিতর্ক আলোচনা হত এবং হয়তো নাটকটা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারত। আরও দর্শক নাটকটা দেখতে চাইতেন। কিন্তু আজ সেই পরিবেশ নেই। যেহেতু অ্যাকাডেমির দর্শক নাটকটি নিচ্ছে না— বহু জায়গায় বহু অভিনয়ের সুযোগ তৈরি হচ্ছে না। সংগঠন-কর্তারা নাটকটিকে তাঁদের কর্মী / সভ্যদের সামনে নিয়ে যাবার আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। সত্তর দশকে কিন্তু এরকম ছিল না।

## নাটকে রাজনৈতিক বক্তব্য থাকতেই হবে আমি মনে করি না—অশোক মুখোপাধ্যায়

প্রখর নিদাঘের এক সকালে অশোক মুখোপাধ্যায়ের কাছে হাজির হয়েছিলাম কিছু প্রশ্ন নিয়ে। বহুদিন বাদে সেদিন ভোর থেকে গ্রীষ্মের ভয়ঙ্কর দাবদাহ ম্লান করে আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছিল। অশোকদার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা নিয়ে বসতে চাই শুনে কিছুদিন আগে তিনি বলেছিলেন, তার আগে তুমি আমাদের 'বেলা অবেলার গল্প' দেখে নাও। নাটকটা প্রথম দিকে প্রায় একদশক আগে দেখেছিলাম শুনে বললেন, আর একবার নতুন করে দেখ। কদিন আগে তাই দেখে নিয়েছিলাম। দেখলাম ভীষণ গরম উপেক্ষা করেও নাটকটা দেখতে এসেছেন অনেকে— প্রায় হলভর্তি। ১৩ জুন '৯৬ বেলা অবেলার দশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান হবে— দশ বছরের মাথায় যেরকম দর্শক-সমাগম হচ্ছে তা উৎসাহজনক।

'৮৫-তে বিভাস চক্রবর্তী থিয়েটার ওয়ার্কশপ ছেড়ে চলে যান। দলের ভাঙন ও সংকটের কালে দলের নেতৃত্বভার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন অশোক মুখোপাধ্যায়। তাঁর সামনে তখন প্রধান দায়িত্ব ছিল একটা বলিষ্ঠ প্রযোজনা করে দলকে দাঁড় করানো এবং সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তিনি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী এবং ফ্রিৎস ভেনেভিৎসের পরিচালনায় (গালিলিওর জীবন— শম্ভু মিত্রর সঙ্গে) অভিনয় করেছেন। নাটকের অনুবাদক এবং বড় মাপের অভিনেতা হিসাবে অশোক মুখোপাধ্যায় তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু '৮৬-তে বেলা অবেলার গল্প প্রযোজনার পর বাংলা থিয়েটার পেল আর একজন বড় মাপের পরিচালককে। তারপর থেকে দশ বছর কেটে গিয়েছে। অশোক মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আমরা কয়েকটি সার্থক এবং মনে রাখার মতো নাট্যপ্রযোজনা পেয়েছি। সাম্প্রতিক কালে রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রযোজনায় সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের লেখা নাটক 'দুঃসময়', থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'একা এবং একা' এবং পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' পরিচালনা করে ভাল থিয়েটারের দর্শকমহলে তিনি নতুন আন্দোলন জাগিয়েছেন। পরিচালনা ও অভিনয়ের বাইরে এই মানুষটিকে এখন রবীন্দ্রভারতীর নাটক বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির বিভিন্ন পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের নানা স্তরে তাঁর উৎসাহ-উদ্যম সুবিদিত। এই দশকে সত্যজিৎ রায় এবং বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর পরিচালনায় দুটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রে তাঁর অভিনয় দর্শকদের আকৃষ্ট করেছে।

### কথোপকথন

**মেঘ মুখোপাধ্যায় :** অশোকদা, 'বেলা অবেলার গল্প' প্রথম অভিনয়ের পর তো বেশ আলোড়ন জাগিয়েছিল। তখন গ্রুপ থিয়েটারের তথা ভাল নাটকের দর্শক কমে



গিয়েছিল— চারদিকে একটা হতাশার ভাব দেখা দিয়েছিল যে লোকে আর নাটক দেখতে আসছে না। কিন্তু এই নাটকটা প্রযোজনা হবার পর অবস্থাটা পাল্টাতে থাকে। তখনকার একটা লেখায় তাপস সেনের মতো মানুষ তো এই নাটকের জন্য আপনাকে এবং থিয়েটার ওয়ার্কশপকে দারুণ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

**অশোক মুখোপাধ্যায় :** হ্যাঁ, তেমন একটা ঘটনা ঘটেছিল। সবাই-ই তখন বলেছিলেন যে 'বেলা অবেলা' দর্শককে থিয়েটারে ফিরিয়ে এনেছে।

— তা, বেলা অবেলা যে আপনারা কিছুদিন আবার নতুন করে করছেন, এখন দর্শক কেমন হচ্ছে?

— ভালই, তুমি সেদিন কেমন দেখলে?

— আমি তো দেখলাম জ্যৈষ্ঠের ভয়ংকর গরম উপেক্ষা করেও ভালরকম দর্শক এসেছিলেন।

— দ্যাখো, দর্শক ভেঙে না পড়লেও, ভাল দর্শক হচ্ছে বলতে পারি। কিন্তু তুমি যে বললে কিছুদিন নাটকটা আবার নতুন করে করছি— ঠিক তা তো নয়। নাটকটা '৮৬ থেকে রেগুলার করছি। '৯১-তে রাম থিয়েটার ওয়ার্কশপ ছেড়ে চলে যায়— ওই তো বাবার রোলটা করত— তখন কিছুদিন বন্ধ রাখতে হয়েছিল। তারপর আবার অভিনয় শুরু করি। সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রযোজনা চলতে থাকে।

— ৮৬-তে বেলা অবেলার পর 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা' আর 'দায়বদ্ধ' দেখতে দর্শক ভিড় করে এল— থিয়েটারের জগতে ভাঁটার দশা কেটে গেল। তারপর গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটা নাটক সফল হল— অনেক দর্শক হল।

— যেমন ধরো তখন বিকেল, মুষ্ঠিযোগ, গল্প হেকিমসাহেব... তুমি এরকম আরো নাটকের নাম বলতে পার— এগুলোতে ভালই দর্শক হচ্ছে। নাটক দেখতে এখন দর্শক আসছে। আমাদের 'এবার গণেশের পালা' কিম্বা 'একা এবং একা'-তেও ভাল দর্শক পাচ্ছি। তা বলে তুমি যদি বল সব দলের সব নাটকেই মাধব মালঞ্চী বা দায়বদ্ধর মতো দর্শক ভেঙে পড়বে তা কিন্তু ঠিক নয়। তেমনটা সব ক্ষেত্রে ঘটে না।

— বোধহয় আশা করাও ঠিক নয়?

— হ্যাঁ। একটা ভাল নাটক হলে দর্শক আসবেই। যেমন ধরো নাথবতী অনাথবৎ— ওতে তো প্রথম থেকে ভালই দর্শক আসছে। কিন্তু মেঘনাদের নতুন নাটক 'বাসভূমি'-তে কি 'দায়বন্ধে'র মতো দর্শক হচ্ছে? আমার তো মনে হয়না। দায়বদ্ধর মতো ভিড় ভেঙে পড়েনি নিশ্চয়।

— এই যে নাটক দেখতে ভিড় হচ্ছে— বিভিন্ন নাটক সাফল্য পাচ্ছে— এর উল্টো দিকে নানা মহলে একটা কথা উঠেছে যে গ্রুপ থিয়েটার তার চরিত্র হারিয়ে ফেলছে। গ্রুপ থিয়েটারে আর রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ নাটক হচ্ছে না। কথাটা নিশ্চয় আপনার কানেও এসেছে— এ নিয়ে আপনি কী মনে করেন?

— নাটকে রাজনৈতিক বক্তব্য থাকতেই হবে আমি মনে করি না। নাটকের মূল বিষয় হচ্ছে দ্বন্দ্ব। নাটকে দ্বন্দ্ব থাকতেই হবে। এই দ্বন্দ্ব হতে পারে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, মতাদর্শে মতাদর্শে, প্রজন্মে প্রজন্মে। দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত। দুটো আলাদা মতাদর্শের, ধ্যানধারণার, জীবনবোধের সংঘাত— তার থেকেই নাটক জোরাল হবে। রাজনৈতিক বক্তব্য থাকতে পারে আবার নাও পারে। যেমন ধরো 'একা এবং একা'-তে। একটি মেয়ে যে অভিনয় করতে ভালবাসে, তার মধ্যে সে বেঁচে থাকার রসদ পায় কিন্তু তার স্বামী বোঝে অন্যরকম করে। স্বামীর কাছে অভিনয় তত বড় বস্তু নয়। সেও তার স্বপক্ষে কতকগুলো যুক্তি তোলে— অভিনয় ছেড়ে ভাল করে সংসার করতে বলে, সে একটা গার্হস্থ্য আরামপ্রদ জীবন চায়। তার কথাগুলোও ফেলে দেবার নয়। এতে তো সরাসরি কোনও রাজনীতি নেই কিন্তু একটা সার্থক নাটক তো হয়েছে এবং লোকে দেখছে— তাই না?

— দায়বদ্ধতেও রাজনীতি নেই— এটা কোনও রাজনৈতিক বিষয়ের নয়।

— আমি মনে করি দায়বদ্ধ একটা প্রগতিশীল নাটক। ওই যে একটা ট্রাক ড্রাইভার— সে এক অসহায় রমণী ও তার মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছিল, নিজের করে নিয়েছিল— তাদের নিরাপত্তা, সামাজিক সম্মান বজায় রাখার জন্য নিজে অনেক ত্যাগস্বীকার করেছে— এর কোনও মূল্য নেই? এখানেও সংঘাত ঘটেছে। আসলে যে কোনো সংঘাতই নাটকের উপজীব্য হতে পারে। দেখতে হবে, তুমি মূল্যবোধের কোন্‌দিকে আছ? নাট্যকার বা পরিচালক কোন্ দিকে, কার দিকে আছে সেইটাতেই নির্ভর করবে নাটকটা ভাল কিনা, প্রগতিশীল কিনা। 'একা এবং একা' দেখলে বোঝা যায় আমি কোন্ পক্ষ নিয়েছি। দ্যাখো, তোমাকে একটা পক্ষ নিতেই হবে।

— আপনার পরিচালনায় 'চিরকুমার সভা'য় তো বেশ দর্শক হচ্ছে। আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দেখে মনে হয় গত কয়েক মাসে নাটকটা বারবার অভিনয় হচ্ছে— এর কারণ কিছু ভেবে দেখেছেন? —

— তবেই দ্যাখো, এটায় কোনো রাজনৈতিক ব্যাপার নেই, সবচেয়ে বড় কথা এটা রবীন্দ্রনাথের নাটক— কিন্তু প্রতিটা শোয়ে ভাল দর্শক হচ্ছে। তার মানে লোকে ভাল নাটক দেখতে চায়। নতুন নতুন ছেলেমেয়েরা অভিনয় করেছে— ভাল অভিনয় করেছে। প্রযোজনটা ভাল হয়েছে। ৯৫-এর ২৪ সেপ্টেম্বর

প্রথম অভিনয় হল। এই নাটকটা দিয়েই কলকাতায় একটা নতুন মঞ্চ — মধুসূদন মঞ্চ — উদ্বোধন হল গত বছর ১২ অক্টোবর।

— কলকাতার বাইরে নাটকটা কোথায় কোথায় হয়েছে?

— গত বছর বিষ্ণুপুর মেলায় হয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হয়েছে। শিগগির সিউড়ি, বহরমপুরে যাবে। ব্যাঙ্গালোরে এবং সর্বভারতীয় নাটকের অনুষ্ঠানে গেছে। বলতে কি, চিরকুমার সভার অভিনয়ের উদাহরণ দেখে মনে হয় আমাদের থিয়েটারে একটা ভাল আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। এতে উৎসাহিত হওয়া যায়।

— কিন্তু অশোকদা, এই সময়ের মধ্যেই তো চেতনার 'দুর্যীমুখী যোদ্ধা'য় সেরকম দর্শক হচ্ছে না, নাটকটা আপনার কেমন লেগেছে?

— ওটা একটা ভাল প্রোডাকশন। কিন্তু সেরিব্রাল। মস্তিষ্কপ্রধান। নাটকের কাহিনীটায় জটিলতা রয়েছে — কে কখন ডন কিহোতে হয়ে যাচ্ছে আর কখনই বা সারভানতেসের ভূমিকায় বদলে যাচ্ছে — এই নিয়ে একটা জটিলতা আর কি — হলে বসে পুরোটা বুঝে ওঠা যায় না বলেই হয়তো দর্শক সেরকম হচ্ছে না —

— আমি মনে করেছিলাম নাটকটার বিদেশি চরিত্রনাম, ঘটনাপ্রসঙ্গ আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী নয় বলে দর্শক একাত্ম হতে পারছে না। এরকম কিছুও কি সাধারণ দর্শকের নাটকটা না নেওয়ার কারণ হতে পারে?

— হ্যাঁ, সেটাও একটা দিক বলতে পার। যেমন তোমাকে আমার নিজের একটা উদাহরণ দিই। '৯১-তে আমরা 'বেড়া' করেছিলাম। নিগ্রো সমস্যার, কালোদের ব্যাপার নিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ নাটক। নাটকটা সরাসরি অনুবাদ করেছিলাম। 'বেড়া' সেরকমভাবে দর্শক নেয়নি যেমন আশা করেছিলাম। আমার মনে হয় 'বেড়া'র ব্যাপারটাও অরুণবাবুর মতো হয়ে গিয়েছিল — মস্তিষ্কপ্রধান।

— নাটকটার অভিনয় তাই বন্ধ করে দিয়েছেন?

— বন্ধ করেছিলাম কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে অনুবাদের বদলে রূপান্তর করে নাটকটা আর একবার প্রযোজনা করি। পুনঃপ্রযোজনার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। নাটকটা নতুন করে পরে একবার লিখতে বসব ভেবেছি।

— আচ্ছা অশোকদা, এক সময় তো বলা হয়েছিল যে নতুন বিনোদন-মাধ্যম টেলিভিশন এসে মানুষকে ঘরবন্দি করে ফেলেছে — ফলে থিয়েটারে দর্শক আসছে না। এখন তো টেলিভিশনের গ্রাস আরও ব্যাপক হয়েছে — কত রকমের দেশি বিদেশি চ্যানেল — কিন্তু থিয়েটার দেখতে মানুষ আসছে — তাহলে তখন কি ভুল ভাবা হয়েছিল?

— তখন যে নাটক দেখতে দর্শক ভিড় করেনি তা পুরো বলা যায় না। নাথবতী দেখতে তো প্রচুর মানুষ এসেছিল সেই সময়েই। কিন্তু ব্যাপারটা হল, কোনও দেশে টেলিভিশন যখন প্রথম যায় একটা চমক থাকে, চটক থাকে। কিছু মানুষকে ঘরে বসিয়ে দেয়। পরে পরে সেই চমকটা কেটে যায়। মানুষ স্বাভাবিকতা ফিরে পায়।

— এখন তো কলকাতা দূরদর্শনে নিয়মিত গ্রুপ থিয়েটারের নাটক দেখাচ্ছে। আপনারা প্রধান কয়েকজন পরিচালক এবং গ্রুপ থিয়েটারের অন্যান্য প্রতিভাবান অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দূরদর্শনের বিভিন্ন সিরিয়ালে নিয়মিত অভিনয় করছেন। গ্রুপ থিয়েটারের দর্শক বাড়ার এটা কি কোনও কারণ হতে পারে? টেলিভিশনে আপনাদের এই নতুন ভূমিকা? লোকে তো টিভি দেখে, দেখছে তাই একথাটা তুললাম —

— নাঃ আমি তা মনে করি না। দূরদর্শনের সিরিয়াল ইত্যাদিতে গ্রুপ থিয়েটারের লোকদের অভিনয়ের ফলে যে আলাদা করে মঞ্চের দর্শক বেড়ে গিয়েছে — আমার তেমন বোধ হয় না। লোকে দূরদর্শনে আমাদের কাজগুলো দেখে নিশ্চয় — কিন্তু তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের নাটক দেখতে আসে — তাই কি? নাঃ। যারা আসে আমাদের থিয়েটারের টানেই আসে। আসছে। দূরদর্শনের প্রভাব নেই।

— এই দশকে থিয়েটারের দর্শক বেড়েছে — নতুন নতুন গ্রুপ তৈরি হচ্ছে — নতুন নতুন নাটক প্রযোজনা হচ্ছে প্রতি বছর। দর্শক বাড়ার পেছনে ভাল প্রযোজনা ছাড়া আর কি কোনও কারণ আছে?

— যে কোনও কারণেই হোক নাটকটা মধ্যবিত্তদের ব্যাপার। বড়লোকরা, কোটিপতিরা নাটক দেখে না। ওদের সময় কাটানোর, বিনোদনের অনেকরকম পথ আছে। ওরা কুলুমানালি যায়, বিদেশে যায়। মনের পুষ্টি বা আনন্দ লাভের জন্য কষ্ট করে ওদের মঞ্চে আসতে হয় না। আবার দ্যাখো গ্রামের চাষিরা বা শহরের বস্তিবাসীরাও নাটক দেখতে আসে না। এই যে আমার ফ্ল্যাটের পাশে বস্তি রয়েছে — ওরা কি জানে কলকাতায় 'অ্যাকাডেমি' আছে? রবীন্দ্রসদন, গিরিশ মঞ্চ, শিশির মঞ্চের ওরা খোঁজ রাখে? এসবের নামই জানে না। কারণ যাই হোক নাটাচর্চার ব্যাপারটা মধ্যবিত্তদের। মনে হয় গত একদশকে মধ্যবিত্তদের হাতে টাকা তাদা এসেছে। যে টাকা তারা আগে খরচ করতে পারত এখন তার চেয়ে বেশি করতে পারে। ওরা এখন বেশি বেশি করে নাটক দেখতে আসছে। আগে আমাদের টিকিট বিক্রিতে দেখতাম বেশি দামের টিকিটগুলো পরে বিক্রি হত, আগে লোকে কম দামের টিকিট কিনে নিত। এখন হচ্ছে উল্টো, ২০/২৫ টাকা দামের টিকিটই লোকে আগে কিনে নিচ্ছে। ওই সিটগুলো আগে ফুল হয়ে যাচ্ছে। তুমি



যা জানতে চাইছ এটা তার একটা কারণ হতে পারে।

— আর কিছু?

— আমরাও চেষ্টা করছি দর্শক বাড়াবার। দেখেছ আগে আনন্দবাজারে গ্রুপ থিয়েটারের কেমন ছোট মাপের বিজ্ঞাপন বেরোত। এখন বড় বড় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হচ্ছে। বেশি স্পেস নিয়ে। ফলে দর্শকদের নজরে আসছে আমাদের থিয়েটার। আর একটা জিনিস বলি। এটা কেউ লক্ষ করছে না। এ নিয়ে আমি তেমন আলোচনা শুনিনি। হাতিবাগানের থিয়েটার মার খাচ্ছে।

— মার খাচ্ছে? কীরকম? ওরা তো ফিল্মস্টারদের দিয়ে নাটক করায় —

— না, ফিল্মস্টারদের দিয়েও চলছে না। অনুপকুমার, তরুণকুমার, রবি ঘোষদের দিয়েও হাতিবাগানের থিয়েটারে ভিড় হচ্ছে না। লোকে আর বিশেষ ওখানে যায় না। এমনকি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের চন্দনপুরের চোরও চলেনি। ওতে তো সৌমিত্রদা-অনুপকুমার অভিনয় করেছেন। কিন্তু লোকে নেয়নি। পেশাদারি থিয়েটারের দর্শক আমাদের দিকে আসছে। ওরা ভাল বিষয়বস্তু ভাল অভিনয়ের টানে এখন আমাদের থিয়েটার দেখতে চাইছে।

— আপনারা যে 'নাট্য সংহতি'-এর ব্যাপারে পরপর অনেক নাট্যোৎসব করেছেন, সেমিনার করেছেন — সেগুলো কি কোনও প্রভাব ফেলেনি?

— ফেলেছে বৈকি। জান তো 'নাট্য সংহতি' আসলে করা হয়েছিল দুই নাট্যশিল্পী, নেপথ্য কর্মীদের অর্থসাহায্য দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য পরপর যে নাট্যোৎসব করা হয়েছে — তাতে করে দর্শকসমাজে একটা প্রভাব পড়েছে নিশ্চয়। ভাল থিয়েটার দেখার প্রবণতা বেড়েছে। এছাড়া আমি পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির ভূমিকার কথা বলব। নাট্য আকাদেমি নিজে নাটক প্রযোজনা করেছে — নাট্যশিল্পী, নাট্যকর্মীদের নানারকম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। কলকাতায় এবং জেলায় জেলায় প্রশিক্ষণ শিবির করেছে। আমি নিজে আকাদেমির নানা পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত থেকেছি — বিভিন্ন শিবিরে প্রশিক্ষণ দিতে গিয়েছি — এই তো তোমরা যারা তরুণরা নাটক লেখ, লিখতে চাইছ তোমাদের নিয়ে '৯৩-য়ে বোধহয় সাগরদ্বীপে গিয়েছিলাম —

— ৯৩-এর ডিসেম্বরে। আপনি ছাড়া, মনোজদা, অরুণদা, চন্দনদা, রবীনদা, বিষ্ণুদা আর বাংলাদেশের মামুনুরদা।

— নাট্য আকাদেমি যেভাবে তরুণ নাট্যশিল্পীদের উৎসাহ দেবার, গড়ে তোলার চেষ্টা করছে — সামগ্রিকভাবে নাট্য পরিবেশের ওপর এর একটা প্রভাব পড়ছে। আমি তো প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোয় গিয়ে দেখেছি তরুণরা প্রশিক্ষণ নিতে এসেছে কীরকম উৎসাহ আগ্রহ নিয়ে! কেউ অভিনয় শিখতে চাইছে, কেউ পরিচালনা শিখতে চাইছে, কেউ কেউ আলো, মঞ্চ, সঙ্গীত প্রয়োগ। প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর এরা নতুন উদ্যমে কাজ করছে — এই সবের ফলে তো আরো ভাল নাটক প্রযোজনা হবে, আরো দর্শক হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আর নাট্য আকাদেমি মিলে যে 'চিরকুমার সভা' প্রযোজনা করেছে — তার তো ভাল শো হচ্ছে। ভাল নাটক দেখার প্রবণতা বাড়ছে। আমি তো বেশ উৎসাহ পেয়েছি।

— নাট্য আকাদেমি নতুন নাটক প্রযোজনা করবে কি?

— হ্যাঁ। বাংলা থিয়েটারের দুশো বছর পূর্তি উপলক্ষে দুটো নাটক প্রযোজনা করবে ঠিক হয়েছে। মনোজ পরিচালনা করবে ওরই লেখা 'দেবী সর্পমস্তা' আর সৌমিত্রদা একটা করবেন — সেটা এখনো ফাইনাল হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। এছাড়া পাঁচজন অনূর্ধ্ব চল্লিশ তরুণ পরিচালককে আকাদেমি নাটক পরিচালনার জন্য গ্রান্ট দিচ্ছে। এসবের ফলে সামনের বছর আমাদের থিয়েটার বেশ কয়েকটা জোরাল নাটকের মঞ্চায়ন দেখতে পাবে আশা করতে পার! মনোজ-সৌমিত্রদার মতো পরিচালকরা তো থাকছেনই, সঙ্গে তরুণ পরিচালকরা!

— কিছুদিন আগে 'সানন্দা'-তে একজন গ্রুপ থিয়েটার বিনোদনমূলক নাটকের স্রোতে গা ভাসিয়েছে, আদর্শচ্যুত হয়ে পড়েছে বলে এক ফিচার লিখেছেন — আপনার চোখে পড়েছে কি?

— একটা কুৎসাপূর্ণ লেখা। বাণিজ্যিক কাগজকে এরকম ফিচার ছাপাতে হয় — আর গ্রুপ থিয়েটারকে মাঝেমধ্যে গালিগালাজ তো করতেই হয়। লেখাটা কীরকম কুৎসাপূর্ণ বোঝ — নাটকের বা পরিচালকদের নাম না করে চারটে সার্থক নাটকের কাহিনীর আভাষ দিয়ে আমাদের চারজনকে খাটো করা হয়েছে। মনোজ, মেঘনাদ, রমাপ্রসাদ আর আমাকে। নাটকগুলোকে তাচ্ছিল্য করেছে। নাটক চারটে হল একা এবং একা, ত্রাতা, বাসভূমি আর —

— আর গল্প হেকিমসাহেব।

— অথচ আমাদের চারটে নাটকই দর্শকরা নিয়েছে — রেগুলার শো হচ্ছে — দর্শক হচ্ছে — এমনকি সানন্দাতেই এই ফিচার ছাপার আগের নানা সংখ্যায় চারটে নাটকের সমালোচনায় প্রশংসা করা হয়েছিল! আমার সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে অভিনেত্রী দল ছেড়ে যাওয়ার দুঃখে আমি (পরিচালকের চরিত্র) ভেঙে পড়ে শয্যা নিলাম, শেষে শোকে দেহত্যাগ করলাম! কী অদ্ভুত নাটক দেখার চোখ! বিচার শক্তি! নাটকটা কি আমি ওই দেখাবার জন্য করেছি নাকি? হাস্যকর। হ্যাঁ, আমরা সবাই ওই লেখাটা দেখেছি আর উপেক্ষা করেছি! পাত্তা দেওয়া উচিত নয়।

—'বেলা অবেলার গল্প' দিয়ে শুরু করেছিলাম। শেষে ওখান থেকেই একটা কথা জানতে চাইব কারণ এই সময়ে সরাসরি রাজনীতির ওপর দাঁড়ানো এই নাটকটা অভিনীত হচ্ছে।

—কিছুদিনের মধ্যেই বেলা অবেলার দশ বছর পূর্তি উৎসব হতে চলেছে।

—নাটকটার শেষ দৃশ্যে গভীর রাতে মা ও ছেলের কথার মধ্যে এমন কিছু আছে যা আজকের দিনের কমিউনিস্ট কর্মীদের ভাবাতে পারে। সংশয়ী ছেলে মাকে জিজ্ঞেস করছে, 'একবার তিন মাস, একবার ন' মাস গভ্‌মেন্টে ছিল তোমার পার্টি। বাস্, এখন আর কি, খালি ভোট আর গভ্‌মেন্ট। নকশালবাড়ির কৃষিবিপ্লব কলকাতার ফুটপাথে এসে মুখ থুবড়ে পড়ল। আর তোমাদের বিপ্লব যাবে রাইটার্স বিল্ডিং অবধি।' এখন আর তিন মাস, ন' মাস নয়, ১৯ বছর ধরে কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী চিন্তা-চেতনা রাইটার্স বিল্ডিঙেই ডেরা গেড়ে বসেছে। বর্তমানে নাটকটার অভিনয় তাই নতুন মাত্রা পেয়ে যাচ্ছে নাকি?

—তুমি তা ভাবলে ভাবতে পার বই কি। এখন তো আবার কমিউনিস্ট পার্টিরা ভোটের মাধ্যমে দিল্লি দখলের দিকে এগিয়ে গিয়েছে।

—রুণুর (ছেলের) সেদিন মনে হয়েছিল "বিপ্লব', 'জনগণের বন্ধু', 'সংগ্রাম' এসব বানানো কথা, ধার করা বুলি।' এইসব সংলাপ অক্ষত রেখেই আপনি নাটকটা করছেন দেখলাম—

—হ্যাঁ, তাই তো করছি। আমরা কিছুই বদলাইনি। আমার কাছে খবর আছে নানা ধরনের কমিউনিস্ট কর্মীরা নাটকটা দেখছেন। কেউ কেউ উত্তেজিত হচ্ছেন না যে তা নয়, কিন্তু আমরা 'বেলা অবেলার গল্প' ওই সংশয়ী সংলাপগুলো নিয়ে আজও অভিনয় করছি। আবার মা যে ছেলেকে বোঝাবার চেষ্টা করছে—কমিউনিস্ট আদর্শের কথা বলছে—ভেঙে না পড়তে, হতাশায় আত্মসমর্পণ করতে মানা করছে—জীবনের নতুন অর্থ অনুসন্ধান করতে বলছে—সংগ্রামের নতুন জমি খুঁজতে বলছে—আমরা তো মায়ের সংলাপের দিকগুলোও রেখেছি। মায়ের চরিত্রের দৃঢ়তা, স্বপ্ন-আশা তুমি তো অস্বীকার করতে পার না।

## উৎপল ঝা-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

**প্রশ্ন**। আশির দশকে ভাল থিয়েটারের দর্শকসংখ্যা কমে গিয়েছিল—দূরদর্শনের আবির্ভাব এর একটা প্রধান কারণ বলে অনেকে মনে করেছিলেন। কিন্তু নব্বইয়ের দশকে পৌঁছে দেখা যাচ্ছে যে নাটক দেখতে দর্শক ভিড় জমাচ্ছেন অ্যাকাডেমি, রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চ, গিরিশ মঞ্চে—বিভিন্ন গ্রুপ এককভাবে বা যৌথ উদ্যোগে সারা বছরের নানা সময়ে নাট্য উৎসব করছেন—কয়েকটি নাট্য প্রযোজনায় তো অভাবনীয় দর্শক সমাগম ঘটেছে—যদিও ইতিমধ্যে টেলিভিশন সমাজে এক সর্বগ্রাসী প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে কিন্তু টিভি আর নাটকের দর্শকের মঞ্চে আসা ঠেকাতে পারছে না—নাটকের এই সাফল্যের এবং দর্শকবৃদ্ধির কারণগুলো কী বলে আপনি মনে করেন?

**উ:** মনে হয় অনেকগুলো কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে—

(ক) পশ্চিমবঙ্গে উচ্চবিত্ত আর নিম্নবিত্তের মধ্যবর্তী স্তরে বেশ কিছু মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, আমাদের পরিচিত বা জ্ঞাত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের থেকে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যে যারা স্বতন্ত্র। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শিক্ষার সাথে একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ দেখা যায়। কিন্তু যে নতুন শ্রেণীর মানুষের কথা বলা হচ্ছে তারা শিক্ষার সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা দাবি করেন না, বিত্তের দিক থেকেই শুধু তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের কাছাকাছি। গ্রুপ থিয়েটারের প্রযোজনার সঙ্গে এই শ্রেণীর মানুষের ততটা যোগাযোগ ছিল না, তারা মূলত পেশাদারি মঞ্চ বা যাত্রায় ভিড় করতেন। এখন তারা গ্রুপ থিয়েটারের কিছু কিছু প্রযোজনায় নিজেদের বিনোদনের উপকরণ খুঁজে পাচ্ছেন।

(খ) গ্রুপ থিয়েটারের প্রযোজনায় একসময় আদর্শগত দায় ও দর্শকের বুদ্ধিবৃত্তির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের প্রয়াস ছিল, ক্ষেত্রবিশেষে তা বেশ জটিল হয়েও উঠত—যা থেকে সকলে রস আহরণ করে উঠতে পারত না। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আনুকূল্যই তাকে সেই পথে স্থির রেখেছিল। সারা পৃথিবীর আর্থ-সামাজিক ও ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, গ্রুপ থিয়েটারের দর্শকদের মধ্যেও তা সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলেছে। কিছু কিছু দর্শকের কাছে আদর্শগত দায়নির্ভর নাটক একঘেঁয়েমি বলে বোধ হচ্ছিল। ফলে বেশ কিছু গ্রুপ থিয়েটার তার এতদিনের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে নতুন পথে চলার প্রয়াস নিয়েছে—যা এই মধ্যবর্তী স্তরের মানুষের আনুকূল্য পেয়েছে।

(গ) পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বাতাবরণ সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে অনেকটাই উদ্বেগহীন ও কিছুটা আয়েসি করে তুলেছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক যে অবস্থার মধ্যে প্রতিবাদী নাটকের উন্মেষ ও বিস্তার সেই বাতাবরণ পরিবর্তিত হওয়ায় নাটকেও তার প্রভাব প্রবল হয়ে উঠছে এবং গ্রুপ থিয়েটারের অঙ্গনে পারিবারিক সমস্যানির্ভর নাটকের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনেক সময় সেই পারিবারিক সমস্যাকে সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেহাতই একটি পরিবারের সমস্যার মতো সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ করে রাখছে। কিন্তু এইসব নাটক অনেক সময় হৃদয়াবেগের প্রাবল্য দিয়ে অনেক অনেক দর্শকের চিত্তকে মোহিত করছে। এবং দর্শক এক্ষেত্রে নাটককে শুধুমাত্র বিনোদনের উপকরণ হিসেবেই বিচার করতে শুরু করেছেন।



(ঘ) কিছু কিছু প্রযোজনায় অভিনয়, আলো, মিউজিক, সেট প্রভৃতির কাজে পেশাদারি নিপুণতা ফুটে উঠছে। এই নির্মিতির চমকও বেশ কিছু দর্শককে গ্রুপ থিয়েটারের প্রযোজনায় আকৃষ্ট করছে। আগামী দিনের প্রযোজনায় প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তৃতিলাভ করবে অনুমান করা যায়।

(ঙ) দূরদর্শনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দূরদর্শনের অভিনয়ে অংশ নেওয়া অভিনেতা-অভিনেত্রীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না। তবে দূরদর্শনে প্রদর্শিত মঞ্চসফল কোন নাটক, পরবর্তীকালে দর্শকের আরও বেশি আনুকূল্য পেয়েছে কিনা তা নিরীক্ষার বিষয়।

**প্রশ্ন**। সত্তর দশকের মঞ্চসফল নাটকগুলির থেকে সাম্প্রতিক কালের মঞ্চসফল নাটকগুলির চরিত্রগত / বিষয়বস্তুগত কোন পরিবর্তন কি আপনি লক্ষ করেছেন?

**উ:** সত্তর দশকের সময়কালের পর দু-দুটো দশক অতিক্রান্ত হয়েছে। এই দু দশকে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক বেশ কিছু পট-পরিবর্তন ঘটেছে আবার সেই পরিবর্তনেরও পরিবর্তন ঘটছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ মাধ্যমের বিস্ময়কর আবিষ্কার পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে, মানুষের জীবনেও ঘটেছে বিশাল পরিবর্তন।

সত্তর দশকে পশ্চিমবঙ্গের উত্তাল রাজনৈতিক অবস্থায় গ্রুপ থিয়েটার সামাজিক দায়বোধ থেকে একটা আদর্শকে সামনে রেখে নাটকে সোচ্চার হতে চেয়েছেন, মানুষকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন এবং সামাজিক জীবনের নানা বাধাকে জয় করার চেষ্টা করেছেন। ষাট-সত্তর-এর দশকের তিন পয়সার পালা, ভালমানুষ, চাকভাঙ্গা মধু, পাপপুণ্য, শের আফগান, ফুটবল, রাজরক্ত, মারীচ সংবাদ, দানসাগর, প্রভৃতি প্রযোজনা বাঙালি দর্শকের সঙ্গে বহির্বিশ্বের নাটকের ক্ষেত্রকে মেলাতে চেষ্টা করেছে। ব্রেখটের নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তরের মাধ্যমে বাংলা নাটকের ক্ষেত্র নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে ধাবিত হয়েছে।

আজ এই শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে অনূদিত নাটকের জোয়ার অনেকটাই অস্তমিত হয়ে এসেছে, মৌলিক বাংলা নাটকের দিকে গ্রুপ থিয়েটার ফিরে তাকানোর চেষ্টা করছে।

মধ্যবিত্ত মানুষের মনে দেশভাগ ও গ্রামজীবনের স্মৃতি ফিকে হয়ে এসেছে। শহর-অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন শিথিল হতে হতে পারিবারিক এবং সবশেষে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্র ক্রমেই গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। আধুনিক সমাজজীবনের নানা সমস্যা বিশেষত বাবা-মার সঙ্গে সন্তানের, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ এবং পুত্র-কন্যার মধ্যে তা সঞ্চারিত হওয়ার সমস্যা, বয়স্ক মানুষদের মধ্যে নিঃসঙ্গতা, পারিবারিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে সৃষ্ট নানা অভিঘাত ও লক্ষণ আজকের গ্রুপ থিয়েটারের নাটকের শরীরে ফুটে উঠতে দেখা যাচ্ছে।

**প্রশ্ন**। রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ নাটকের বদলে দর্শকরা কি এখন বেশি বেশি করে বিনোদনমূলক থিয়েটার দেখতে চাইছেন বলে আপনার মনে হচ্ছে না? সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরুচিরই পরিবর্তন হয়েছে নাকি নাট্য পরিচালকরা সচেতনভাবেই দর্শকরুচিকে বদলে দিচ্ছেন?

**উ:** দর্শকের চরিত্রগত যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটেছে তাতে গ্রামাঞ্চলের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ গ্রামবাংলায় পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে ভূমিসংস্কার, বর্গাদার ও ভাগচাষির অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা, সামাজিক কল্যাণমূলক নানা কর্মসূচি রূপায়ণ, সাক্ষরতা অভিযানের মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি কর্মসূচি গৃহীত ও কার্যকরী করার প্রয়াস চলেছে। বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলি শহরতলি ও শহরতলিগুলি শহরে পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে।

ষাট-সত্তরের দশকে গ্রুপ থিয়েটারের নাটকের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মূলত নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তাঁরা সামাজিক বঞ্চনার অবসান ও শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তনের ক্ষেত্রে নাটককে হাতিয়ার বলে মনে করতেন। এবং গ্রুপ থিয়েটারগুলিও দর্শকের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সবিশেষ গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু বিগত দু দশকে এই ধরনের নাটকের প্রযোজনায় কিছু কিছু নাট্যদল বোধ করি হাঁপিয়ে উঠছিলেন, কিংবা দর্শকের মধ্যেই চেহারার যে পরিবর্তন ঘটছিল, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলির শোষণের চেহারার যে জটিলতা তা হয়তো সার্থকভাবে নাটকে উঠে আসেনি, ফলত নাট্যদলগুলিকে নতুন ক্ষেত্র অন্বেষণে অগ্রসর হতে হয়েছে এবং ইতিমধ্যে যে নতুন শ্রেণীর দর্শক উঠে এসেছে তাদের চাহিদাও নাটকের ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে।

ব্যতিক্রম নিশ্চয় আছে। বেশ কিছু নাট্যসংস্থা এখনও একান্ত পারিবারিক সমস্যা যা সমাজের বিস্তৃত অংশের সাথে মিলিত

হতে পারে না, বা একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা অপেক্ষা সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার দায়পালনকেই অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে এখনও নাটক করে চলেছেন এবং নাটককে নেহাতই বিনোদনের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করতে অনিচ্ছুক। আবার কিছু কিছু নাটাদল শুধুই বক্তব্য বা আদর্শের বার্তা দিয়ে দর্শকের কাছে পৌঁছান্যোর চেষ্টা করছেন— কিন্তু এক্ষেত্রে যদি নাটাদলের নিষ্ঠা না থাকে, শিল্পবোধ না থাকে, মঞ্চ প্রক্রিয়াকে আয়ত্ত করার ক্ষমতা না থাকে, তবে সেই নাটককে সর্বশ্রেণীর দর্শকেরা প্রত্যাখ্যান করেন।

**প্রশ্ন।** ষাট-সত্তর দশকে বামপন্থী রাজনীতি একদা যেমন গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনকে উদ্দীপনা জুগিয়েছিল— পরিচালক, নাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, নাটকর্মী এবং দর্শকদের প্রভাবিত করেছিল— আজ কি সেইরকম প্রভাব বা উদ্দীপনা জোগাতে পারে বা পারছে?

**উ:** তখনকার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কথা স্মরণ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ষাট ও সত্তর দশকে পশ্চিমবঙ্গে এক অস্থিরতা ও বিপন্নতা যেন গ্রাস করেছিল। নকশালবাড়ির আন্দোলন, ছাত্র-নারী-শ্রমিক ও সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ভাঙন, পুলিশ ও প্রশাসনের কিছু অংশের মত্ত আচরণ, বেকারি ও মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি ঘটনা রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বাংলা থিয়েটারের মঞ্চেও তার অভিঘাত অনুভূত হয়েছে। চিরকালীন প্রতিবাদী ভূমিকার প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে থিয়েটারের পক্ষে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া কোনমতেই সম্ভব ছিল না। গণনাট্য আন্দোলনের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে বামপন্থী আদর্শের প্রতি আনুগত্য দিয়ে গ্রুপ থিয়েটারের যে পথচলা শুরু হয়েছিল তা এই রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার উত্তাল অবস্থায় এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল এবং নাটাকর্মীরা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিজেদের দায় ও দায়িত্ব উপলব্ধি করেছিলেন।

কিন্তু বর্তমানে আর্থ-সামাজিক অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটছে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে স্থিতিশীলতা ও স্বস্তিদায়ক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে তাতে নাটাকর্মীরা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে এমন কোন দায় বর্তমানে খুঁজে পাচ্ছেন বলে মনে হয় না। একটা আত্মসন্তুষ্টি যেমন রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনুভূত হচ্ছে— একই অবস্থা বাংলা থিয়েটারের ক্ষেত্রেকেও অনেকটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে, এমন অভিযোগও শোনা যায়।

একথা ঠিক, দেশ ও সমাজের সঙ্কটের মুহূর্তে মানুষের অন্তর্নিহিত সমস্ত গুণাবলী ও আদর্শবোধের যথাযথ স্ফুরণ হয়ে থাকে। বর্তমান রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা হয়তো নাটকের কাছে সেই দায়বদ্ধতা ঠিকমতো পৌঁছে দিতে পারছে না বা নাটাদলগুলিকে উৎসাহ বা প্রেরণা জোগাতে পারছে না। আবার যারা শুধুমাত্র আদর্শবোধ বা দায়বদ্ধতা নিয়ে এগোতে চাইছেন, তাদের অনেকেরই নিষ্ঠা ও যোগ্যতার অভাব রয়েছে। সৃষ্টিশীল শিল্পীর সংখ্যা চিরকালেই দুর্লভ। কিন্তু থিয়েটার মাধ্যমটিকে জানার অনুসন্ধিৎসা, মঞ্চ প্রক্রিয়াকে আয়ত্ত করা ও মঞ্চে ফুটিয়ে তোলার জন্য যে আন্তরিকতা, ভালবাসা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন, তাতো অন্য কোন কিছু দিয়েই পূরণ করা সম্ভব নয়। শিল্পবোধ ও আদর্শের সুচারু মেলবন্ধনই এর উত্তরণ ঘটাতে পারে।

আবার একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সমসাময়িক কাল সবসময় যথার্থ বিচার পায় না। একটু দূর থেকে না দেখলে যেমন সমগ্র অবয়ব পরিস্ফুট হয় না তেমনি সময়ের সামগ্রিক দাবিও অনেক সময় বৃহত্তর দাবিকে প্রচ্ছন্ন করে তোলে— ফলে যথার্থ ও অমলিন, কিন্তু খোঁজ নিলে দেখা যাবে, সেই সময়কালে বর্তমানে প্রশংসালাভে ধন্য কোন প্রযাস, যথেষ্ট নিন্দিত বলে পরিগণিত হয়েছে, সমালোচিত হয়েছে। আবার সেই সময়কালে যথার্থ মর্যাদা না পেয়েও অনেক শিল্পসৃষ্টি কালোত্তীর্ণ হয়েছে। সুতরাং আজকের থিয়েটারের সবটাই অকিঞ্চিৎকর, অর্থহীন এমন অভিযোগ নেহাতই পক্ষপাতদোষে দুষ্ট।

**প্রশ্ন।** দূরদর্শনের দাপট তথা টেলিভিশনের নানা চ্যানেলের প্রসার মঞ্চে ভাল নাটকের চর্চায় কোনও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে কি? মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নিয়মিত টেলিভিশন সিরিয়ালে অভিনয় করছেন— নাটকের দর্শকবৃদ্ধিতে তার কোন ভূমিকা থাকতে পারে বলে কি আপনি মনে করেন?

**উ:** একেবারে শুরুর লগ্নে দূরদর্শন জনমানসে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দূরদর্শনের কোন উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান দেখানো হলে আ্যাকাডেমির দর্শক-সমাগমে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। বিশেষভাবে মনে পড়ে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'সদগতি' টেলিফিল্ম যেদিন প্রথম দেখানো হয়, সেদিন অনেককেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘর অভিমুখে ছুটতে দেখা গেছে। তবে দূরদর্শনের সেই প্রভাব কলকাতা ইডিমধ্যেই কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এখনও এর প্রভাব রয়েছে। তাই শনি বা রবিবার জেলা শহর বা শহরতলিতে নাট্যানুষ্ঠান নাটাদলগুলিকে চিন্তান্বিত করে।

তবে মানুষ ক্রমেই এই প্রভাব কাটিয়ে উঠবেন। দূরদর্শনের অনুষ্ঠানের সময়সীমা যত বাড়বে, যত নতুন নতুন চ্যানেল খুলবে, ততই ঐ অনুষ্ঠানের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে আসবে। 'সুইচ অন' করলেই যে অনুষ্ঠান দেখা যায় তা যত ভাল অনুষ্ঠানই হোক, দর্শক ক্রমেই তাতে ক্লান্তি ও একঘেয়েমি



বোধ করবেন। কিন্তু মঞ্চে জীবন্ত মানুষের উপস্থিতি, অনুভূতি ও তার প্রতিক্রিয়ার অভিঘাত সবসময়ই বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয় হয়ে থাকবে।

দূরদর্শনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুবাদে অনেক বেশি বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানোর, প্রচারের আলোয় ঝলকিত হওয়ার একটা সুযোগ রয়েছে— অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তার টান অনুভব করে থাকেন, তেমনই গ্রামাঞ্চলের এমনকি শহরের মানুষও দূরদর্শন বা চলচ্চিত্রে অংশগ্রহণকারী শিল্পীর প্রতি একটা অদম্য আকর্ষণ বোধ করেন। তবে সে আকর্ষণ মানুষটিকে কাছ থেকে দেখার কৌতূহলের মধ্যেই মনে হয় সীমিত। খুব নামী কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে মঞ্চে দেখার জন্য যদিও বা কিছু কিছু দর্শক আগ্রহী হন কিন্তু নাটকটির নিজস্ব আকর্ষণ যদি না থাকে, যদি তা শিল্পোত্তীর্ণ না হয়, শুধুমাত্র দূরদর্শন বা চলচ্চিত্র অভিনেতার গ্ল্যামার দিয়ে গ্রুপ থিয়েটারের দর্শককে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। এক সময় এই গ্ল্যামার-এর আকর্ষণে যতটা জনসমাগম হত আজ সেই আকর্ষণ কাজ করলে পেশাদারি মঞ্চের অবস্থা অনেকটা ভাল হত। স্বভাবতই একথা বলা যায় যে, দূরদর্শনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা মঞ্চের অভিনয়ে অংশ নিলে প্রাথমিক একটা আগ্রহ সৃষ্টি করলেও নাটকটি না দাঁড়ালে শুধু শিল্পীর আকর্ষণে তা জনপ্রিয় হয়ে ওঠার কোন সম্ভাবনা নেই।

**প্রশ্ন।** সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত, পরিচালিত এবং অভিনীত 'স্বপ্নসন্ধানী'র 'টিকটিকি' নাটকের বিপুল জনপ্রিয়তা গ্রুপ থিয়েটারের চিন্তাভাবনায় কোনও প্রভাব ফেলবে কি?

**উ:** 'স্বপ্নসন্ধানী'র 'টিকটিকি'কে কোন পেশাদারি মঞ্চের নাটক বলে গণ্য করা হচ্ছে না। সৌমিত্রবাবু দীর্ঘদিন পেশাদারি মঞ্চে অভিনেতা হিসেবে যেমন অংশ নিয়েছেন, তেমনই তাঁর নিজের প্রযোজনাগুলিতে যেমন নামজীবন, রাজকুমার, নীলকণ্ঠ কিংবা দর্পণে শরৎশশীর মতো নাটকে তিনি পেশাদারি ও গ্রুপ থিয়েটারের মাঝামাঝি একটা পথ খোঁজার চেষ্টা করেছেন এবং তা সাফল্য অর্জন করেছে— কিন্তু এইসব নাটকের ক্ষেত্রে প্রযোজক যে মূলধন জুগিয়েছে তা ফেরৎ আনার কথাও পরিচালককে মাথায় রাখতে হয়েছে— কিন্তু 'স্বপ্নসন্ধানী'র 'টিকটিকি' নাটকের ক্ষেত্রে এমন কোন আবশ্যিক শর্ত সৌমিত্রবাবুর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি— তিনি অনেক স্বস্তিতে এবং গ্রুপ থিয়েটারের প্রযোজনার ধারায় তাঁর এই নাটকটি করার সুযোগ পেয়েছেন। স্বভাবতই 'টিকটিকি'কে গ্রুপ থিয়েটারের অন্যান্য সফল প্রযোজনার থেকে আলাদা করে বিচার করার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

এই সাফল্য পেশাদারি মঞ্চে যতই অভিঘাত সৃষ্টি করুক না কেন, পেশাদারি মঞ্চ থেকে আরও অনেককেই এই মুহূর্তেই বেরিয়ে এসে এই প্রচেষ্টায় রত হবেন বা সফল হবেন, এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই। গ্রুপ থিয়েটারের ক্ষেত্রেও এটা একইভাবে প্রযোজ্য।

তবু একথা নিশ্চয় বলা যায়, 'টিকটিকি'র সাফল্য গ্রুপ থিয়েটারের অঙ্গনে এমনকি পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে একটা নতুন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করেছে— এই অভিজ্ঞতা আগামী দিনে গ্রুপ থিয়েটারকে কোন্ দিকে নিয়ে যায় তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

**প্রশ্ন।** বিশেষ কয়েকটি নাটকের সাফল্য, সেগুলি দেখতে দর্শকের ভিড় কি সামগ্রিকভাবে ভাল নাটকের দর্শকবৃদ্ধিতে সাহায্য করে/করেছে?

**উ:** নিশ্চয়। সীমিতসংখ্যক বুদ্ধিজীবী মানুষের মধ্যেই থিয়েটার আবদ্ধ থাকুক এমনটা কেউই চান না। সবাই চান নিজের নিজের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করে আরও বেশি বেশি মানুষের কাছে তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ শিল্পচেতনা, তাঁদের আদর্শ ও সমাজমনস্কতার কথা পৌঁছে দিতে বা তার বিনিময় করতে। পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য ছোট ছোট নাটাদল গভীর নিষ্ঠায় আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যেও মানুষের কাছে পৌঁছানোর তাগিদে প্রবল বিক্রমে লড়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সব প্রয়াসই ব্যর্থ হয়ে যায় যখন তা দর্শকের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। আবার দর্শক যদি তাকে উৎসাহিত করে, তবে আর্থিক সাফল্য না মিললেও নাটকর্মীরা কয়েক ক্রোশ পথ হেঁটে মেরে দিতে রাজি। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে, দর্শকের আনুকূল্য পেলে আর্থিক সাফল্য না পাওয়ার কথা ওঠে কী ভাবে? কিন্তু গ্রুপ থিয়েটারের কিছু কিছু প্রযোজনার প্রতিদিনের ব্যয় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের টিকিটঘরের আনুকূল্য দিয়েও মেটানো যাচ্ছে না— এমন অভিমতও শোনা যাচ্ছে— হলভাড়া বৃদ্ধি, বিজ্ঞাপনের অস্বাভাবিক খরচ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়বৃদ্ধি এর কারণ বলে অনেকে মনে করছেন।

যাইহোক, দর্শক পাশে এসে দাঁড়ালে গ্রুপ থিয়েটারের কর্মীরা এখনো চড়াই-উৎরাইকে পাশের মধ্যে আনতে রাজি নন। কারণ বেশির ভাগ নাটকর্মী আদর্শের খাতিরে, ভাল কিছু করার বাসনা থেকে, শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকার বাসনা নিয়ে, নিজের প্রতিভার বিকাশের তাড়নায় এবং দর্শকের ভালবাসা ও আনুকূল্যের স্বপ্ন নিয়ে নাটক করতে এসেছেন, বাবসায়িক সফলতার কথা মাথায় রেখে কেউ আসেননি। টিকে থাকার জন্য সাফল্যের প্রয়োজন বলে মনে করলেও গ্রুপ থিয়েটারকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার মানসিকতা এখনও নাটকর্মীদের মধ্যে দেখা যায় না।

আজ যদি কয়েকটি নাটকের বিশেষ সফলতা অনেক অনেক মানুষকে গ্রুপ থিয়েটারের নাটপ্রয়াসের প্রতি আগ্রহী করে তোলে স্বাভাবিকভাবেই সামগ্রিক নাটকের ক্ষেত্রেই তাতে প্রভাবিত হবে, নাটকর্মীরাও উৎসাহিত বোধ করবেন। অনেকে অবশ্য পথ হারানোর আশঙ্কার কথাও তুলবেন।

জেলা বা মহকুমা স্তরে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হয়েছে—পৌরসভা, জেলা পরিষদও প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করছেন—কলকাতার বা জেলার প্রতিষ্ঠিত নাট্যসংস্থার প্রযোজনার সাথে জেলার বা মহকুমার সাধারণ দর্শকের পরিচয়ের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে, সাধারণ দর্শক আগের চেয়ে অনেক বেশি নাটক দেখার সুযোগ পাচ্ছেন—নিশ্চয় তা দর্শক-রুচিবোধকে প্রভাবিত করবে। কোন নাটদল যদি সাধারণ দর্শকের রুচির অভিমুখী হতে গিয়ে নাটকর্মে কোন আপসরফা করেন এবং যদি তাতে একবার সাফল্যও পান, বারবার সে প্রয়াস সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সে ইতিহাসও নেই।

এমন এক অবস্থায় নাটকর্মীদের কাছে চিরকালীন প্রত্যাশার কথাই উঠে আসে। আজকের নাটকর্মীরা তাদের নাটকে কোন্ বার্তা দর্শককে শোনাবেন। শুধু বিনোদনের অক্ষিঞ্চিৎকরতায় দর্শক-আনুকূল্যের জন্য তারা সচেষ্ট থাকবেন নাকি সমাজব্যবস্থা পাল্টানোর, আগামী দিনের সমোজ্জ্বল ভবিষ্যতের কোন আশা বহন করার দায় তারা পালন করবেন। কেউ কেউ অবশ্য বলছেন সমাজব্যবস্থা পাল্টানোর দায় এককভাবে নাটকর্মীদের হতে পারে না। রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে শিক্ষক, সরকারি কর্মচারী, ডাক্তার, উকিল কেউই যদি কোন দায় বোধ না করেন, নাটকর্মীদেরও কোন দায় নেই।

তাহলে কি দর্শককে তুষ্ট করা, দর্শকের রুচির অভিমুখী হওয়াই নাটকর্মীদের একমাত্র দায়! একথাও বোধহয় স্বীকার করতে বাধবে। আবার শুধু আদর্শের তাগিদে, দায়বোধ থেকে নাটপ্রক্রিয়ার কোন কিছুই আয়ত্ত না করে, নিষ্ঠা ও অনুশীলন বা শিল্পবোধের অভাব গালভরা বড় বড় কথা দিয়ে মেটানো সম্ভব নয় এ-ও আজ পরীক্ষিত সত্য।

তবে চিরকালীন এই বিতর্কের মধ্যেই গ্রুপ থিয়েটারে যেমন টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে আবার নিজের পথ নিজেই সে তৈরি করে নিয়েছে। নাটক্রিয়া এমনই এক প্রবহমান ধারা, কোন সন্ধীর্ণতাই তাকে দীর্ঘদিন আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। দর্শকের সামগ্রিক রুচি যেমন তাকে প্রভাবিত করে, দর্শকের রুচিকেও সে শিল্পের অনিন্দ্যসুন্দর মাধুর্য বা অমোঘ-চেতনায় ভরে তোলে।

সমাজমনস্ক প্রতিটি মানুষই তাই আশাবাদী যে, সমাজের কোন প্রবল বিচ্যুতির মুহূর্তে দেশ ও সমাজের প্রয়োজনের মুহূর্তে নাটক ঠিক ঝলসে উঠবে, এই দায়িত্ব সে পূর্বাপর পালন করে এসেছে, আগামী দিনেও তার কোন ব্যত্যয় হবে না। □ **(সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন মেঘ মুখোপাধ্যায়)**

বিশেষ নিবন্ধ

# পাঠনির্ণয়

## সুকান্ত চৌধুরী

বিদ্যাভ্যাসের সব ক্ষেত্রেই মানুষের জ্ঞান ও বিচারশক্তি প্রত্যাহিত করে। পাঠচর্চা বা পাঠশাস্ত্র (textual criticism)-ই বোধহয় একমাত্র বিদ্যাক্ষেত্র যার ভিত্তি হচ্ছে মানুষের ভুলের প্রবণতা। সাবেক ধ্রুপদী মেজাজের পাঠচর্চার মৌলিক নীতিই হল এই যে, মানুষ ভুল না করে কোনও কিছু লিপিবদ্ধ করতে পারে না, ও বিশেষ করে টুকতে বা নকল করতে পারে না। কোনও রচনার প্রথম লিপায়ন থেকে শুরু করে ছাপার মাধ্যমে তা পাঠকের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত সচরাচর সেটা একাধিকবার টোকা হয় : কখনও হস্তলিপিতে, কখনও ছাপার অক্ষরে। (এই বিচারে মুদ্রাকরও এক ধরনের লিপিকার।) অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে 'ছাপা' বলতে বিভিন্ন ধরনের মুদ্রণপদ্ধতি ও অনুরূপ পদ্ধতি বোঝাতে পারে। টাইপরাইটার-কেও এই পর্যায়ে ফেলতে হয়। খুব আধুনিক যুগে কমপিউটার-চালিত মুদ্রণ, বা তার প্রাথমিক পর্যায়ে 'ওয়ার্ড-প্রসেসিং'-এর কথাও মনে রাখতে হবে।

এটা ঠিক, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় যান্ত্রিক অনুলেখনের মধ্যে একটা মৌলিক শ্রেণীবিভাগ করতে হয়। কতগুলি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রত্যেক নতুন পালায় বা সংস্করণে পাঠটি নতুন করে গঠিত বা লিপায়িত হচ্ছে—যেমন টাইপিং, বা সাবেক লেটারপ্রেস মুদ্রণ। এখানে প্রত্যেক অনুলেখনের সময়ে প্রতিটি অক্ষর ও চিহ্ন নতুন করে বসাতে হচ্ছে, অর্থাৎ নতুন ভুল ঢোকার সম্ভাবনা বা পুরনো ভুল সংশোধনের সম্ভাবনা থাকছে। অন্য কতগুলি পদ্ধতিতে নতুন মুদ্রণ বা সংস্করণ হচ্ছে আদি অক্ষরবিন্যাস রক্ষা করে—যেমন লাইনোটাইপে; অফসেটে বা এমন অন্য পদ্ধতিতে যা মূলত ফটোগ্রাফিক চিত্রণ আশ্রয় করে; অথবা এমন কমপিউটার মুদ্রণে যেখানে লেখকের তৈরি 'ফ্লপি ডিস্ক' থেকে সরাসরি ছাপার কাজটা সারা হচ্ছে। এ-সব ক্ষেত্রে আদিতে যে পাঠ লিপিবদ্ধ হয়েছে ('লিপি' শব্দটা খুব ব্যাপকভাবে নিচ্ছি) সেটা সচরাচর অপরিবর্তিত থাকার কথা। অর্থাৎ সাবেক বা ধ্রুপদী পাঠচর্চায় পাঠগঠন ও পাঠপ্রচার (transmission)-এর যা নির্ধারিত বিচার, তা যেন এখানে আর ঘটছে না।

এ-সব নতুন পদ্ধতিতেও কিন্তু পাঠ পরিবর্তন ঘটতে পারে। লাইনোটাইপের 'স্লাগ'গুলি ভেঙে গিয়ে, ফটোগ্রাফিক মুদ্রণ পদ্ধতিতে ফিল্মের ত্রুটিতে, কমপিউটার-সেটিং-এ সফটওয়ার-পরিবর্তনের সময়ে (যা প্রায়ই ঘটে, কারণ লেখক ও মুদ্রাকর এক সফটওয়ার ব্যবহার করেন না) বা ভাইরাসের অনুপ্রবেশে সংস্করণ থেকে সংস্করণে পাঠ বদলাতে পারে। ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন বা সংশোধনও করা হতে পারে। এ-সব কারণে, পাঠচর্চার সাবেক রীতিটা এখানেও অচল হয়ে পড়ছে না; তবে বলা বাহুল্য, তা প্রয়োগ করতে হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে ভিন্ন পরিস্থিতিতে।

অপরদিকে, কোনও সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক বিচারে না গিয়ে কেবল স্থূল বাহ্যিক, বাস্তব বা যান্ত্রিক বিচারেই দেখা যাচ্ছে, পাঠচর্চার সাবেক নীতি বা ভাবমণ্ডল মোটেই অমোঘ নয়; কোনও বিশেষ অবস্থায়, প্রকাশ ও প্রচারের বিশেষ ধারা ও পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। পাঠশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অবস্থান, সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপট বিচার করতে তাই আমাদের চারদিকে আরও তাকাতে হবে, আরও গভীরে প্রবেশ করতে হবে।

পাঠচর্চার যে সাবেক ধারার কথা বললাম, তাতে কতগুলি জিনিস গোড়াতেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। এক, পাঠ (text) মাত্রেই লিখিত রচনা। 'পাঠ' শব্দের মধ্যেই এটা সূচিত হচ্ছে, যেমন হচ্ছে 'লিপি' শব্দে। ইংরেজি text-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অবশ্য এমন ইঙ্গিত দেয় না। তার মূলে যে লাটিন শব্দ, তার অর্থ

বয়ন করা অর্থাৎ যে-কোনও ভাবে কথা বোনা, সাজানো বা রচনা করা। তবে কালক্রমে এখানেও লিপিবদ্ধ পঠিত রচনার অর্থ প্রধান হয়ে পড়েছে। মুখে মুখে যে রচনা ছড়িয়ে পড়ে, ধ্রুপদী পাঠশাস্ত্র তাকে সবসময়ে দেখেছে দুয়োরানি হিসাবে।

এটা নেহাৎ শব্দ বা ব্যুৎপত্তির কচকচি নয়; এর কিছু নিহিত ইঙ্গিত আছে। প্রথমত, এতে একটি বিশেষ ধরনের রচনার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ পাচ্ছে, তার পিছনে একটি বিশেষ মনোভাবও কাজ করছে। যে চর্চার আপাত ক্ষেত্র নৈর্ব্যক্তিক তথ্যভিত্তিক পাঠবিচার, তার নিহিত লক্ষ্য দেখা যাচ্ছে সাহিত্য ও সাহিত্য-সৃষ্টিকারী সমাজ ও ইতিহাসের একটি বিশেষ ব্যাখ্যার প্রচলন : যে ব্যাখ্যায় মৌখিকের চেয়ে লিপিবদ্ধ রচনা প্রাধান্য পাচ্ছে, অর্থাৎ (১) গোষ্ঠীগত সৃষ্টির চেয়ে ব্যক্তিগত সৃষ্টি ও (২) মোটের উপর সমাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীর সৃষ্টি, বা তাদের উপভোগের জন্য সৃষ্টি বড় করে দেখা হচ্ছে, সব রকম ভাষাভিত্তিক রচনার মধ্য থেকে 'সাহিত্য' নামক এক বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভাবন করা হচ্ছে। এ ধরনের স্থিতিশীল ধ্রুপদী মনোভাবের পিছনে কিছু ঐতিহাসিক কারণ আছে, তাতে পরে আসছি।

সাবেক পাঠচর্চার এই নিহিত মনোভাবের পিছনে একটা মস্ত ইঙ্গিত কাজ করছে — সেও এক অর্থে ধ্রুপদী রক্ষণশীলতা ও স্পষ্ট বিন্যস্ত মতাদর্শের নিদর্শন। সেটা এই যে, লেখক একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট পাঠ রচনা করে গিয়েছেন; সেই পাঠটি তারপর সরলরেখায় প্রেরিত হচ্ছে পাঠকের হাতে-ধরা বইয়ের পাতায়। রেখাটি বাস্তবে অস্পষ্ট হতে পারে, কিন্তু এর ভাবচিত্রে কোনও অস্পষ্টতা নেই; প্রেরণের প্রক্রিয়ায় বাস্তবে ভুলত্রুটি ঢুকতে বাধা, সেগুলি শোধরানো পণ্ডিতের কাজ, কিন্তু একবার শুধরে নিলে স্পষ্ট সরল পথে রচনার উৎসে, সৃষ্টির উৎসে পৌঁছানো যাবে।

এর সঙ্গে আছে আরও একটি ইঙ্গিত। লেখক লিখছেন, পাঠক পড়ছেন — দুই শরিকের এক্তিয়ারে এমন একটা স্পষ্ট ভাগ। পাঠশাস্ত্র নিয়ে ফিলিপ গ্যাস্কেলের একটা বিখ্যাত বইয়ের শিরোনামে এই ধারণাটা প্রকাশ পাচ্ছে : 'From Writer to Reader'। রচনাটি লেখকের কলম থেকে বেরোচ্ছে সুডৌল স্বয়ংসিদ্ধ হয়ে, পাঠক সেটি গ্রহণ করছেন মাত্র। গ্রহণের পক্ষে প্রেরণঘটিত যে বাধা, সেগুলি দূর করাই পাঠশাস্ত্রে পণ্ডিতের কাজ। তিনি যেন এক ধরনের ডাকপিওন — একটু বিশেষ ধরনের শিক্ষিত পিওন, যিনি রিটার্নড লেটার অফিসের গোলমেলে ঠিকানার চিঠিগুলি গন্তব্যে পাঠাতে পারেন। পাঠকের ভূমিকা একেবারে নিষ্ক্রিয়, তিনি লেফাফাটি হাতে নিচ্ছেন কেবল।

এখন যদি আমরা নালিশ করি, হরকরা মশাই লেফাফার অস্পষ্ট অক্ষরগুলির উপর ইচ্ছামতো কলম চালিয়ে যা-খুশি ঠিকানা লিখে দিচ্ছেন? বা লেফাফা খুলে চিঠির পাঠও একইভাবে বদলাচ্ছেন, আর সেটা তাঁর অভীষ্ট পাঠকের মন জুগিয়ে করছেন বলে পাঠকও আপত্তি করছেন না বা জালিয়াতিটা ধরতেই পারছেন না? এমনও হয়তো অসম্ভব নয় যে পাঠক নিজেই কলম তুলে চিঠিখানা আরও মনের মতো করে নিচ্ছেন। এমন অবস্থায় কে লেখক কে বাহক কে পাঠক তা ঠিক করা দুষ্কর। একই কাগজে বারবার কলম চালিয়ে প্রত্যেকে নিজের পছন্দের চিঠি লিখছেন অর্থাৎ কার্যত নিজেকে চিঠি লিখছেন।

নব্য সাহিত্যতত্ত্বের দৌলতে রচনাপাঠ ও রচনাপ্রেরণের প্রক্রিয়াটা এইভাবে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। আমার উদ্দেশ্য হল পাঠনির্ণয় ও সম্পাদনার কাজটাও সক্রিয় পাঠ বা রচনাগ্রহণ (reception)-এর একটা বিশেষ রূপ হিসাবে তুলে ধরা।

এর ইঙ্গিতগুলোও একটু ভাবা যাক। দেখা যাক, ধ্রুপদী পাঠশাস্ত্রের যে নিহিত মনোভাব একটু আগে বর্ণনা করেছি, তার সঙ্গে এর তফাত কোথায়।

মৌলিক তফাতটা তো বোঝাই যাচ্ছে। এই নতুন দৃষ্টিতে রচনার পাঠ শাশ্বত বা অমোঘ নয়, বরং অনিশ্চিত, বিকল্পসঙ্কুল, অস্থির। একটা খুব সরল যুক্তিতেই কিন্তু এটা ধরা পড়ছে। পাঠশাস্ত্রের মস্ত ঘোষিত লক্ষ্য হল সঠিক পাঠ প্রতিষ্ঠিত করা, settling the text। কিন্তু সম্পাদকের প্রথম দায়িত্ব তো হল — একেবারে আক্ষরিক অর্থেই — চোখের সামনে যে পাঠ দেখছেন তা মেনে না নেওয়া, সেটায় ত্রুটি বা ছিদ্র খুঁজে নাড়া দিয়ে নতুন করে সাজানো, unsettling the text।

এটা বলতে গিয়ে অবশ্য আমি একটা কারচুপি করলাম : দুটি বাক্যে text শব্দটা দুটি ভিন্ন অর্থে নিলাম। প্রথম বাক্যে text হল পণ্ডিতের মানসকল্পের আদর্শ পাঠ, দ্বিতীয় বাক্যে বাস্তবলব্ধ আক্ষরিক পাঠ। এই দুটোর মধ্যে একটা সংঘাত ঘটছে। দ্বিতীয়টির অস্তিত্ব অনস্বীকার্য; প্রথমটির রূপ নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন উঠতে পারে।

এমন প্রশ্ন তোলা কি নেহাত তাত্ত্বিক জেদ? নাকি পাঠনির্ণয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এর কার্যকর প্রয়োজন আছে? এটাই আমি আলোচনা করতে চাই এবং এই আলোচনার সঙ্গে, একেবারে অপণ্ডিতের প্রশ্নের স্তরে জুড়ে দিতে চাই একটা জরুরি প্রসঙ্গ : পাঠনির্ণয়ের নীতি ও পদ্ধতিগুলি যদি সত্যিই বিবিধ, পরিবর্তনশীল, তবে ইউরোপীয় সাহিত্যনির্ভর পাঠশাস্ত্রের নীতিগুলি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে কতটা নেব?

একটু ইতিহাস দিয়ে শুরু করা যাক। আধুনিক পাঠশাস্ত্রের সূত্রপাত পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপে, রেনেসাঁসের হিউমানিস্ট পণ্ডিতকুলের সম্পাদনা ও টীকা-ভাষ্যের কাজে। এই কাজ প্রধানত নির্দিষ্ট হয়েছিল দুটি ক্ষেত্রে : প্রাচীন গ্রিক ও লাতিন





লেখকদের উদ্ধার ও সম্পাদনায় এবং বাইবেল (ও তৎসহ অন্যান্য খ্রিস্টীয় রচনা)-র পাঠনির্ণয় ও ভাষ্যরচনায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি একটু বিশেষ, যেহেতু ধর্মীয় কারণে পাঠশাস্ত্রের দাবি এখানে সর্বদা স্বাধীনভাবে পালিত হতে পারেনি। মূল ভাষা (কিছুটা হিব্রু, কিছুটা গ্রিক) ও অন্যান্য অনুবাদের ভাষার বিচার প্রায়ই একাকার হয়ে গিয়েছে, বেশ প্রকটভাবেই ব্যাখ্যার তাগিদে পাঠ প্রভাবিত হয়েছে। অ-খ্রিস্টীয়, প্রায়শ খ্রিস্টপূর্ব গ্রিক ও লাতিন লেখকদের রচনার ক্ষেত্রে হিউমানিস্ট পাঠশাস্ত্র অবাধ বিবর্তনের সুযোগ পেয়েছে।

এই প্রাচীন রচনাগুলির কিছু কিছু (প্রধানত লাতিন সাহিত্য, বিশেষ করে ভার্জিল ও ওভিদের কাব্য) যদিও মধ্যযুগে বহুপঠিত ছিল, তখন থেকেই এগুলি দেখা হত পুরোপুরি পুঁথিগত, পঠিত সাহিত্য হিসাবে। প্রাচীন গ্রিক রচনার চর্চা মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে একরকম হারিয়ে গিয়েছিল; রেনেসাঁসে তা পুনরুদ্ধার করা হয়। যদিও এর কিছু-কিছু রচনা — সবচেয়ে উল্লেখ্যভাবে হোমারের দুটি মহাকাব্য — প্রায় নিশ্চিতরূপেই মৌখিকভাবে সৃষ্ট ও প্রথমদিকে সেইভাবে প্রচারিত হয়েছিল, রেনেসাঁসের কাছে এগুলিরও অস্তিত্ব ছিল পুরোপুরি লিখিত, পুঁথিগত আকারে। এবং এই পুঁথিগত বিদ্যায় প্রবেশাধিকার অর্জন করতে হত দুটি প্রাচীন ভাষার মাধ্যমে, যার চর্চা মধ্যযুগের তুলনায় অনেক ব্যাপক হলেও আবদ্ধ ছিল সমাজের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ও অভিজাত অংশে — ও বলা বাহুল্য, মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম বাদে সেই অংশের পুরুষ সদস্যে। আরও বলতে হয়, এই প্রাচীন সাহিত্যকে সে যুগে মানা হত সব সাহিত্যের উৎস ও আদর্শ বলে। সাহিত্যের সংজ্ঞাতে একটি অভিজাত উচ্চবর্গীয় মাত্রা আনা, বা প্রায় বলা চলে তেমন মাত্রায় "সাহিত্য" নামক রচনাশ্রেণীর সংজ্ঞা প্রথম সৃষ্টি করা, এই যুগের কীর্তি।

ধ্রুপদী পাঠশাস্ত্রের মৌলিক নীতি ও মানসিকতার যে অনুমান আগে করেছিলাম, তার ঐতিহাসিক কারণগুলি এখন খানিক বোঝা গেল। তবে ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমার মূল উদ্দেশ্য নয়; এই চর্চার অভ্যন্তরীণ নীতি ও ইঙ্গিতগুলিই আমি দেখাতে চাই। সে বিচারে বলতে হয়, উৎসে মৌখিক বা লিখিত, গোষ্ঠীসৃষ্ট বা ব্যক্তিসৃষ্ট যেমন রচনাই হোক না কেন, ইউরোপীয় পাঠবিদদের কাছে সবগুলিই হয়ে দাঁড়াল লিখিত, পুঁথিগত; তার পাঠ নির্ণয় করতে হবে নির্দিষ্টসংখ্যক — হতে পারে ক্ষেত্রবিশেষে বিপুলসংখ্যক। পুঁথির তুলনামূলক বিচারে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কবিচারের জন্য শাখাচিত্র বা stemma গঠন করে। কোনও জীবন্ত মৌখিক প্রচার বা বিস্তারের প্রশ্নই এখানে ওঠে না। এমন পাঠশাস্ত্রের ভাবচিত্র বা model তাই হবে স্থাবর, সুনির্দিষ্ট, কিছুটা জ্যামিতিক — stemma-র সরলরেখার বিস্তার যার কেবল মাধ্যম নয়, একটা প্রতীক বা রূপকও বটে। কালে যখন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বিভিন্ন টিউটনিক (Teutonic) ভাষার পাঠনির্ণয় করতে লাগলেন, পটভূমিকার কোনও পরিবর্তন ঘটল না। এক্ষেত্রেও বহু মহাকাব্য, গাথা ও খণ্ডকাব্য মৌখিকভাবে রচিত ও প্রচারিত হয়েছিল — গ্রিক-লাতিনের চেয়ে অনেক বেশি-ই — কিন্তু সেই জীবন্ত প্রচার ও প্রসারের ধারা বহু শতাব্দী আগেই ফুরিয়ে গিয়েছে। উপরন্তু, টিউটনিক সাহিত্যে পুঁথির সংখ্যাও সচরাচর অনেক কম, প্রায়ই মাত্র একটি। ফলে যে-সব সাহিত্য স্পষ্টতই বহমান ধারায় বিবর্তিত হয়েছে, ভাষায়িত রূপের একটা সজীব পরিবর্তনশীল মণ্ডলের মধ্যে একটা জাতির বা সংস্কৃতির চেতনা ও কল্পনাকে আখ্যায়িত করেছে, বিদ্বানদের বিচারে তা কার্যত হয়ে দাঁড়িয়েছে এক একটা স্থাবর সাহিত্যকীর্তি, এককালীন একরূপী রচনা। গোষ্ঠীসৃষ্টি আর ব্যক্তিসৃষ্টির ব্যবধানটা মুছে গিয়েছে।

বলা বাহুল্য, বাংলা বা যে-কোনও আধুনিক ভারতীয় ভাষার গাথাসাহিত্য বা অন্য কোনও লৌকিক সাহিত্যের পাঠনির্ণয়ে এই দৃষ্টি অবলম্বন করার সুযোগ কম, কারণ যে বিশেষ পুঁথি বা অনুলেখনের ভিত্তিতেই তা নির্ণীত হোক না কেন, তার পিছনে যে জীবন্ত ঐতিহ্য আছে, সেটা আমাদের অভিজ্ঞতার অনেক নিকটে — সরাসরি বর্তমানে না হলেও অদূর গোষ্ঠীস্মৃতিতে রক্ষিত।

এমন অবস্থায় পাঠ বা text-এর ধারণাটাই হয় আলাদা — বিবর্তন ও পরিবর্তন-শীল, একটা গোষ্ঠীসংস্কৃতির চেতনার আধারমাত্র। তার অবস্থান হয় সমাজতাত্ত্বিক বা নৃতাত্ত্বিকের গৃহীত লৌকিক উপকরণ, আর সুনির্দিষ্ট একক সাহিত্যকীর্তি — এই দুইয়ের মাঝামাঝি একটা পর্যায়ে। ইউরোপীয় নিদর্শন যদি খুঁজতেই হয়, তা পাওয়া যাবে হিউমানিস্টদের প্রাচীন পাঠচর্চায় নয়, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে 'ব্যালাড' (ballad) প্রভৃতি গাথাকাব্যের উদ্ধার ও অনুলেখনের যুগে। এর অনেকগুলিই (যেমন বিখ্যাত Percy's 'Reliques'-এর বড় অংশ) আগেকার মুদ্রিত গ্রন্থ থেকে আহরিত; অনেকটা কিন্তু তখনও বেঁচে-থাকা গ্রাম্য সূত্রে গৃহীত।

এই ধরনের মৌখিক সূত্রের রচনার পাঠ-ও আমার মূল আলোচ্য নয়। অবতারণা করলাম এইজন্য, যে পাঠের অনির্দিষ্ট গতিশীল দিকটা এইভাবে তুলে ধরা গেল। কোনও রচনার পাঠকে একটা স্থির রূপ দিতে হবে, তবেই সেটি সাহিত্যের সংজ্ঞাভুক্ত বা পঙ্ক্তিভুক্ত হবে — 'fixing of the text' ও 'fixing of the canon' — এই বদ্ধমূল ধারণা থেকে আমাদের উদ্ধার করতে সাহায্য করছে।

এবার দেখা যাক ইউরোপীয় পাঠশাস্ত্রের দ্বিতীয় উজ্জ্বল পর্যায়ের সূচনা। এই পর্যায়টি অষ্টাদশ শতকের বেশ আগের দিকেই

শুরু হয়, দ্বিতীয়ার্ধে স্পষ্ট রূপ নেয় ও আজও অ্যাকাডেমিক সম্পাদনার ক্ষেত্রে বিরাজ করছে। এই পর্যায়ে অন্তত ইংল্যান্ডে প্রথম (ও আজও অনাদৃত প্রয়াস) লক্ষ্য ছিল শেকসপিয়র ও তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারদের রচনা।

অষ্টাদশ শতক তো বটেই, আমাদের যুগের বিচারেও শেকসপিয়রকে যথার্থ প্রাচীন লেখক বলা যায় না। তাঁর নাটক রক্ষিত আছে মুদ্রিত গ্রন্থে, পুঁথি বা পাণ্ডুলিপিতে নয়। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, অবস্থাটা প্রাচীন গ্রিক-লাতিন পাঠনির্ণয়ের পরিমণ্ডল থেকে একেবারেই আলাদা। কিন্তু সে যুগে নাটক রচনা, নাটকের পাঠরক্ষা ও পাঠপরিবর্তন এবং নাটককে বইয়ের আকারে ছাপাবার প্রক্রিয়া সবই যেভাবে অনুসৃত হত, তাতে পাঠগত সমস্যাগুলি হয়ে দাঁড়াল তুলনীয়। এক অর্থে বা এক স্তরে অবশ্যই তুলনীয় নয়। শেকসপিয়রীয় পাঠচর্চার সেকেলে বইয়ে প্রায়ই গোড়ার দিকে একটু গৌরচন্দ্রিকা থাকত, ক্লাসিকাল সাহিত্যের পাঠনির্ণয় ও শেকসপিয়রের নাটকের পাঠনির্ণয়ের মূল পার্থক্য বুঝিয়ে। কিন্তু আরও গভীর স্তরে সত্যিই একটা সাদৃশ্য আছে।

সাদৃশ্যের প্রথম কারণ, রেনেসাঁসে লন্ডনের পেশাদার রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই নাটক লেখা হত যান্ত্রিক ও খাপছাড়াভাবে—একাধিক নাট্যকারের ভিতর কাজটা ভাগ করে, তারপর দরকারমতো বাড়িয়ে-কমিয়ে-বদলিয়ে : কখনও ঘুচরো কখনও ব্যাপকভাবে, নতুন করে কাউকে দিয়ে আস্ত দৃশ্য লিখিয়ে এমনকি নতুন আখ্যান বা চরিত্র সংযোজন করে। ফলে নাটকের পাঠ হয়ে পড়ত চলমান, বিবর্তনশীল—যাকে কোনও-কোনও পণ্ডিত বলেন continuous copy। (এর সঙ্গে তুলনা অবশ্য গ্রুপদী গ্রিক-লাতিন নাটকেও পাওয়া যাবে না : সফোক্লেসের পাঠ শেকসপিয়রের পাঠের চেয়ে বেশি স্থিতিশীল ও নির্দিষ্ট।)

দ্বিতীয় সাদৃশ্য তথা সমস্যা : শেকসপিয়রের কোনও নাটকের পাণ্ডুলিপি বর্তমান নেই (একটি অসমাপ্ত নাটকের তিনটি বিতর্কিত পৃষ্ঠা বাদে)। আছে কখনও একটিমাত্র পাঠ, সেটি 'Pericles' বাদে অন্য সব নাটকের ক্ষেত্রে First Folio-র সংকলনে; কখনও সেইসঙ্গে এক বা একাধিক Quarto সংস্করণে অল্পবিস্তর ভিন্ন পাঠ। সেক্ষেত্রে সম্পাদকের কাজ প্রত্যেকটি পাঠ নাটকের বিবর্তনশীল অস্তিত্বের কোন্ মুহূর্তের সূচক, তা নির্ণয় করা; এবং একাধিক পাঠ থাকলে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধবিচার করা। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণের সংখ্যা খুব কম হলেও, কাজটা মূলত stemmatics-এর ধাঁচে অর্থাৎ শাখাচিত্রের সাহায্যে পাঠগুলির সম্পর্ক, হয়তো বা একটি থেকে আরেকটির বা কোনও হারানো সূত্র থেকে উভয়ের উদ্ভাবন ছকে দেখানো।

অর্থাৎ কিনা—আবার বলছি, অনেক গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য সত্ত্বেও—কাজটা প্রাচীন সাহিত্যের পাঠনির্ণয় ও সম্পাদনা থেকে প্রগাঢ়ভাবে পৃথক নয়। এই বিশেষ শ্রেণীর ছাপা নাটকের পাঠনির্ণয়ের সঙ্গে পুঁথি বা পাণ্ডুলিপির বিচারের বিলক্ষণ পদ্ধতিগত মিল পাওয়া যায়। হয়তো সেজন্যই আমরা দেখি, উনিশ শতকের পণ্ডিতরা রেনেসাঁসের মুদ্রিত নাটকের পাঠচর্চা থেকে সহজেই চলে যেতে পারলেন মধ্যযুগীয় পুঁথি-পাণ্ডুলিপির সম্পাদনায় বা অপরদিকে রেনেসাঁসের গীতিকাব্য ও অন্যান্য কিছু কিছু রচনার চর্চায় যা মূলত পাণ্ডুলিপির মাধ্যমে রক্ষিত ও প্রচারিত হয়েছে। এখানেও দেখা যাবে সেই stemmatics-এর চর্চা বা তার কোনও অপভ্রংশ রূপ।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (বা কোন-কোনও ক্ষেত্রে তার আগেই) যখন অষ্টাদশ শতক বা তার পরের লেখকদের নিয়ে পাঠভিত্তিক গবেষণা ব্যাপকভাবে শুরু হল, তখন তার ধারাও হল মোটের উপর এক : সব কটি পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত গ্রন্থের তুলনা ও পারস্পরিক সম্বন্ধবিচার। মূলত এ-ও stemmatics-এর চর্চা। যে-গ্রন্থের ইতিহাস মুদ্রিত সংস্করণের পরম্পরায়, সেখানে তারিখগুলি প্রায়ই স্পষ্ট জানা যায় বলে শাখাচিত্রের ছক সাজানো সহজ—যেমন ডিকেন্স ও অন্যান্য বহু ভিকটোরিয়ান ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে। একাধিক পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত পাঠ ক্রমান্বয়ে সাজালেও শাখাচিত্র গোছের খুব কৌতূহলোদ্দীপক ছবি ফুটে ওঠে—যেমন হয় ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বহুলাংশে শেলি ও কিছু অংশে অন্যান্য ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের ক্ষেত্রে।

এতদূর পৌঁছে কিন্তু আমাদের ভাবতে হয়, এই শাখাচিত্র বা stemmatic model-এর কিছু অপ্রত্যাশিত ফলশ্রুতি। তবে সেটা ভাবা যাক একটু ঘুরপথে, অন্য কিছু প্রসঙ্গ আলোচনার মাধ্যমে।

বিবেচ্য পাঠের যে-যে অবস্থান বর্ণনা করেছি, তাতে সম্পাদকের প্রথম সমস্যা হচ্ছে পাঠের বিকৃতি বা corruption। এক্ষেত্রে তাঁর কর্তব্য সংশোধন বা emendation। আমরা আবার শুরু করছি সেই গোড়ার কথা দিয়ে—কোনও রচনা নকল করতে গেলে তাতে বিকৃতি ঢুকবেই। বহু শতাব্দী ধরে পুঁথির পরম্পরায় যে বিকৃতির সৃষ্টি, রেনেসাঁস নাটকের ক্ষেত্রে খুব অল্প দিনে মুদ্রিত গ্রন্থে অনুরূপ বিকৃতি ঘটেছে (ব্যাপক অর্থে অনুরূপ : সূক্ষ্ম বিচারে অবশ্যই ভিন্ন), কারণ এই নাট্যগ্রন্থগুলি ছাপা হত নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে। পাণ্ডুলিপি প্রায়ই জোগাড় হত বরুপথে, তার পাঠ নির্ভরযোগ্য হত না।

তাই সম্পাদক হয়তো এমন পাঠ পেলেন, যা স্পষ্টত ভ্রান্ত বা নিরর্থক। এর বিখ্যাত উদাহরণ শেকসপিয়রের 'Henry V' নাটকে মুমূর্ষু ফলস্টাফের বর্ণনা। First Folio-র পাঠ হল : '.....his nose was as sharp as a pen, and a table of green fields.' অষ্টাদশ শতকে Theobald প্রস্তাব করেন,



নিরর্থক table আসলে হবে babld অর্থাৎ babbled; a সেক্ষেত্রে he সর্বনামের একটি তৎকালীন লৌকিক রূপ।

এমন সংশোধন কিন্তু নিছক অনুমান বা রুচির বিচারে করা চলবে না; কেমন করে বিকৃতিটা ঘটল, তার একটা ব্যাখ্যা দিতে হবে। ঐ যুগের প্রচলিত হস্তলিপিতে ও বানানে babld ও table-এর গোলযোগ হওয়া বিচিত্র নয়। আধুনিক পণ্ডিতেরা বলছেন, ঐ বিচারে শব্দটি talked (talkd) হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি।

তবে এত সহজ সংশোধন সবক্ষেত্রে সম্ভব নয়। 'King Lear'-এর বিধ্বংসী ঝড়ের বর্ণনায় Quarto-র পাঠে আছে 'this tempestuous storm'; Folio-তে, 'this crulentious storm'। Crulentious কোনও শব্দ নেই, আপাতদৃষ্টিতে tempestuous-ই গ্রহণীয় মনে হয়। কিন্তু 'tempestuous storm'-এর সমার্থক দ্বিরুক্তি (tautology) শেকসপিয়রের কলম দিয়ে বেরোবে কি? 'Crulentious'-ই বা এল কোথা থেকে? এর বিচারে সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত, ঐ ভুল শব্দটির আড়ালে লুকিয়ে আছে সঠিক পাঠ 'contentious'। 'Hamlet'-এর একটি বিখ্যাত পাঠান্তর একই শ্রেণীর : Quarto-তে আছে 'O that this too too sallied flesh would melt', Folio-তে 'solid flesh'। দুটিই অর্থবহ ('sallied'-এর অর্থ আক্রান্ত); কিন্তু অনেক সম্পাদক ভাবেন, সঠিক পাঠ হল 'sullied', 'sallied' তার বিকৃত রূপ।

অতএব আমরা একটা নতুন সমস্যায় এসে পড়লাম; ভুল পাঠ ঠিক করা নয়, একাধিক অর্থবহ আপাতগ্রাহ্য পাঠের মধ্যে একটি বাছা। বিকৃতি বা corruption নয়, এ হল পাঠান্তর বা variant reading-এর সমস্যা। এই ভিন্ন-ভিন্ন পাঠের কোন্‌টি আমরা বাছব? এক্ষেত্রে পাঠনির্ণয়ের একটা মূল নীতি হল, যত্রতত্র ঘুচরোভাবে পাঠ নির্বাচন (eclectic editing) না করা। সম্পূর্ণ পাঠ বা text যদি একাধিক রূপ বা version-এ বিদ্যমান হয়, আমরা সেগুলির মধ্যে সামগ্রিকভাবে একটিকে শ্রেয় বা শ্রেষ্ঠ বলে চিহ্নিত করব এবং কোনও বিশেষ স্থলের পাঠ (reading) বিচার করার সময়ে সেই মনোনীত সংস্করণের পাঠটিকেই অগ্রাধিকার দেব। যদি অন্য কোনও সংস্করণে কোনও বিশেষ স্থানে একটি আকর্ষণীয় পাঠ পাই, চট করে সেটি গ্রহণ করব না; উপযুক্ত ব্যাখ্যা পেলে তবেই আমাদের বেশি আস্থাভাজন সংস্করণের বদলে এটির পাঠ মেনে নেব।

এই যে বিভিন্ন সংস্করণের বা পাঠরূপের মধ্যে একটির নির্বাচন, এ বিষয়ে ক্লাসিক নির্দেশ আছে W. W. Greg-এর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে, 'The Rationale of Copy-Text'। অনুসরণীয় পাঠরূপ বা copy-text নির্বাচনে গ্রেগের পরামর্শ কিন্তু বলতে গেলে খুবই সঙ্কীর্ণ। তাঁর অনুদেশে ভাষা বা মূল পাঠ (substantive readings)-এর দিক দিয়ে copy-text-টি যে সবসময়ে শ্রেষ্ঠ এমন মোটেই নয়; তার জন্য আমরা অন্য এক বা একাধিক পাঠরূপের শরণ নিতে পারি। Copy-text-এর গুণ এই যে, বানান যতিচিহ্ন প্রভৃতি গৌণ বিষয়ে (accidentals) এটি লেখকের নিজস্ব বা অন্তত সমকালীন ধারার নিকটতম।

সর্বকালের অগ্রগণ্য পাঠবিদদের মধ্যে গ্রেগ একজন, এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু copy-text নিয়ে তাঁর এই অনুদেশ অনেকের কাছেই মনে হয়েছে বহারত্নে লঘুক্রিয়া : পাঠনির্ণয়ের মূল সমস্যার চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে নিছক খুঁটিনাটির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়া। তাছাড়া এতে এমন ইঙ্গিতও থাকছে, যে বানান যতিচিহ্নের গৌণ বা আপাত প্রসঙ্গেও একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব।

গ্রেগ অবশ্য এ বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানী। সিদ্ধান্তটা যে শেষ অবধি আনুমানিক চলনসই গোছেরই থেকে যাবে সেটা তিনি স্পষ্ট স্বীকার করেছেন। তবু কিছু খটকা থেকে যায়। যতিচিহ্নের বিষয়ে বহু লেখক যে কত অমনোযোগী, তা তো আমরা যারাই পাণ্ডুলিপি বা প্রুফ সংশোধন করি, হাড়ে হাড়ে টের পাই। এক-এক যুগে যতিচিহ্নের ব্যবহারে এক-একটা ধারা দেখা যায় বটে। কয়েক শতাব্দী আগেকার রচনার ক্ষেত্রে (যেমন গ্রেগের প্রধান বিবেচ্য, রেনেসাঁস নাটক) এটা বিশেষভাবেই সত্য। বানানের ক্ষেত্রে ইংরেজির মতো ভাষায় অন্তত দু'আড়াই শতাব্দী আগেকার রচনা না হলে বানানভেদের প্রশ্ন অকিঞ্চিৎকর (কিছু বিশেষ লেখকের কথা আলাদা)। বাংলায় বানানভেদের প্রশ্ন এখনও গুরুত্বপূর্ণ; তবে পাণ্ডুলিপি না পাওয়া গেলে কোন্ বানান লেখকের আর কোন্‌টি অনুলেখক, মুদ্রাকর বা প্রকাশকের অভ্যস্ত তা বোঝা দুষ্কর। শেকসপিয়রের ক্ষেত্রে তাঁর মুদ্রিত রচনার বিশ্লেষণ করেই তাঁর ব্যক্তিগত বানানের অভ্যাস সম্বন্ধে কতগুলি অনুমানে পৌঁছানো গেছে। অত দীর্ঘ অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ক'জন লেখক নিয়ে করা সম্ভব বা সার্থক?

বাংলায় শেকসপিয়রের সঙ্গে তুলনীয় যে কবি, তাঁর রচনার accidentals নিয়ে কিন্তু এক পৃথক ও গুরুতর সমস্যা। এ বিষয়ে তাঁর মত ও অভ্যাস বহুবিদিত, কিন্তু সেগুলি তো ক্রমাগত বদলেছে। তাঁর সহকারীবৃন্দ, লিপিকার-প্রুফরিডার-মুদ্রাকর আরোপিত অভ্যাসের আস্তরণ যদি সরিয়ে ফেলা যায় বলে তর্কের খাতিরে ধরেই নিই (কার্যত তা প্রায় অসম্ভব), তাঁর নিজের কোন পর্যায়ের অভ্যাস আমরা copy-text-এ গ্রহণ করব? কোনও কবিতা প্রথম রচনার সময়ের অভ্যাস, না তাঁর জীবদ্দশায় শেষ বা পরিণত অভ্যাস, না আর কিছু? এই খুঁটিনাটির বিচারেও কিন্তু শেষ অবধি আমরা একই অবস্থানের দিকে এগোচ্ছি : একটি স্থির নির্দিষ্ট পাঠ নয়, চলমান বিবর্তনশীল

পাঠ গঠনের প্রক্রিয়া—যার বাস্তব প্রকাশ একাধিক বিকল্প পাঠের একটি সমষ্টি বা পুঞ্জে যাকে সামগ্রিকভাবে একটি রচনার শিরোনাম দিয়ে অভিহিত করা হচ্ছে। (ক্ষেত্রবিশেষে শিরোনামও পালটাতে পারে।)

বিভিন্ন সংস্করণ বা পাঠরূপের সম্পর্কটা তাহলে হয়ে দাঁড়াচ্ছে নিছক অনুলেখন, প্রচার বা চলাচল চালাচালির ইতিহাস নয়, সৃষ্টির প্রক্রিয়ার ইতিহাস। সৃষ্টি বলতে মুখ্যত লেখকের নিজের সৃষ্টিই বলতে চাইছি। কি শেকসপিয়র ও তাঁর সমসাময়িক নাট্যকার কি উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিক—সকলেই তাঁদের রচনার পাঠ সজ্ঞানে বদলেছেন, হয়তো আমূলভাবেই; এমন মনে করার স্পষ্ট প্রমাণ বা অন্তত সঙ্গত ভিত্তি আছে। পরিবর্তনটা নিছক সৃষ্টির তাগিদে নাকি বাহ্যিক কারণে—ফরমায়েস বা লোকরঞ্জন, আইন বাঁচানোর তাগিদ বা ব্যবসায়িক লক্ষ্য—এবং এই কারণগুলি একে অপরের বিরোধী কিনা অর্থাৎ সম্পাদনার সময়ে প্রথম শ্রেণীর পরিবর্তন গ্রহণীয় ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্জনীয় কিনা, সে-সব ভিন্ন প্রশ্ন।

বাহ্যিক কারণগুলি আরও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যখন পাঠান্তরে অন্য লেখকের হাত স্পষ্ট। মার্লোর 'Doctor Faustus' নাটকের দুটি খুব ভিন্ন রূপ আছে, এবং প্রায় সব পণ্ডিত একমত যে দুটিই বিকৃত ও পরিবর্তিত রূপ। মূল নাটক (যা আমাদের হাতে নেই) কতটা মার্লোর আর কতটা এক বা একাধিক সহযোগীর লেখা ছিল, সে নিয়েও প্রচুর দ্বিধা আছে।

ভিন দেশের ভিন যুগের রচনা নিয়ে এই যে সমস্যা, এটা কি আমাদের অতি নিকটে, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদের পাঠ ও রচয়িতা নিয়ে সমস্যার চেয়ে খুব বেশি আলাদা? এ সবই কিন্তু আধুনিক, আপাতদৃষ্টিতে কোনও বিশেষ লেখকের ব্যক্তিসৃষ্টি বলে অভিহিত রচনার সমস্যা। এই সমস্যাগুলিই ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে গোষ্ঠীসৃষ্ট প্রচীন রচনা ও লোকসাহিত্যের দিকে। এখানে পাঠরচনা ও পাঠগ্রহণ, এই প্রক্রিয়া দুটি আরও স্পষ্টভাবে একাত্ম, দুটি মিলে এক তৃতীয় প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন হচ্ছে যাকে হয়তো আমরা পাঠবিস্তার বা পাঠবিবর্তন বলতে পারি।

কিন্তু কেবল এখানে নয়, পূর্বোক্ত শ্রেণীর অর্থাৎ ব্যক্তিসৃষ্ট রচনার ক্ষেত্রেও কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য, লেখকের পরিচয়, 'লেখক' সংজ্ঞাটি নিয়েই নানা প্রশ্ন উঠে আসে। ফলে একটি স্থির নির্দিষ্ট রচনা বা সাহিত্যকীর্তির বদলে আমরা পাই একটি পাঠান্তরসমষ্টি, বিজ্ঞানে বর্ণিত পরমাণুর গঠনের মতো একটি দুর্জ্ঞেয় কেন্দ্রের চারদিকে অস্থির গতিমান পাঠসমূহের ঘূর্ণিপাক। একে স্থির সিদ্ধ পাঠ তো বলা যায়-ই না, কয়েকটি বিকল্প পাঠের সহাবস্থান হিসাবে দেখাও অতিসরলীকরণ।

Oxford Shakespeare গ্রন্থমালায় শেকসপিয়রের অখণ্ড সমগ্র রচনাবলী প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে। দেখা যায় তাতে 'King Lear' বলে একটি নয় দুটি নাটক একেবারে পৃথকভাবে আদ্যোপান্ত ছাপা হয়েছে: একটি Quarto-লব্ধ 'History of King Lear', অন্যটি Folio-লব্ধ 'Tragedy of King Lear'। সম্পাদকদের মতে (এবং তার আগে আরও বেশ কিছু পণ্ডিতের মতে) এই দুটি সংস্করণ ঘটনা চরিত্রাঙ্কন ইত্যাদিতে এতই ভিন্ন যে দুটিকে আলাদা-আলাদা সময়ে, আলাদা-আলাদা আখ্যান ও উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত সম্পূর্ণ আলাদা দুটি কীর্তি হিসাবে দেখতে হবে। দুটি একত্র করলে এক কৃত্রিম সঙ্কর নাটকের উদ্ভাবন হবে, যা শেকসপিয়রের কোনও পর্যায়ের শৈল্পিক উদ্দেশ্য রক্ষা করে না; বা বলা যায়, হয়ে দাঁড়ায় শেকসপিয়র নয়, তাঁর সম্পাদকের লেখা এক নতুন 'King Lear'।

'King Lear'-এর ক্ষেত্রে এই যুক্তি আমরা মানতেও পারি, না-ও পারি। (আমি ব্যক্তিগতভাবে মানি না।) 'Hamlet'-এর ক্ষেত্রে মনে হয় এমন যুক্তি আরও প্রবল, 'Doctor Faustus'-এর ক্ষেত্রেও। শেষোক্ত নাটকের সাম্প্রতিকতম সম্পাদনে (১৯৯৩-এ David Bevington ও Eric Rasmussen-কৃত) দুটি পাঠরূপ পর-পর পৃথকভাবে ছাপা হয়েছে, কোনও পক্ষপাত না রেখে।

তবু আবার বলছি, পাঠ বিচারে জটিল কোনও রচনার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এমন বিকল্পরূপের বিধানও যেন অতিসরলীকরণ বলে মনে হয়। বস্তুত এই বিকল্প পাঠরূপগুলি পরস্পরবর্জিত বা mutually exclusive না-ও হতে পারে, প্রায়ই হয় না। শেষ অবধি বলতেই হয়, রচনাটির স্থির নির্দিষ্ট রূপ মনে হয় কাল্পনিক, পাঠক বা পণ্ডিতসৃষ্ট; সেই রূপ বিচ্ছুরিত হয়ে দেখা দেয় শব্দে-শব্দে, পংক্তিতে পংক্তিতে অসংখ্য পাঠান্তরের সমষ্টি হিসাবে, যেগুলি একত্রিত করে নেহাত বলার বা বোঝার সুবিধার জন্যই যেন চলতি বিচারে একটি রচনা বলে অভিহিত হচ্ছে।

পাঠনির্ণয় প্রক্রিয়ার জ্যামিতিক রূপ তাই আর সরলরেখার বিস্তারে বোঝানো যায় না—হয়ে দাঁড়ায় বৃত্তিক বা অরীয়, linear নয় radial: একটি ভাষায়িত কেন্দ্রীয় রূপচিত্র থেকে নানা দিকে বিকীর্ণ পাঠের বিস্তার, বা (আমার আগের উপমায়) কেন্দ্রের চারপাশে পাঠগুলির বিচরণ, পারস্পরিক টান, সংঘাত ও মিথস্ক্রিয়া। পাঠ তাহলে বস্তু নয়, প্রক্রিয়া; রচনার প্রক্রিয়াটাই পাঠে মূর্ত ও রূপায়িত হয়ে উঠছে, বা অন্যভাবে দেখলে পঠন ও পাঠগ্রহণের প্রক্রিয়ায় রচনার প্রক্রিয়াটা নতুন করে রূপায়িত হচ্ছে। আধুনিক তত্ত্বের ভাষায়, এই প্রক্রিয়াটাই



textualised হচ্ছে, পঠনের সামগ্রী হচ্ছে, এটাই আমাদের আসল পাঠ; লিপ্যায়িত কোনও বাস্তব পাঠ বা text তার উপাদান মাত্র।

যে লিপি বা মুদ্রণের পরিপ্রেক্ষিতে ধ্রুপদী পাঠচর্চার সাবেক ধারণা গড়ে উঠেছে, নতুন পাঠচিন্তা সেই লেখ্য পাঠ আশ্রয় করে বিকাশ পাবে কিনা সন্দেহ হয়। এই নতুন চিন্তার নতুন বাহক সম্ভবত হবে কমপিউটার। সে পথে প্রথম বড় পদক্ষেপ ঘটেছে পাঠচিত্র উপস্থাপনের সেই নতুন উপায়ে, যাকে বলা হচ্ছে hypertext। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে এটির আলোচনা করা উচিত হবে না; কিন্তু বর্ণনা শুনে মনে হয়, বিভিন্ন পাঠান্তরের সহাবস্থান সবচেয়ে স্পষ্ট, নিরপেক্ষ, চিত্রায়িতরূপে দেখাবার জন্য এটি বিশেষ সুবিধাজনক। কমপিউটারের সাহায্যে ত্রৈমাত্রিক চিত্র দেখাবার উপায়ে দ্রুত উদ্ভাবন ঘটছে; সেটি কোনও দিন hypertext-এর পদ্ধতিতে সংযুক্ত হলে কোনও রচনার পাঠভিত্তিক অবস্থান আরও সূক্ষ্ম ও যথার্থভাবে চিত্রায়িত করা যাবে মনে হয়। খরচে পোষাবে কিনা বলা শক্ত।

এবার আমার নিবেদনের শেষ অংশে আসছি। অংশ না বলে এটিকে হয়তো অগোছালো সংযোজন বলা উচিত। তবু সঙ্কোচের সঙ্গে নিবেদন করছি এই ভেবে, যে বাংলাভাষায় পাঠচর্চার তাত্ত্বিক আলোচনার সার্থকতা বাংলা সাহিত্যে তার প্রয়োগে; সেক্ষেত্রে পাশ্চাত্য রীতির কী-কী পরিবর্তন বা পরিমার্জন দরকার সেটা বিচার করতে হয়। এই প্রয়োগ বা বিচারের উপায় আমার নেই। যা বলব তা পেশাদার সাহিত্যবিদ নয়, সাধারণ পাঠক হিসাবে। সিদ্ধান্তে পৌঁছব না, কিছু প্রশ্ন ও সমস্যা উপস্থাপন করব কেবল।

আলোচনাটা রবীন্দ্রনাথের পাঠ নিয়ে। এই সুবর্ণখনি অগ্রাহ্য করে অন্যত্র নুড়ি কুড়োলে আমার বিষয়ের প্রতি অবিচার করা হবে। তবে আলোচনাটা ধরাছোঁয়ার মধ্যে রাখার জন্য কাব্য ও গানে সীমাবদ্ধ রাখছি। আলোচ্য কবিতা ও গানগুলির প্রত্যেক পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত সংস্করণ আমি দেখিনি; তিন-চারটি প্রচলিত সংস্করণ থেকে খুচরোভাবে কিছু পাঠান্তরের দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি কেবল। তাই বলছি, এটা প্রশ্নের পালা, উত্তর বা সিদ্ধান্তের নয়। এ থেকে বড়জোর পাঠচর্চার কিছু দিঙ্‌নির্ণয় হতে পারে।

উদাহরণগুলির ভিত্তিতে আছে কিছু পরিচিত তথ্য। রবীন্দ্রনাথের লেখা বহুবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। পুনর্মুদ্রণের সময়ে কখনও কবি নিজে, কখনও অন্য কেউ জ্ঞানত বা অজান্তে, ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলে—কোন্‌টা তা জানার উপায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেই—পাঠ পরিবর্তন করেছেন। বিস্ময়কররকম সাম্প্রতিক কাল অবধি পুনর্মুদ্রণের কাজ হয়েছে অফসেট বা অনুরূপ পদ্ধতিতে নয়, প্রতিবার নতুন কম্পোজ করে; ফলে নিছক ছাপার ভুল-ও প্রত্যেক সংস্করণে নতুন এক প্রস্থ ঢুকে থাকতে পারে, হয়তো বা আগের ভুল শোধরানোর সঙ্গে-সঙ্গে। আরও দেখা যাচ্ছে, যে পরিবর্তনগুলি স্পষ্টই ইচ্ছাকৃত সেগুলিও স্থায়ী ও অবিচলভাবে পরিবর্তিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যায়ে বিশ্বভারতীর রচনাবলী, সঞ্চয়িতা-চয়নিকা প্রভৃতি সংকলনগ্রন্থ ও পৃথকভাবে মুদ্রিত কোনও কাব্যগ্রন্থে একই কবিতার ভিন্ন-ভিন্ন পাঠ একই সঙ্গে প্রচারিত হচ্ছে। অতএব সেই যে সাধারণ নিয়ম, কবির জীবদ্দশায় গৃহীত সর্বশেষ পাঠটিই চরম—যে নিয়ম এমনিতেই প্রশ্নাতীত নয়, বরং রীতিমতো তর্কসাপেক্ষ—এক্ষেত্রে একেবারেই চলবে না।

আমি চারটি প্রচলিত সংকলন থেকে রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা ও গানের পাঠান্তর তুলে ধরছি:

(১) কাব্যগ্রন্থ: ১০ খণ্ডের এলাহাবাদ সংস্করণ, ১৯১৫-১৬ সাল অর্থাৎ ১৩২২-২৩ বঙ্গাব্দ (সংক্ষেপে 'কাব্য')

(২) রবীন্দ্র রচনাবলী: বিশ্বভারতীর প্রথম সংস্করণ, যার প্রথম সাত খণ্ড কবির জীবৎকালে তাঁর স্বাক্ষরাঙ্কিত হয়ে বেরিয়েছে। আমার উদাহরণের অধিকাংশই এই সাত খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত রচনা থেকে নেওয়া। (সংক্ষেপে 'রর')

(৩) সঞ্চয়িতা: দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৪০ (সংক্ষেপে 'সঞ্চ')

(৪) চয়নিকা: চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৪৮-এর ফাল্গুনে অর্থাৎ কবির মৃত্যুর পর, শান্তিনিকেতন থেকে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ছাপা। (সংক্ষেপে 'চয়')

আমি মোটের উপর পাঠান্তরগুলি দেখাচ্ছি কেবল। কিন্তু মন্তব্য ছাড়া কোনও রকম বিশ্লেষণ বা সূত্রনির্দেশ করছি না।

কিছু ছোট মাপের উদাহরণ—স্রেফ যতিচিহ্নের ব্যবহার—দিয়েই শুরু করি। 'সোনার তরী'র একটি বিখ্যাত লাইন কাব্য-তে ছাপা আছে এইভাবে:

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!

পংক্তির শেষে বিস্ময়চিহ্নের বদলে রর-তে আছে কমা, চয় ও সঞ্চ-তে দাঁড়ি। এখানে তফাৎটা অর্থের নয়, ব্যঞ্জনার। কিন্তু 'বলাকা'র ৩৬ নম্বর কবিতায় ('সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি') কাব্য ও রর-য় (এবং 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ১৩৪৫ সংস্করণে) আমরা পাচ্ছি 'আর কোন্‌খানে', 'অন্য কোন্‌খানে'—কিছুটা যেন জিজ্ঞাসুভাবে; সেখানে সঞ্চ-তে 'কোনোখানে': এখানে অনির্দিষ্টতার ভাব প্রধান। 'উর্বশী' কবিতার প্রথম দু'লাইনে কমা ও সেমিকোলনের ব্যবহার এক-এক গ্রন্থে এক-এক রকম; তার ফলে 'সুন্দরী রূপসী' বিশেষণ দুটি কার প্রতি প্রযোজ্য, উর্বশী না প্রথম পংক্তির অনাম্নী 'বধূ', সে বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে।

আর এক ধরনের গৌণ বা পার্শ্বিক সমস্যা শিরোনাম নিয়ে। 'অত চুপিচুপি কেন কথা কও' কবিতাটিতে রর-য় কোনও শিরোনাম নেই; চয়-তে আছে 'মরণ', সঞ্চ-তে 'মরণ-মিলন'।

শেষটিই প্রচলিত, কিন্তু বিকল্পগুলি কি একেবারে বর্জনীয়? 'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা' 'বলাকা'-য় শিরোনামহীন; সঞ্চ-তে শিরোনাম 'সবুজের অভিযান', চয়-তে 'নবীন'। 'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে'-র শিরোনাম কী — 'স্বর্গপথে' না 'দুঃসময়'? এটা বাহ্যিক সমস্যা নয়, কবিতার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা এর উপর নির্ভরশীল।

শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'নিরন্তর সম্পাদনা' প্রবন্ধে (দ্রষ্টব্য 'উবর্শীর হাসি', ২য় সংস্করণ, ১৯৯৩) আপাতগ্রাহ্য কিন্তু ভ্রান্ত পাঠের বেশ কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। অনুরূপ আরও কিছু-কিছু দেখা যাক। 'জীবনদেবতা'-র দ্বিতীয় স্তবকের সঠিক পাঠ

আমার নর্ম, আমার কর্ম, তোমার বিজন বাসে?

একাধিক গ্রন্থে হয়ে গেছে 'আমার ধর্ম, আমার কর্ম'। 'দুঃসময়'-এ (এই শিরোনামই ব্যবহার করছি) 'মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্ত্রবে'-তে 'জপিছে' কখনও-কখনও হয়েছে 'জাগিছে'। বহু সাধারণ পাঠক 'সঞ্চয়িতা'র কোনও বিশেষ সংস্করণে দ্বিতীয়োক্ত পাঠগুলি পেয়ে ধ্রুবজ্ঞান করতে পারেন। এ-সব ক্ষেত্রে যে সম্পাদকীয় নীতি অনুসরণীয়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তার লাতিন নাম দিয়েছেন Lectio Difficilior অর্থাৎ 'দুরূহতর পাঠ'। মূলের কোনও দুরূহ পাঠ বা অপ্রচলিত শব্দের অর্থ না বুঝে ভুল মনে করে, বা অন্যমনস্কভাবেই, মুদ্রাকর তার বদলে কোনও সহজ চেনা শব্দ বসিয়ে দেন; উল্টোটা ঘটার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে দুটি পাঠের মধ্যে বেশি কঠিনটিই গ্রহণীয়।

'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে।/তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে'— এই পরিচিত পাঠের দ্বিতীয় পংক্তির গোড়ায় কাব্য-তে একটি 'যেন' যুক্ত হচ্ছে; ফলে তাৎপর্য-ই বদলে যাচ্ছে। আঁখি ও হৃদয়ের উপলব্ধি পৃথক না হয়ে যুক্ত বা পরিপূরক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। 'কাব্যগ্রন্থের' এই সংস্করণের দশম খণ্ডে যে গানের সম্ভার, তার পাঠগুলি বহুক্ষেত্রে 'গীতবিতান'-এর চলতি সংস্করণের প্রচলিত পাঠ থেকে বিস্তর আলাদা। 'কেন সারাদিন ধীরে ধীরে'-র শেষ চার লাইন যেমন —

যে ফুলের বাসে অলস বাতাসে
হৃদয় দিতেছে উদাসিয়া
যেতে হয় যদি চল নিরবধি
সেই ফুলবন তলাসিয়া।

পাঠান্তরের কারণ খোঁজার ভার রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞের উপর ছেড়ে দিলাম। কোনও গানের পাঠবিবর্তন যে কত জটিল হতে পারে, 'মনোমন্দিরসুন্দরী' গানটি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। 'গীতবিতান', 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ও 'চিরকুমারসভা'র বিভিন্ন সংস্করণ, ও রর-তে নাটক দুটির পাঠ কোনও সহজ যুক্তি বা তারিখের ছকে ফেলা শক্ত কাজ। সে ভার-ও বিশেষজ্ঞের উপর ছেড়ে দিলাম।

আবার রবীন্দ্রসঙ্গীতের পাঠান্তর গানটির মূল অর্থ বা তাৎপর্য কীভাবে বদলিয়ে দিতে পারে, তার দৃষ্টান্ত 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা'। গানটির দুটি ভিন্ন পাঠের কথা নতুন করে বলার দরকার নেই; কিন্তু অবাক হতে হয় তৃতীয় একটি পাঠ দেখে, যা সন ১৩৮০-র অশুদ্ধ 'গীতবিতান'-এর শেষে টীকায় (পৃ: ১০০৭) 'ইন্দিরাদেবীর "গানের বহি"-তে কবির হস্তাক্ষরে' লেখা বলে বর্ণিত। পাঠটি উক্ত সংস্করণের ৮৯৪ পৃষ্ঠায় আছে। এই পাঠে 'আমি' সম্বোধন অনুপস্থিত; 'বিজন' শব্দটি তিনবার ব্যবহৃত; এবং শেষ লাইনের শেষ সম্বোধন 'মম মোহনমরণবিহারী'। গানটির এই পাঠরূপ পড়লে সন্দেহ থাকে না, এটি প্রচলিত রূপ থেকে একেবারে ভিন্ন: পুরুষ কর্তৃক নারী নয়, নারী কর্তৃক পুরুষকে সম্বোধন ও সবিশেষভাবে কৃষ্ণকে রাধার সম্বোধন।

কিছু বিক্ষিপ্ত উদাহরণ দিলাম কেবল। এ থেকে কিছু প্রমাণিত বা প্রতিষ্ঠিত হয় না; কৌতূহলের উদ্রেক হতে পারে ও কয়েকটি বৃহৎ সমস্যা তথা সম্পাদননীতির ক্ষুদ্র নির্দেশনা মিলতে পারে। তবে একটা সিদ্ধান্তে অবশ্যই আসা যায়: যদিও ঠিক সিদ্ধান্ত নয়, সমস্যার উপস্থাপন মাত্র। কথাটা নতুন-ও নয়, বহু প্রচলিত; তবু আবার বললে ক্ষতি নেই। কথাটা এই: রবীন্দ্রনাথের কোনও রচনার বিবর্তন ও মুদ্রণের ইতিহাসে একাধিক ধারা দেখা যায়। পাঠান্তরগুলি এই বিভিন্ন ধারা অবলম্বন করে প্রবাহিত হচ্ছে। জটিলতা এখানে, যে ধারাগুলি কালানুক্রমিক নয়, অর্থাৎ একটি সমাপ্ত বা বর্জিত করে আরেকটির সূচনা ঘটছে না। পাশাপাশি, একই সময়ে, কবির বা অন্তত বিশ্বভারতীর প্রচারিত ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ দেখা যায়। কোনও বিশেষ যুক্তি সময়ে-সময়ে খাটতে পারে, যেমন কাব্যে এক পাঠ গানে আর এক; কিংবা উপন্যাস বা নাটকের অঙ্গীভূত হলে এক পাঠ, স্বতন্ত্র কাব্য বা গান হিসাবে ভিন্ন পাঠ। কিন্তু এ যুক্তি-ও সর্বদা খাটে না; 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা' বা 'মনোমন্দিরসুন্দরী'-র মুদ্রণের ইতিহাস তার প্রমাণ।

কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে হয়তো সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যাবে যে অমুক পাঠটিই রবীন্দ্রনাথের মনোনীত স্থায়ী ও চরম পাঠ। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, কবির শেষ সিদ্ধান্ত কি কাব্যের পূর্বরূপ বা প্রথম রূপকে নাকচ করতে পারে? 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের' কোন্ পাঠরূপ মুখ্য? ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেষ জীবনে তাঁর 'Prelude' কাব্যের একটি আদ্যোপান্ত পরিমার্জিত, আধ্যাত্মিকতর সংস্করণ প্রস্তুত করেন। তাঁর ভাইপো ক্রিস্টোফার জাঠামশায়ের স্মৃতি উজ্জ্বল রাখার উদ্দেশ্যে সেটি আরও পরিমার্জিত করে প্রকাশ করেন। এই পাঠরূপটি কি তাঁর স্বর্ণযুগে রচিত, আদি প্রেরণা ও খাঁটি জীবনালেখ্যের স্বরূপ, অথচ তাঁর জীবদ্দশায় ইচ্ছা করেই অপ্রকাশিত, ১৮০৫ সংস্করণের চেয়ে বেশি দামী?



কাব্যগুণেই হোক বা আত্মকাহিনী হিসাবেই হোক, কোনও ওয়ার্ডসওয়ার্থ বিশেষজ্ঞই সে-কথা বলবেন না। বড়জোর বলবেন দুটি পাঠারূপেরই স্বতন্ত্র মূল্য আছে। যথার্থ পঠনে দুটি পাশাপাশি রেখে পড়তে হয়; কোনও ভাল সংস্করণে ছাপাও হয় সেইভাবে, সমান্তরাল বা parallel text-এ। সঙ্গে মাত্র দুই সর্গের একটি আদি রূপও আজকাল জুড়ে দেওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথে ফিরে আসি। কোনও পাঠের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথের মত জানা গেলে যাই হোক না কেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জানা যায় না, সেক্ষেত্রে পাঠান্তরের বিভিন্ন ধারাগুলি পাশাপাশি রেখে, কখনও হয়তো পরস্পরের পাঠ আদান-প্রদান করে, বেণীবন্ধনের মতো প্রক্রিয়ায় একটি জটিল সামগ্রিক রচনাধারা ফুটিয়ে তোলা যায় — একটি মাত্র নির্দিষ্ট অমোঘ পাঠ প্রায় কদাচ নয়। কমপিউটারে তুলে ধরি আর নাই-ই ধরি, মনে-মনে একটা hypertext-এর ভাবচিত্র এঁকে নিয়ে তার প্রেক্ষিতেই বিশেষ-বিশেষ পাঠ বা পাঠরূপ ছকতে হবে। এই সামগ্রিক চিত্রের বিভিন্ন উপাদানগুলি কবিমানসের এক বিশেষ চেতনাপ্রবাহের নির্দেশ দেবে: কোনও একটি কবিতার মূল অনুভূতি আশ্রয় করে সেই প্রবাহ বার বার জেগে উঠছে। অবধারিতভাবে, যদিও অস্পষ্ট ও প্রায় অজ্ঞাতসারে, তার মধ্যে মিশে যাবে কবির সহকারী, সম্পাদক, মুদ্রাকর ও শেষ অবধি সাধারণ পাঠকের অবদান ও প্রত্যাশা। রবীন্দ্রকাব্য নয়, আমাদের অনুধাবন করতে হবে কাব্যজগতে, চেতনার জগতে একটা রবীন্দ্রিক প্রক্রিয়া।

এই প্রক্রিয়ার উপযুক্ত নথিকরণ ও ব্যাখ্যা বোধহয় সমস্ত বিশ্বসাহিত্যে পাঠনির্ণয়ের সব কাজের মধ্যে কঠিনতম একটি। আয়তনে, প্রকাশ ও প্রয়োগের বৈচিত্র্যে, সংস্করণের বাহুল্যে, তার পিছনে যথেষ্ট পরিমাণ পাণ্ডুলিপি ও বিপুল পরিমাণ চিঠিপত্র দলিল প্রমাণের উপস্থিতির ফলে রবীন্দ্র-রচনাসম্ভার পাঠশাস্ত্রের কাছে যে চ্যালেঞ্জ এনে দিচ্ছে, তা পাশ্চাত্য পাঠশাস্ত্রের কোনও একটি ধারার কল্পনার বাইরে। বিভিন্ন পাশ্চাত্য ধারাগুলি একত্রিত করলেও বহু বিষয়ে তার নজির মিলবে না, নতুন পথ ভাঙতে হবে।

সেই পথ কীভাবে অতিক্রান্ত হবে জানা নেই। কিন্তু এই বিশাল সম্ভাবনা হাতছানি দিচ্ছে বলেই বাংলা সাহিত্যজগতে পাঠশাস্ত্রের আলোচনা ও পাঠান্তর সম্বন্ধে একটা জাগ্রত বোধের বিশেষ প্রয়োজন। □

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান প্রতিষ্ঠিত
চতুরঙ্গ পত্রিকার জন্মের অর্ধশতবর্ষ স্মরণে
ড. অশোক মিত্র সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থ ''চতুরঙ্গ'' থেকে প্রথম খণ্ড' প্রকাশিত হয়েছে।
মোট তিন খণ্ডে এই সংকলন গ্রন্থ সম্পূর্ণ হবে।
দে'জ পাবলিশিং প্রকাশিত এই সংকলন গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের মূল্য — ১৭০ টাকা,
প্রাপ্তিস্থান: দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩
চতুরঙ্গ দফতরেও পাওয়া যাচ্ছে।
৫৪ গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩, ফোন-২৭-৬৩২৭

বিশেষ সমালোচনা নিবন্ধ

# নায়কের সন্ধান — ইতিহাসের প্রেক্ষিতে

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

মামলাটা চলছে সেই অ্যারিস্টটলের আমল থেকেই। কী প্রধান? আখ্যান, না 'অন্তর্বিষয়-প্রকটন'? প্লট না ক্যারেকটার? প্লটকে প্রথম স্থানে রেখে চরিত্রকে তিনি সরিয়ে দিয়েছিলেন দ্বিতীয় স্থানে। তার কারণ ছিল, গ্রিকরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও এড়াতে পারেনি 'নেমেসিস' বা দৈব নির্ঘাতির আখ্যানের দুর্লঙ্ঘ্য জাল। বুক পোড়ানো দীর্ঘশ্বাসে তাই সফোক্লিসকে শেষ করতে হয় কিং অয়দিপাউসের গল্প। সহৃদয় পাঠকের মনে জাগে 'পিটি অ্যান্ড টেরর'।

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে ইওরোপে ঘটল রেনেসাঁস। জে. এ. সাইমন্ডসের ভাষায় 'মানবমুক্তির নাটকে প্রথম অঙ্ক'। রেনেসাঁসে দেখা গেল ব্যক্তিপ্রতিভার অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ। মননশীল ও সৃজনশীল মানুষই পেল কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা। হায়রে কবে কেটে গেছে সফোক্লিসের কাল! এখন বিশ্বনাট্যের সর্ববাদিসম্মত ঈশ্বর শেকসপিয়র। তিনি প্লটকে দ্বিতীয় স্থানে ঠেলে চরিত্রকে নিয়ে এলেন প্রথমে।

এ রকম মনে করা খুবই ভুল হবে এর ফলে আখ্যান ও চরিত্রের মামলা চিরকালের মতো মিটে গেল। আসলে প্লট এবং ক্যারেকটার এমনভাবে একে অপরের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যে সময় ও পরিস্থিতির একটু হেরফের হলেই ঘটনাকে যার তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল ঘটনার গুঁতো খেয়ে সেই চরিত্রই বেসামাল হয়ে পড়ে। তখন আবার নতুন করে শুরু করতে হয় ঘটনার কাঠগড়া থেকে চরিত্রকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসার মামলা। এই ব্যাপারটাই ঘটেছিল ঔপনিবেশিক আমলের বাংলায়। সামন্ততন্ত্রের আদি গঙ্গায় এসে পড়ল চার্নক সাহেবদের সদাগরি জাহাজ। এক প্লটের উপর চেপে বসে গেল আরেক প্লট। প্লটের ডবল কাঠগড়া থেকে ক্যারেকটারকে মুক্ত করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব উনিশ শতকের বাংলায় গ্রহণ করেছিল যে, তার নামই রেনেসাঁস। উপনিবেশবাদ দিয়েছিল প্লট, রেনেসাঁস দিল চরিত্র।

বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎ বাবু বঙ্কিমচন্দ্র প্লট ও ক্যারেকটার নিয়ে বেশ সমস্যায় ছিলেন। হরেক মশলা দিয়ে তৈরি করা তার চরিত্রগুলি ঘটনার তোড়ে বারংবার ভেসে গেছে। স্রোত ও সাঁতারুর সেই রুদ্ধশ্বাস লড়াই কৌতূহলী পাঠক নিশ্চয়ই উপভোগ করেছেন।

প্রিন্স দ্বারকানাথের নাতি ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ— বঙ্গীয় রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ, ঘটনার দাসত্ব মানবেন না এটাই স্বাভাবিক। তিনি জোর দিলেন চরিত্রের উপর। উপর না বলে চরিত্রের ভিতরের দিক বলাই বোধ হয় সঙ্গত। 'সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।' কার আঁতের কথা? নিজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে একটা মানুষ মরে যায় (হ্যামলেট); নিজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে একটা মানুষ জেতে (ফাউস্ট)— রবীন্দ্রনাথ কার আঁতের কথা বের করে দেখাবেন? মরে যাওয়া মানুষ, না জেতা মানুষ? — এই প্রশ্নটাই রবীন্দ্র-সাহিত্যে অচল। কেননা তাঁর সাহিত্যে মানুষ শেষ পর্যন্ত মরে না, কেউ হারেও না। উত্তরিত হয়। উত্তরিত হয় পরাজয় বা মৃত্যুর মধ্য দিয়েও। অন্ধকার থেকে আলোয়, মিথ্যা থেকে সত্যে, সংকট থেকে মুক্তিতে।

অভাব নেই তো চরিত্রের। সারা উনিশ শতক জুড়ে বাংলায় জমে উঠেছিল প্লট ও চরিত্রের লড়াই। আকাশজোড়া মেঘের কালো চাদর ফাটিয়ে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছিল বিদ্যুৎ। রেনেসাঁসের সৌজন্যে বাংলায় এসেছিলেন একের পর এক



সেইসব সিংহহৃদয় পুরুষ যাঁদের নাম রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মননশীল ও সৃজনশীল ব্যক্তিপ্রতিভার অভূতপূর্ব বিস্ফোরণে পুরাতনের আগল গেল ভেঙে। পরিবর্তন এল ঝড়ের পিঠে। জিজ্ঞাসায়, বিচারে, বিতর্কে, সক্রিয়তায়, সংরচনায় এক অসম্ভব গতিশীল প্রহর সূচিত হল। প্লটের দাসত্ব অগ্রাহ্য করে এঁরা দাপটের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন ক্যারেকটারের গৌরব।

সামন্ততান্ত্রিক আড্য ও উপনিবেশবাদের পরগ্রাসী প্লট থেকে মুক্তির যে প্রকল্প শুরু হয়েছিল বঙ্গীয় রেনেসাঁসে তার দুটি অঙ্ক। প্রথমার্ধে সে সোচ্চার ছিল দেশীয় অমানবিকতার বিরুদ্ধে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তার বাহক ব্রিটিশ শাসনকে দেখা হয়েছিল মঙ্গলময় বন্ধু হিসাবে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেখা গেল এর উলটো চলন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতার মূল্যে বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী দেখলেন, বৃটিশরাজ ঠিক ততটা উপকারী নয়। মঙ্গলময় বন্ধুত্বে আস্থা হারিয়ে তাঁরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকেও বর্জন করার তাগিদ অনুভব করলেন। কিন্তু এর বিকল্প কী? মনে করা হল এদেশীয় ঐতিহ্য ও রক্ষণশীল মূল্যবোধকে গৌরবান্বিত করে তার কাছে আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়। রেনেসাঁসের পথ আগলে দাঁড়াল বিভাইভালিজম। প্রথমার্ধের অতি পশ্চিমিয়ানা একরকম বিপদের আবর্ত তৈরি করেছিল, দ্বিতীয়ার্ধে সেই বিপদ আসে প্রাচ্যাভিমানের আতিশয্য থেকে। এ-সব সংকট অতিক্রম করার বৃত্তান্ত নিয়েই রেনেসাঁস।

শতাব্দী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা একটি প্লট। প্লটের বিভিন্ন বিন্দুতে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বে দাঁড়িয়ে থাকা চরিত্র সব। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে একটিই অখণ্ড প্রক্রিয়া। মধ্যে দুই বিপরীত যাত্রার নাটকীয় সংকট। সংকট ও সংকটমুক্তির ধীরক্রিয় কিন্তু সুনিশ্চিত তালফেরতা কাহিনী দিয়ে সাজানো রেনেসাঁসের সংসার।

এ নাটকের নায়ক কে? উত্তরে পালটা প্রশ্নই উঠে আসে কে নয়? রেনেসাঁস কোন একক চরিত্রের পালা নয়। এখানে অনেক চরিত্র— অনেক রকম ভূমিকা তাদের। সমান্তরাল ও বৈপরীত্যমণ্ডিত কাহিনী ও উপকাহিনী দিয়ে গাঁথা এর বৃত্ত। অঙ্ক থেকে অঙ্কান্তরে, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে বদলে যায় এর নায়ক। আবার একই নায়ক অঙ্কান্তরে বদল করে তার ভূমিকা ও সাজ— এ দৃশ্যও দুর্লভ নয়।

বঙ্গসংস্কৃতির রাজো প্রতিভার বহুধাবিস্তৃত পর্বতমালার মধ্যে সর্বোচ্চ শৃঙ্গটির নাম নিঃসংশয়ে রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল— Name your hero or heroine in life? তিনি স্বহস্তে এর উত্তরে লিখেছিলেন বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনাপুরুষ রামমোহন রায়ের নাম। 'কী সংকটের সময়ই না তিনি জন্মিয়াছিলেন? তাঁহার একদিকে হিন্দু সমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল আর একদিকে বিদেশীয় সভ্যতা-সাগরের প্রচণ্ড বন্যা বিদ্যুৎ বেগে অগ্রসর হইতেছিল— রামমোহন রায় তাঁহার অটল মহত্ত্বে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।' আত্মবিস্মৃত প্রদোষের অন্ধকারে তিনি অতীত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার (Revival of classical learning) ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আশু পরিগ্রহণ— এই দ্বিমুখী দায়িত্ব পালন করেছিলেন। একদিকে যেমন তিনি ছেলেছিলেন অনাচ্ছন্ন আধ্যাত্মিকতার নির্মল আলো, অন্যদিকে তেমনই সমাজকল্যাণের জন্য নিজেকে সক্রিয় রেখেছিলেন নিরন্তর। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের মূল সূত্রগুলি যাঁর চরিত্রে প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁকে নায়কের মর্যাদায় পুষ্পিত প্রণাম জানান তবে বলার কিছু থাকে না।

রেনেসাঁসের মূল সূত্রগুলি অতঃপর বিস্তারিত হয় বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে। এক এক সূত্রের দায় অর্শায় এক এক চরিত্র বা চরিত্রগুচ্ছের উপর। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিকে অগ্রিবুভুক্ষু পতঙ্গের মতো ধাবিত হয় ডিরোজিও ও তার শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গ। আর প্রাচ্য বিদ্যার নিবিড় অনুশীলন ও অনুরাগের দায়িত্ব পালন করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ডিরোজিও থেকে পশ্চিমি সংস্কৃতি চর্চায় যে উত্তাল তরঙ্গ আছড়ে পড়েছিল ইয়ং বেঙ্গল রূপে, তারই রেখে যাওয়া পলিমাটির ফসল মাইকেলের কাব্যনাটক। প্রবাস ও প্রত্যাবর্তনের একটি দ্বিপর্বিক দৃশ্য এখানে বিদ্যমান। প্রবাস পর্বে (পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সাহিত্য চর্চা) যাঁর নাম ডিরোজিও, প্রত্যাবর্তন পর্বে (মাতৃভাষার নবায়ন) তিনিই মাইকেল। প্রাচ্য বিদ্যার নিবিড় অনুশীলন ও অনুরাগের পথ ধরে বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ উভয়ে অগ্রসর হলেও একজন ছিলেন 'স্বীয় উপলব্ধির জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে আত্মসমাহিত'। অন্যজন ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ মানবতার পরাকাষ্ঠা। বিদ্যাসাগরের 'প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।' দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী আর বিদ্যাসাগর ছিলেন মানবকল্যাণের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ। দেবেন্দ্রনাথ খুঁজতেন ঈশ্বরের সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ আর জ্ঞানবদ্ধী অক্ষয়কুমার দত্ত খুঁজতেন মানবপ্রকৃতির সঙ্গে বাহ্যপ্রকৃতির সম্বন্ধ। প্রাচীন সংস্কৃত ও ইংরাজি চর্চার দুই বিপরীত পথ ঘুরে বিদ্যাসাগর ও মাইকেল এসে দাঁড়িয়েছিলেন একই লক্ষ্যে— মাতৃভাষায় নবায়নে একজন হলেন নবযুগের কবি, অন্যজন বাংলা গদ্যের জনক। অনাচ্ছন্ন আধ্যাত্মিকতার নির্মল আলোয় নিজেকে ক্রমাগত বিশোধন ও পরিশুদ্ধ করে যাওয়া ও ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানবাদ ও মানবতাবাদের বলিষ্ঠ প্রয়োগে বহমান জীবনকে শৃঙ্খলমুক্ত করার আপ্রাণ সংগ্রামে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রথম অঙ্ক এক অদ্ভুত ভারসম্য সামঞ্জস্যে প্রথিত হয়ে আছে। 'নৈবেদ্য' ও 'গীতাঞ্জলি' পড়লে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দুলছেন দেবেন্দ্রনাথ

ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে। চারিত্রপূজার সাক্ষ্য তো আছেই। 'বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল; এত বিরল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে কেবল আর দুই একজনের নাম মনে পড়ে এবং তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায় সর্বশ্রেষ্ঠ।' (বিদ্যাসাগর চরিত)

রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন—

চিত্তহীন অর্থহীন অভ্রান্ত আচার
...
কেবল জড়ত্বপুঞ্জ, ধর্ম প্রাণহীন
ভার সম চেপে আছে আড়ষ্ট কঠিন
বৃথা চেষ্টা ভাই
সব সজ্জা লজ্জাভরা চিত্ত যেথা নাই।

তখন রামমোহন রায়ের প্রণোদনার কথাই মনে হয়। যখন বলেন—

চিরদিন
জ্ঞান যেন থাকে মুক্ত, শৃঙ্খলবিহীন

তখন জ্ঞানবাদী অক্ষয়কুমার দত্ত যেন কথা বলেন। বা লেখেন,

করো মোরে সম্মানিত নববীর বেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষততিহ্ন অলঙ্কার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে
ভাবের লালিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

তখন অজেয় পৌরুষসম্পন্ন বিদ্যাসাগরের সংগ্রামী জীবনাদর্শের ছবিই চোখের সামনে ভাসে।

'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলা'র কবি 'ধর্ম মোহ' নামক একটি কবিতায় লেখেন,

নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো
শাস্ত্র মানে না মানে মানুষের ভালো।

কবিতাটি পড়তে পড়তে আমাদের মনে হয় এখানে পাশে পাশে রবীন্দ্রনাথের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন শতবর্ষ পূর্বের এক তরুণ শিক্ষক ও কবি, নাস্তিকতার অভিযোগে যাঁর চাকরি গিয়েছিল হিন্দু কলেজ থেকে।

রবীন্দ্রনাথের আবাল্য অভিজ্ঞতায় জাগরূক ছিলেন একটি মানুষ। তিনি দেবেন্দ্রনাথ।

'আমি বালকালে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে এখানে কালযাপন করেছি। আমি প্রত্যক্ষভাবে জানি যে কী পূর্ণ আনন্দে বিশ্বের সঙ্গে পরমাত্মার সঙ্গে চিত্তের যোগসাধনের দ্বারা সত্যকে জীবনে একান্তভাবে উপলব্ধি করেছেন। আমি দেখেছি যে, সেই অনুভূতি তাঁর কাছে বাইরের জিনিস ছিল না। তিনি রাত্রি দুটোর সময় উন্মুক্ত ছাদে বসে তারাখচিত রাত্রিতে নিমগ্ন হয়ে অন্তরে অমৃতরস গ্রহণ করেছেন।...'

যা ছিল মহর্ষির সাধনার ধন তাই হয়ে উঠেছে কবির পরম সম্পদ।

আমি কবি, আমি পরম সম্পদ বহন করে এনেছিলুম।
কী আনন্দ ছিল আমার চারিদিকের যোগে। আমার সেই ঘরে সামনে নারিকেল বৃক্ষের শ্রেণী, শরতের আলোতে তার পল্লবের ঝালর ঝলোমলো....

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতার নিভৃত অধিকারে বিশ্বসৌন্দর্যের বিস্ময়রসকে তিনি যে তাঁর কবিতা ও গানের পাত্রে নিবেদন করেছিলেন তার দীক্ষা প্রথমত তিনি পেয়েছিলেন মহর্ষির কাছ থেকেই। এইভাবেই একজন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ আকাশ থেকে খসে পড়া কোন তারা নয়। রামমোহন থেকে উৎসারিত বঙ্গীয় রেনেসাঁসের নানা সূত্র নানা চরিত্রের মধ্য দিয়ে কর্ষিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত যে চরিত্রের মধ্যে সংহত রূপ লাভ করেছিল তার নামই রবীন্দ্রনাথ। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে রেনেসাঁসের প্রথম অঙ্কের নায়কদের কাছ থেকেই তার ধনাত্মক ঋণ সর্বাধিক। জীবনের নানা সংকটে তিনি প্রথমাঙ্কের বাছাই করা অর্জনগুলিই ব্যবহার করেছিলেন। তথাপি রবীন্দ্রনাথের নায়ক একজনই, তিনি রামমোহন রায়। রামমোহন না হয়ে রবীন্দ্রনাথের নায়ক যদি বিদ্যাসাগর হতেন তবে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের চেহারা দাঁড়াত অন্যরকম। কিন্তু তা হবার নয়। হবার জো-ও ছিল না। ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের প্রবক্তা বিদ্যাসাগরের পতাকা বহন করতে পারে এমন কেউ ছিলেন না। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ রূপে রামমোহনই সদাজাগ্রত ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মাথার উপর। তাই রামমোহনই রবীন্দ্রনাথের নায়ক।

রেনেসাঁসের দ্বিতীয় অঙ্কের রঙ আলাদা, রূপও আলাদা। নায়কদের ভূমিকাও আগের মতো নেই আর। এসময় দেখা গেল প্রথম অঙ্কের একটি বিপরীত নাটক। প্রথম অঙ্কে পশ্চিমি সংস্কৃতিকে অবশ্যপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে বরণ করা হয়েছিল অতিথির মর্যাদায়, দ্বিতীয় অঙ্কে বড় হয়ে উঠল প্রত্যাখ্যানধর্মী মানসিকতা; প্রাচ্যাভিমানকে বসানো হল রাজার আসনে। প্রথমার্ধে অতি পশ্চিমিয়ানার যে ঝোঁক দেখা গিয়েছিল সেই ঝোঁক ঘুরে এল স্বদেশ ও স্বধর্মাভিমানের রূপে। ইংরাজিতে লেখা পত্র তখন ঠাকুরবাড়ি থেকে অপঠিত অবস্থাতেই ফিরে যাচ্ছে



পত্রলেখকের কাছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন, 'আমরা যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব।' হিন্দুমেলার উদ্বোধন হয়ে গেছে। 'ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম।' শশধর তর্কচূড়ামণির দল হাঁটি-টিকির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে হিন্দু ধর্মের কৌলীন্য প্রমাণের চেষ্টায় রত।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বীরসিংহ গ্রাম থেকে আট বছরের একটি বালক বাবার হাত ধরে এসে প্রবেশ করেছিলেন কলকাতায়। চতুষ্পাঠীর পরিবর্তে সংস্কৃত কলেজে বারো বছর পাঁচ মাস অধ্যয়ন করে বেরিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর রূপে। রেনেসাঁসের প্রথম অঙ্কের এক বিসংবাদিত নায়ক। বয়সে তার থেকে বছর ষোল ছোট আর একটি গ্রামের ছেলে কামারপুকুর থেকে ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠী হয়ে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। দ্বিতীয়ার্ধের এক অবিসংবাদিত নায়ক। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। সরল, সহজ, অনাড়ম্বর ও লোকায়ত। প্রায় একই রকম পোশাকে মোড়া দুটি ভিন্ন মেরুর চৌম্বক ব্যক্তিত্ব। একজনের প্রধান গৌরব 'অক্ষয় মনুষ্যত্ব', অন্যজন আপাদমস্তক আধ্যাত্মিক। উনিশ শতকের প্রথম অঙ্কে এলে যিনি বিদ্যাসাগর হতেন দ্বিতীয় অঙ্কে এসে তিনি পেলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভূমিকা।

জে. এ. সাইমন্ডস লিখেছেন মানবমুক্তির নাটকে প্রথম অঙ্ক রেনেসাঁস, দ্বিতীয় অঙ্ক রিফর্মেশন। ইওরোপে ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রায় পিছনে পিছনে এসেছিল জার্মান রিফর্মেশন। রেনেসাঁস ও রিফর্মেশনের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে কেউ বলেছেন এরা পরস্পরের পরিপূরক ('Reformation was the theological fulfilment of the Renaissance'—W. J. Bousma), কেউ বা বলেছেন এরা পরস্পরবিরোধী। বোধ হয় দুই-ই। রেনেসাঁসের মূল ভিত্তি ছিল মানবতাবাদ, ধর্মকে বাদ দিলেও সে দাঁড়াতে পারে আর রিফর্মেশনের মূল ভিত্তিই ধর্ম। ধর্মের আলোকেই সে মানুষ ও সমাজকে নিরীক্ষণ ও সংগঠিত করতে চায়। রিফর্মেশনের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ছিল। ঐতিহ্যসিকরা সেটি লক্ষ করেন না। লুথারের রিফর্মেশন আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করেছিল রোম-বিদ্বেষী উগ্র জার্মান জাতীয়তাবাদ। তাঁর 'অ্যাড্রেস টু দা জার্মান নোবেলটি' পড়লে তা টের পাওয়া যায়। প্রসঙ্গটি একবার গৌরকিশোর ঘোষের সঙ্গে বিতর্কে উঠেছিল (দ্র: 'কী ধরনের কসমোপলিটান সমাজ আমাদের কাম্য?'—চতুরঙ্গ, বর্ষ ৫৪ সংখ্যা ২, শরৎ ১৪০০)। স্বদেশপ্রীতির সঙ্গে স্বধর্মপ্রীতি তীব্রভাবে জড়িয়েগিয়েছিল রিফর্মেশনে। আরও অনেক ব্যাপার ঘটেছিল যা রেনেসাঁসে ঘটার কথা নয়। রেনেসাঁস ও রিফর্মেশনের বৈশিষ্ট্য ও সম্পর্ক নিয়ে কোন বিস্তারিত আলোচনা পাতার জায়গা এটা নয় কিন্তু বঙ্গীয় রেনেসাঁসের দ্বিতীয় অঙ্কের ব্যাপার-স্যাপার সঠিকভাবে বোঝার জন্য শুধু রেনেসাঁস নয় রিফর্মেশনের কথা একটু স্মোল রাখা দরকার। এতে দ্বিতীয় অঙ্কের নায়কদের গতি-প্রকৃতি বুঝতে সুবিধা হবে।

এক সম্মিলন সভায় ভিড়ের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে অপ্রাপ্তবয়স্ক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল দ্বিতীয় অঙ্কের এক নায়কের। জীবনস্মৃতিতে আছে সেই বিবরণ—'বঙ্কের উপর দুই হাত বদ্ধ করিয়া তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক হইয়া চলিতেছিলেন, কাহারও সঙ্গে যেন তাঁর কিছু মাত্র গা ঘেঁষাঘেষি ছিল না, এইটেই সর্বাপেক্ষা বেশি করিয়া আমার চোখে ঠেকিয়াছিল। তাঁহার যে কেবলমাত্র বুদ্ধিশালী মননশীল লেখকের ভাব তাহা নহে, তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজটিকা পরানো ছিল।' একই সঙ্গে সৃজনশীল ও মননশীল; স্রষ্টা ও সংগঠক অসাধারণ এক মানুষ।

এদেশীয় ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পরিগ্রহণ— বঙ্গীয় রেনেসাঁসের দুটি মূল সূত্র একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল হয়েছিল রামমোহন থেকে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিপুল কর্ষণলব্ধ ফসল দিয়ে মাইকেল সাজাতে শুরু করেছিলেন বঙ্গভারতীকে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সম্পর্ক মাইকেল পর্যন্ত ছিল দাতা ও গ্রহীতার। তিনি চেয়েছিলেন গ্রিকরা যেমন করে লেখে তেমন করে লিখবেন, ভার্জিলের মতো সাঙ্গীতিক ও কমনীয়; তাসোর মতো মধুর ও চিত্তদ্রাবী; মিল্টনের মতো উদাত্ত ও নিনাদিত, জার্মানদের মতো তেজোদৃপ্ত, শেকসপিয়রের মতো ক্রিয়াশীল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিনিময় প্রথম অঙ্কের শেষ প্রান্তে অনুকরণ থেকে মেলবন্ধন পর্যন্ত পৌঁছেছিল। দ্বিতীয় অঙ্কের অন্যতম নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচ্য সংস্কৃতিকে সমভূল-স্পর্ধায় দাঁড় করালেন পাশ্চাত্যের মুখোমুখি।

গরবিনী প্রাচ্য বঙ্কিমেই প্রথম ঘুরে দাঁড়াল ফণা তুলে। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথে ধর্ম ছিল আলোকিত অনুভূতির ব্যাপার। বঙ্কিম তাকে যুক্তি দিয়ে বাঁধিয়ে দিলেন। বাকরণের নিখুঁত শৃঙ্খলা ও অনুশীলনের নিয়মিত ক্রম দিয়ে থাক থাক করে সাজানো তাঁর মর্মতত্ত্ব। রেনেসাঁসের যাবতীয় উজ্জ্বল উত্তরাধিকার যাঁর কব্জার মধ্যে ছিল তিনি স্বীকার করলেন রিফর্মেশনের সাংগঠনিক দায়। ফলে তার পা রেনেসাঁসে থাকলেও মাথা ছিল রিফর্মেশনে। ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির কাঠগড়া ভেঙে বেরিয়ে আসার জন্য স্বদেশপ্রীতির সঙ্গে জড়িয়ে ফেললেন স্বধর্মপ্রীতিকে। জার্মান রিফর্মিস্টরা এই জিনিসটাই করেছিল। স্বধর্মপ্রীতির অনিবার্য অনুপান বিজাতি-বিদ্বেষ। লুথারের অন্যতম সমর্থক হুটেন 'দ্য রোমান ট্রিনিটি'-তে লিখেছেন 'Three ills I pray for Rome : pestilence, famine and war. This be my Trinity.' ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন 'আনন্দমঠ'। অন্ধকার প্রান্তরের

মধ্যে একটি মশাল যেন। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যার দীপ্ত হয়ে ওঠার কথা ছিল সে ঝুঁকে পড়ল প্রতিবেশীর ঘরের চালের উপর। ভবানন্দের দল চিৎকার করে একসময় বলে — 'মুসলমানের বুকে পিঠে চাপিয়া মার', 'মসজিদ ভাঙিয়া মন্দির গড়িব' ইত্যাদি। জার্মানির রিফর্মেশনের হোতা লুথার ১৫৪৩ সালে লেখা 'এগেইনস্ট দ্য জিউস' নামক পুস্তিকায় রচনা করেছিলেন প্রায় একই রকম একটি ইহুদিবিদ্বেষী প্রস্তাব। 'সমস্ত ইহুদিকে প্যালেস্টাইন ছেড়ে চলে যেতে হবে। অন্যথায় বাণিজ্যাদি ছেড়ে তাদের ফিরে যেতে হবে কৃষিকার্যে। তাদের যা কিছু বই পুড়িয়ে ফেলা হবে। এমনকি কেড়ে নেওয়া হবে বাইবেল।' বঙ্গীয় রেনেসাঁসে দ্বিতীয় অঙ্কের মূলদায় ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির বিরোধিতা। অথচ আনন্দমঠের সমাপ্তিবিন্দুতে উচ্চারিত হচ্ছে 'শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্র রাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয় এমন শক্তি কাহারও নাই।' ঔপনিবেশিক প্লটের চাপ বাইরে থেকে কাউকে বাঁকিয়ে না ফেললে দ্বিতীয় অঙ্কের কোন চরিত্রের পক্ষে ইংরেজকে 'মিত্র রাজা' বলা সম্ভব নয়। যে উপন্যাস হতে পারত প্লটের উপর ক্যারেকটারের দুর্দান্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার উপন্যাস তা শেষ পর্যন্ত রয়ে গেল প্লটের দাস। রিফর্মেশনের চোরা স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেল রেনেসাঁসের ক্যারেকটার।

জাগ্রত স্বাজাত্যবোধের নামে 'বিশ্বের আলোককে বহিষ্কৃত করে নিজের ঘরের অন্ধকারকে পূজা করা'র বিপদ অবশ্যম্ভাবীরূপে ঘনিয়ে উঠছিল গোটা দ্বিতীয় অঙ্ক জুড়ে। এরই মধ্যে বড় হয়ে উঠছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ। বছর দেড়েকের ছোট-বড়। বিদ্যাসাগর বা রামকৃষ্ণের মতো এঁদের বাইরে থেকে আসতে হয়নি। খাস কলকাতার জাতক। একজনের জন্ম শিমুলিয়া পল্লীর গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটে, অন্যজনের জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। একজনের অভিভাবক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্যজন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য। একজন 'গীতাঞ্জলি'র কবি, অন্যজনের পরণে সন্ন্যাসীর পোষাক। কাল এক, পরিপ্রেক্ষিত এক। পরস্পরের নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায় এমন দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি মানুষ — দুটি আলাদা ডিসিপ্লিন থেকে উত্থিত নৈঃশব্দ্য জড়ানো দুই বিপরীত পোষাকের দুটি মেরুশৃঙ্গ যেন। কী করবেন এঁরা? বঙ্গীয় রেনেসাঁসের দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ প্রান্তে উনিশ-বিশের এক জটিল সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কী কাজ এঁদের? পুনরুত্থানবাদের নতুন প্লট এখন ডিকটেট্ করছে চরিত্রের গতি-প্রকৃতি, সাজ-পোষাক এমনকি পরিণাম। যেমন উপন্যাসে তেমনই ইতিহাসে। রেনেসাঁস ও রিফর্মেশনের ডবল ভিটামিন না পেলে প্রফুল্ল দেবী চৌধুরাণী হত না ঠিকই কিন্তু রিফর্মেশনের কাছ থেকে কিছু নিলে কড়ায় গণ্ডায় তা মিটিয়েও দিতে হবে। তার পরিণামদৃশ্যই আমাদের তা বলে দেয়। এই-ই তাহলে শেষ পরিণাম? এপাশে রবীন্দ্রনাথ আছেন ওপাশে বিবেকানন্দ। এই সংকটের মীমাংসা করে যেতে হবে তাঁদেরই।

যে রেনেসাঁসের ভূমিকা পেতেছেন রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্তের মতো প্রমিথিউসরা, রক্ষণশীলতার যত গুটিই জড়ানো হোক গোটা দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে যথাসময়ে সে বেরোবেই সেই গুটি কেটে। একটি অনুন্মোচিত মানসসংগ্রাম লুকিয়ে আছে উনিশ-বিশের সংযোগ পর্বে। দারুণ প্যারাডক্স। রামকৃষ্ণদেব 'কিং' ছিলেন না, সেই অর্থে ছিলেন না সন্ন্যাসীও; তিনি হলেন 'কিং-মেকার'। তার শিষ্য রাজসন্ন্যাসী। প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, তিনি প্রিন্সও নন, কবিও নন কিন্তু কবির জনক। তাঁর পুত্র বিশ্বকবি। নব্য হিন্দুত্ববাদের 'সুপ্রিম কিং' বিবেকানন্দ আর রামমোহন-সূচিত রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথ যে যার নিজের নিজের মতো করে খুলতে খুলতে এগোচ্ছিলেন দ্বিতীয় অঙ্কের সেই সাংস্কৃতিক সংকট। জাল থেকে পালিয়ে পুকুর, পুকুর থেকে পালিয়ে জালে নয় একেবারে রাজরোহিতের মতো জাল ছিঁড়ে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়া।

অর্ধশতক জুড়ে ঘনীভূত একটা সংকটের জাল ছিঁড়ে বেরোবেন রবীন্দ্রনাথ। 'নায়ক কোথায় নায়ক?' উপন্যাসের মোড়কে ইতিহাসের নায়ক। উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ও নিবেদিতার পরিবাহী মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত তিনি চিনে নিতে পেরেছিলেন তাঁর নায়ককে। ভস্ম অপমানের ভেতর থেকে জেগে ওঠা ফিনিক্স পাখি। আনন্দমঠ থেকে গোরা। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ। সুরচিত সংকট থেকে আরব্ধ মুক্তি। বঙ্গীয় রেনেসাঁস দ্বিতীয় অঙ্ক পেরিয়ে উত্তরিত হচ্ছে ঈপ্সিত সত্যে। পেরিয়ে যাচ্ছে 'বিশ্বের আলোককে বহিষ্কৃত করে নিজের ঘরের অন্ধকারকে পূজা করা'র বিপদ। পেরিয়ে যাচ্ছে 'শিবাজী উৎসব' রচনার স্খলন। অন্নদাশঙ্কর রায় সঠিকভাবেই বলেছিলেন — 'রবীন্দ্রনাথ মধ্যজীবনে পুনরুত্থানবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন, গোরার পর তিনি পুনরুত্থানবাদীদের আওতার বাইরে চলে যান।' গোরার মধ্য দিয়ে তিনি সেই উত্তরণকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন, বিবেকানন্দের মধ্যে যার নিশ্চিত সাক্ষাৎ মিলেছিল আগেই। নোবেল প্রাইজের আগেই চিকাগো ধর্মসম্মেলন। রবীন্দ্রনাথের আগেই ছুঁয়ে ফেলা মুক্তির বৈশেষিক বিজয়বিন্দু। গরবিনী প্রাচ্য বক্ষিমেই প্রথম ঘুরে দাঁড়িয়েছিল ফণা তুলে। শিকাগোয় সে মাথায় নিয়ে উঠে এল সাত রাজার ধন এক মানিক — বিবেকানন্দ। সম্প্রতি প্রকাশিত সদ্য রবীন্দ্র পুরস্কার-প্রাপ্ত গ্রন্থ *'নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ'-এ ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষের নির্ণয় অনুসারে এর তাৎপর্যটি

* **নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ** — জ্যোতির্ময় ঘোষ / ত্রিদীপ প্রকাশনী, কলকাতা-৯ / ৬০ টাকা



এইরকম — 'শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনের আন্তর্জাতিক মঞ্চটিকে বিবেকানন্দ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা অধিকৃত স্বদেশ ও স্বজাতির মুক্তিমঞ্চ তথা রণক্ষেত্ররূপেই ব্যবহার করেছিলেন। এও যেন এক কুরুক্ষেত্র।' নায়ক। নায়কই তো। সাম্রাজ্যবাদের দোসর খ্রিস্টধর্মের মৌলবাদীদের সাজানো প্লট ছিল শিকাগো ধর্মসম্মেলন। (শ্রী সুরজিৎ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধ 'বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতার অনালোকিত রূপ' : চতুরঙ্গ, বর্ষ ৫৪, সংখ্যা - ২) কবির পোষাকে যাওয়া চলে না সেখানে, সেখানে পৌঁছানোর জন্য চাই সন্ন্যাসীর সাজ। নানা টানাপোড়েনে বোনা বঙ্গীয় রেনেসাঁসের দ্বিতীয় অঙ্ক বিবেকানন্দকে দিয়েছিল বজ্রগর্ভ মেঘের মতো সেই সাজ। তিনি এলেন, দেখলেন ও জয় করলেন। দু'দিক থেকে সাজানো প্লটের ষড়যন্ত্র ভেঙে প্রমিথিউসের মতো একটি চরিত্রের উত্থান।

দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম প্রচ্ছায়া ও কবির স্বপ্ন দিয়ে সাজানো প্রচীন ভারতের অলঙ্কৃত বিকল্প থেকে বেরোতে রবীন্দ্রনাথের একটু দেরিই হয়ে যায়। নোবেল প্রাইজের আগেই চিকাগো। বেরোনোর কথাই যখন স্থির হল তখন তিনি নিবেদিতার চোখ দিয়ে দেখলেন বিবেকানন্দকে। নায়ক তো তার হাতের নাগালে। হাত দিলেন 'গোরা'য়। 'বিশ্বের আলোককে বহিষ্কৃত করে নিজের ঘরের অন্ধকারকে পূজা করা'র যে সাংস্কৃতিক ও মানসসংকট ঘনীভূত হয়েছিল বঙ্গীয় রেনেসাঁসের গোটা দ্বিতীয় অঙ্ক জুড়ে ব্যর্থ প্রাণের সেই আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলার রচনা। নব্য হিন্দুত্ববাদের মধ্যে জমাটবাঁধা বিপদের হাত থেকে তিনি খালাস করে আনবেন বঙ্গীয় রেনেসাঁসকে। উপন্যাসের অন্তরাল সাজিয়ে শেষ পর্যন্ত গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের বাসিন্দা বিবেকানন্দকেই আশ্রয় করলেন চুপে চুপে। আনন্দমঠে চরিত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল ঔপনিবেশিক প্লট। গোরায় প্লটের উপর জয়ী হয়েছে চরিত্র। কেমন চরিত্র? নিজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে একটা মানুষ মরে যায়। একটা মানুষ নিজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে জেতে। জেতে মানে উত্তরিত হয়। অন্ধকার থেকে আলোয়, মিথ্যা থেকে সত্যে, সংকট থেকে সমাধানে, বন্ধন থেকে মুক্তিতে। রবীন্দ্রনাথ গোরায় সেই উত্তরিত নায়কের কথাই বলেছেন, জার্মান কবি গ্যেটে ফাউস্টের মধ্য দিয়ে মেফিস্তোফেলিসকে পরাস্ত করে যে আলোকিত উত্তরণকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা করেছেন গোরার মধ্য দিয়ে।

গোরা কি তবে ভারতীয় সাহিত্যের ফাউস্ট? না। হতে পারত ফাউস্ট। যদি সত্যিই বিবেকানন্দকে তিনি গ্রহণ করতেন চিরকালীন নায়কের মর্যাদায়। অথবা নিজে নিক্ষিপ্ত হতেন বিবেকানন্দের সংকটে। কোনটাই হয়নি। হওয়া সম্ভব ছিল না। নিরাপদ দূরত্বে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে রবীন্দ্রনাথ রূপেই বজায় রেখেছিলেন। বিভিন্ন চরিত্রে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ নিবেদিতা বা রবীন্দ্রনাথের সংলাপ। ত্রিভঙ্গ ব্রাহ্ম উদারতার সাজানো ছকে তিনি গৌরমোহনবাবু-রূপী নব্য হিন্দুত্ববাদকে খেলতে দিয়েছিলেন. শেষ পর্যন্ত। তারপর শেষ প্রান্তে পৌঁছে তিনি কীভাবে সরিয়ে নিয়েছেন তার পায়ের তলার মাটি পাঠকের তা অজানা নেই। ঈপ্সিত উত্তরণের জন্য রবীন্দ্রনাথের দরকার ছিল একটি দাহ্য চরিত্রের। বিবেকানন্দ তাঁর সেই আপৎকালীন নায়ক। চিরকালের নায়ক রামমোহনই। সংকট উত্তরণের উপন্যাস লেখা হয়ে যাবার পর নায়কের সমস্যা তার থেকেই গিয়েছিল। 'নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের শেষ ছত্রে তাই ধ্রুবপদের মতো ফিরে আসে তীক্ষ্ণ একটি বাক্য 'নায়ক কোথায়, নায়ক?' — চ্যালেঞ্জের মতো।

প্রশ্নটি ধরে কেউ একদিন ছিঁড়েখুঁড়ে দেখবেন বাঙালির ইতিহাস ও বাংলা সাহিত্য। তখন হয়তো জানা যাবে প্লট ও চরিত্রের মধ্যে আধুনিক বঙ্গ সংস্কৃতিতে কার গৌরব বেশি। হয়তো অনুভব করা যাবে এই সত্য যে রেনেসাঁসকে যতটা 'খণ্ডিত' ভাবা হয় তা ততটাই 'খণ্ডিত' নয়। এমন সব নায়ক সে উপহার দিয়ে গেছে যাদের অবলম্বন করে একটি জাতি বেঁচে থাকতে পারে বহুকাল। নায়কদের কথা বিস্মৃত হলেও নায়কের সন্ধান করছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথা ভোলা কি যাবে! □

বিশেষ সমালোচনা নিবন্ধ

# বিষয় : 'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম'

অজিত দাস

আমাদের সমাজে বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কে নানা রকম বিভ্রান্তি আছে। শিক্ষিত জনকেও বলতে শোনা যায়, ওতো চাষাভুষো ছোট লোকের ধর্ম। বৈষ্ণব ভক্তজনের টিকি কণ্ঠী তিলক আর জপমালা দেখে লোকে হাসাহাসি করে। বৈষ্ণবের মহোৎসবকে ব্যাঙ্গার্থে বলে 'মোজব'। জনসাধারণ অপরাধী নয়। সমাজের তৃণমূল স্তর অবধি এই ধর্ম প্রসারিত। কিন্তু নানা দল উপদলে বিভক্ত, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত। বিরুদ্ধ প্রচার, পরস্পরের প্রতি কুৎসা রটনা, গালাগালি এবং আবেগজনিত প্রচারের অতিরঞ্জনে এমন বিভ্রম সৃষ্টি করে রেখেছে যে এই ধর্মের প্রকৃত পরিচয় খুঁজে পাওয়া ভার। চাষাভুষোর ধর্মকথা যেমন সত্য নয়, মহাপ্রভু সব জাতপাত মুছে দিয়েছেন, এটাও তেমন সত্য নয়। সত্য পরিচয় জানার উপায় ইতিহাস অনুসন্ধান। সেই ইতিহাসেরই অভাব। ধর্ম দর্শন তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ থাকলেও বৈষ্ণব ধর্মের ধারাবাহিক, তথ্যনিষ্ঠ, পক্ষপাতহীন ইতিহাসগ্রন্থ মেলে না। সুখের কথা রমাকান্ত চক্রবর্তী মশাই সে কাজে অগ্রণী হয়েছেন। তিনি বঙ্গদেশের সুধী সমাজে সুপরিচিত। বৈষ্ণব দর্শন সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ে নিষ্ঠাবান গবেষক ও বিশেষজ্ঞ। কিছু কাল আগে তাঁর লেখা ইংরাজি গ্রন্থ 'Vaishnavism in Bengal' বইটি পড়ে মনে হয়েছিল, বঙ্গভাষায় এমন একটি গ্রন্থ পেলে ভাল হত। সম্প্রতি তাঁর লেখা 'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম' বইটি প্রকাশিত হয়েছে। ধারাবাহিক ইতিহাসকথা। গ্রন্থের নামপত্রে লেখা হয়েছে; "একটি ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন।" এতেই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও গ্রন্থের চরিত্র ঘোষিত। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখা হয়েছে : "গৌড় বঙ্গের প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু মানুষ। অথচ বৈষ্ণবীয় তত্ত্বে এই মানুষকেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়। সমাজে সংসারে এই ধর্মের গতিপ্রকৃতি এবং তাৎপর্য নির্ণয় গৌণ হয়ে পড়ে। .....এই গ্রন্থে এই বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে।"

গ্রন্থটির গুরুত্ব এখানে। ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষের যে লীলা— সেটাই আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটি পনেরটি অধ্যায়ে বিভক্ত। সাধারণ প্রচলিত ধারণা— নবদ্বীপের ভক্তিবাদী আন্দোলন থেকে বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের সূচনা। ইতিহাস তা নয়। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে প্রাচীন ও আদি-মধ্যকালের বঙ্গের বৈষ্ণব ধর্ম প্রসঙ্গ। তবে বঙ্গের বৈষ্ণব ধর্ম ও সমাজ বলতে এখন যা বোঝায়— তার সূচনা চৈতন্যকাল থেকেই।

গ্রন্থের অধ্যায়গুলি হচ্ছে :

১। প্রাচীন ও আদি-মধ্যকালে বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন মাত্রা
২। চৈতন্যের আবির্ভাবের সামাজিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত
৩। ভক্তির সামগ্রিক অর্থ এবং বঙ্গে ভক্তি প্রচারের পদ্ধতি
৪। চৈতন্য সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য
৫। প্রধান গোস্বামীগণ এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ
৬। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন
৭। বৃন্দাবনে এবং বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার : অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ এবং গোপাল গণ
৮। খেতুরি উৎসব : পটভূমি, প্রস্তুতি এবং তাৎপর্য
৯। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৈষ্ণব ধর্মের বিবরণ
১০। পূর্ব এবং উত্তরবঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের বিবরণ
১১। কয়েকটি গ্রন্থের বিবরণ

বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম— রমাকান্ত চক্রবর্তী / আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯ / ৫০ টাকা



১২। বৈষ্ণব গুরুবাদ এবং তার বিভিন্ন মাত্রা
১৩। জাত বৈষ্ণব প্রসঙ্গে
১৪। কীর্তনের ক্রমবিকাশ
১৫। মূলায়ন।

লেখকের সিদ্ধান্তমতে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচলন দেখা যায়। এ ধর্ম "ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের বৃহৎ ঐতিহ্যের একটি বিশিষ্ট মাত্রারূপে প্রচলিত ছিল।" (পৃ: ৯) তারপর বিবর্তিত হতে থাকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নানা পরিবর্তন ও প্রভাবের ভিতর দিয়ে। এখন বৈষ্ণব ধর্মের উপাস্য কৃষ্ণ, কোথাও বিষ্ণু, চতুর্ভুজ নারায়ণ। আদিতে তা ছিল না। এই ধর্ম এক সময়ে বুদ্ধকেও অবতার বলে স্বীকার করত। আবার দেখা যাচ্ছে : "বিষ্ণু ধর্মে লেখা হয়েছে যে, বস্তুবাদী এবং অবৈদিক মতাদর্শের প্রভাবে হিন্দু সমাজের বাঁধন শিথিল হয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা কমে যাচ্ছিল ; শূদ্রদের প্রভাব বেড়েছিল। অব্রাহ্মণরা ধর্মশাস্ত্রে শ্রদ্ধা রাখতে পারছিলেন না। বৌদ্ধ হেতুবাদ হিন্দুদের সংস্কারসমূহকে দুর্বল করে ফেলেছিল। এই অবস্থায় বৈষ্ণব যোগ-এর প্রচার প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।" (পৃ. ১৪) এভাবেই বৈষ্ণব ধর্ম সমাজের প্রয়োজন মিটিয়েছে এবং বিবর্তিত হয়েছে। উপরের দৃষ্টান্তটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ব্রাহ্মণ সমাজ নিজেদের প্রভাবপ্রতিপত্তি বজায় রাখতে, শূদ্রদের বৌদ্ধ প্রভাব থেকে সরিয়ে এনে নিজেদের অধীনস্থ প্রজা করে রাখতে কী ভাবে বৈষ্ণবতাকে কাজে লাগিয়েছে। এই তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালের বঙ্গের বৈষ্ণব আন্দোলনের ঘটনাবলী এর আলোয় তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতার রূপ হয়ে ওঠে চমকপ্রদ।

বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম-এর অতীত ইতিহাসও দেখা যাচ্ছে দীর্ঘকালের। ক্রমে বাঁশিওয়ালা কৃষ্ণ এসেছেন, রাধা এসেছেন। লেখক সুনিপুণভাবে এই ইতিহাসকে গ্রন্থে তুলে এনেছেন। তাতে দেখা যায় ধর্ম মানুষেরই মনের সৃষ্টি এবং তাকে মানুষ কীভাবে ব্যবহার করেছে। ফলে ধর্ম নব নব রূপ ধারণ করেছে।

নবদ্বীপে ভক্তি আন্দোলনের ফলে বৈষ্ণব ধর্ম আরেক নতুন রূপ ধারণ করল। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন চৈতন্য।

আন্দোলন অকারণে গড়ে ওঠে না। কারণ থাকেই। সে কারণ ছিল তৎকালীন নবদ্বীপের সমাজসংস্কৃতির পরিমণ্ডলে। লেখকের দেওয়া বিবরণ থেকে যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে, ব্রাহ্মণসমাজের কার্যকলাপ— তাঁদের রক্ষণশীলতা, প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ। একদিকে সমাজচিন্তাবহির্ভূত শুষ্ক নব্যন্যায়চর্চা, অন্যদিকে স্মার্ত পণ্ডিতদের ভূমিকা। আদিমধ্যকালে বৌদ্ধ প্রভাবে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা কমেছিল, শূদ্ররা প্রবল হয়েছিল। একালেও ব্রাহ্মণরা ভীত হয়ে পড়েছিলেন, পাঠান আমলে শূদ্রদের ক্ষমতাবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি দেখে। শূদ্র ধর্মগুরুর ভূমিকাও নিচ্ছিল। অতএব স্মার্ত পণ্ডিতরা শূদ্র দমনে তৎপর হলেন। "হিন্দু সমাজের নৈতিক বাঁধন যতই দুর্বল হয়ে পড়ে, ততই নব্য স্মৃতি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।" (পৃ. ২১)

এখন ব্রাহ্মণরা আর বৈষ্ণবতাকে কাজে লাগালেন না, কারণ পটভূমি ভিন্ন। এখন স্মার্ত পণ্ডিতরা নতুন নতুন স্মৃতির অনুশাসন রচনা করতে লাগলেন। লেখক স্মার্ত রঘুনন্দন ও স্মার্ত কালীকৃষ্ণ তর্কালংকারের অনুশাসন থেকে যে সামান্য দৃষ্টান্ত তুলেছেন, তা পড়ে একালের পাঠক স্তম্ভিত হবেন। মনে পড়বে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের কথা। ভূমিপুত্র কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি ঘোষিত তাদের অনুশাসনসমূহকে মনে পড়বে। এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও ঔপনিবেশিক। ভূমিপুত্রদের সঙ্গে সম্পর্কহীন। অথচ সমাজপ্রভু বা শাসক। এঁদের আচরণের ফলেই নবদ্বীপে ভক্তি আন্দোলনের সূচনা। প্রতিবাদী ভূমিকায়। এবার বৈষ্ণবতা হল প্রতিবাদ শক্তির অস্ত্র। ভক্তি আন্দোলনের পিছনে আরও অনেক কারণই ছিল। "বর্ণবিভাগের কঠোরতা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বর্ণজাতিভিত্তিক বিচ্ছিন্নতা, হিন্দু মুসলমান অভিজাতদের স্বার্থপরতা এবং ঐক্যিকতা, বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে নব্যন্যায়ের শুষ্কতা চৈতন্যের আবির্ভাবের মুহূর্তে বাঙালি সমাজে একটি সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল।" (পৃ. ২৭)

তাহলে দেখা যাচ্ছে বর্ণবিভাগের কঠোরতাই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ এবং প্রধান কারণ। রঘুনন্দন ঘোষণা করেছিলেন দ্বিজাতি তত্ত্ব। সমাজ থাকবে দুভাগে বিভক্ত— ব্রাহ্মণ আর শূদ্র। শূদ্রের সামাজিক অধিকার থাকবে না। অর্থাৎ ধর্ম নিয়ে মাতামাতি বা গুরুগিরি চলবে না। শূদ্রের কাজ হবে ব্রাহ্মণের সেবা করা। শূদ্রের বাড়িতে ব্রাহ্মণের যজন যাজন নিষিদ্ধ, তার দানও নেওয়া যাবে না, নিলে পতিত হবে। স্ত্রীজাতিও শূদ্র। ভক্তি আন্দোলনে তাই ঘোষিত হয়েছে স্ত্রীশূদ্রআদি সকলকে ভক্তি বিলাতে হবে। স্পষ্টতই স্মার্ত অনুশাসনের বিরোধিতা।

"ভক্তির অভ্যাসের ক্ষেত্রে তাঁরা জাতপাতের বিচারকেও আগ্রাহ্য করেছেন। ব্যক্তির জাতপাত নির্বিশেষে ধর্মাচরণের অধিকার তাঁরা মেনেছেন। ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে যোজক পুরোহিতের প্রয়োজনীয়তা ছিল বলে তাঁরা মনে করেননি। স্ত্রীলোকদের বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বন তাঁদের বিচারে দুষণীয় ছিল না। বৈষ্ণবদের এই উদারতা রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের পছন্দ হয়নি। বৈষ্ণবতা, ভক্তি একটি জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক বিকল্প হয়ে উঠছে দেখে তাঁদের ভয় হল।" (পৃ. ৩৮)

স্মার্তদের অনুশাসনবিরোধী আন্দোলন যে ভক্তিপ্রচার— এখেকেই এটা স্পষ্ট। ধর্মের আবরণে সামাজিক আন্দোলন ছাড়া কী?

এই ভক্তি আন্দোলন সম্পর্কে লেখক একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন। "নবদ্বীপের ও শান্তিপুরের ব্রাহ্মণদের অন্তর্দ্বন্দ্ব চৈতন্যের ভক্তি প্রচারে পরিস্ফুট।" (পৃ. ৩৪) ঠিকই তো। সমাজ নিয়ন্ত্রণ ও অনুশাসন রচনায় ব্রাহ্মণের একচেটিয়া অধিকার। তার ভালমন্দ বিচার—সমর্থন অথবা প্রতিবাদ জানাতেও ব্রাহ্মণেরই অধিকার। একালের সাংসদ ও বিধায়কের ভূমিকা যেমন। সাধারণ মানুষের ভূমিকা থাকে না। বিরোধী সদস্যরাই প্রয়োজনে বাইরে জনআন্দোলন গড়ে তোলে। সেদিন নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের কিছু উদারচেতা বিচক্ষণ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে স্থানীয় রক্ষণশীলদের সংঘাত বেধেছিল, তার পরিণতিতেই ভক্তি আন্দোলন।

প্রতাপশালী ব্রাহ্মণ সমাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা সহজ কাজ ছিল না। চৈতন্য সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

আমাদের সমাজে চৈতন্য সম্পর্কে একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। তা হচ্ছে: বাস্তবতার ঊর্ধ্বে ভাবে বিভোর, ঢুলুঢুলু আঁখি, নৃত্যরত এক মূর্তি। ভক্তদের কৃপায় তাঁর বাস্তব সংগ্রামী রূপ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তা ইতিহাসের সত্যও নয়। চৈতন্যের সেই সংগ্রামকালের ভূমিকা লেখক উপস্থাপিত করেছেন। তাতে মানুষ এবং কর্মী ও সংগঠক চৈতন্যকে পাওয়া যায়—যা বাস্তব। তিনি বৈষ্ণবদের সংগঠিত করছেন, কীর্তনীয়াদের সংগঠিত করছেন, ব্রাহ্মণেতর সমাজের মানুষদের পাড়ায় ঘুরে জনসংযোগ করছেন, তিনি নগরকীর্তন পরিচালনা করছেন, যাত্রাভিনয় করছেন। এটাইতো চৈতন্যের পরিচয়—আন্দোলনের সংগঠক হিসাবে। অত বড় আন্দোলন তো যাদুমন্ত্রে হয়নি।

চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ সম্পর্কে ভক্তরা নানা ব্যাখ্যা দেন, অনেক বুদ্ধিজীবীর রচনায় দেখা যায়, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা নিয়ে তিনি সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, কেউ বলেন, তাঁর ভক্তিবাদকে বৃহৎ ক্ষেত্রে প্রচারের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ। কিন্তু তিনি যে নবদ্বীপ ত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন, এটাইতো সত্য। না হলে নবদ্বীপ ছেড়ে, অমন জমজমাট আন্দোলন যা তখন সবে গড়ে উঠছে—তাকে ছেড়ে, পরিবার, পরিকর ছেড়ে ওইভাবে কেউ চলে যায়? লেখক সত্যকেই তুলে ধরেছেন।

চৈতন্য সন্ন্যাস নিলেন, নবদ্বীপ ত্যাগ করলেন, পুরীতে গিয়ে থাকলেন। লেখক, চৈতন্যের পুরীবাসের যে বিবরণ তুলে ধরেছেন তা যেমন বাস্তব, তেমন করুণ, দুঃখজনক। অমন পুরুষসিংহ, কর্মী, প্রাণচঞ্চল তরুণ যেন খাঁচায় বন্দি হয়ে গেলেন। অতিসামাজিক মানুষ সহসা সন্ন্যাসী—যার পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। হয়তো কোনদিন ভাবেননিও। তিনি পুরীতে কঠোর ব্রতী সন্ন্যাসী। সেখানে তিনি গুরু, অবতার ভগবান। তাঁর পাশে **কত সমালোচক**, সকলের সতর্কদৃষ্টি তাঁর দিকে। স্বভাবতই তিনি সন্ন্যাস জীবন নিয়ে সন্ত্রস্ত। ভাল খেলে নিন্দা, ঘরে পিঁপড়ের দল ঘুরলে লোকের সন্দেহ, বুঝি রাতে লুকিয়ে ভাল কিছু খাওয়াদাওয়া করে, সুন্দরী তরুণী বিধবার শিশুপুত্রকে আদর করলে নিন্দা। মানুষ নিমাই পণ্ডিতের কী অসহায়তা, তাঁর ধর্ম আলোচনার সঙ্গী রায় রামানন্দ—যিনি তরুণী রূপসী দেবদাসীর অঙ্গ সেবা করেন, দেবদাসীর গোপনাঙ্গ দর্শন ও স্পর্শ করেন। চৈতন্যের কী নিরুপায়তা। তিনি কি ঘরে বসে শুধু ধর্মালোচনা করার মতো মানুষ ছিলেন? কোন মানুষ তার অমন গৌরবময় অতীত ভুলতে পারে? অতীত সতত সুখের। সারা বছর তিনি প্রতীক্ষা করতেন, কবে বাংলাদেশ থেকে তাঁর প্রিয়জনেরা আসবেন। তিনি শুনবেন বাংলার কথা, নবদ্বীপের কথা, মায়ের কথা। তাঁরা ফিরে যাবেন, আবার একবছর তিনি একা। এ এক আশ্চর্য দুঃখের চিত্র।

মার জন্য তাঁর প্রবল চিন্তা ছিল। বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য?

লেখক এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। "ধর্মে পত্নীর কোন স্থান ছিল না। চৈতন্যমানসে কী চিন্তা ছিল, তা তো জানার উপায় নেই।" (পৃ. ৪৩) লেখকের এই সামান্য মন্তব্যটুকুতে মনে হয় যেন অনেক পাওয়া গেল। এটা লেখকের বাস্তববোধ, সততা ও সৎসাহসের পরিচয়। এ প্রশংসনীয়।

এমন নির্বাসনের মতো জীবনযাপনের ফলে চৈতন্যের ব্যক্তিমানসে হতাশা জন্মানোই স্বাভাবিক। ব্যক্তিজীবনের বাস্তব ব্যর্থতাকে, স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে অস্বীকার করবেন কী ভাবে? তিনি পুরী আসার পর দুবছর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করে স্থানু হয়ে বসেছিলেন পুরীতে। কেন? মনে হয়, নবদ্বীপের আন্দোলনই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞানস্বপ্ন। কোন সন্ন্যাসভাবনা, অন্য কোন সাধনভজনভাবনা তাঁর ছিল না। তাই পুরীতে তাঁর ওই জীবন। লেখক অবশ্য এসব কথা বলেননি। তিনি নানা ভাবে তাঁর বিড়ম্বিত জীবনকে তুলে ধরেছেন। চৈতন্য হতাশায় ভুগছিলেন। লেখক জানিয়েছেন, "আত্মহননের প্রবণতা তাঁর আগেও দেখা গেছে।" (পৃ. ৪৮)

শেষে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে চৈতন্য আত্মবিসর্জন দিলেন।

এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে। চৈতন্যের মৃত্যু সম্বন্ধে একাধিক মত প্রচলিত। সমুদ্রে আত্মবিসর্জন দেওয়ার মতটি লেখক গ্রহণ করলেন কেন? এর কারণ লেখক দেখাননি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত হচ্ছে, জেলের জালে ধরা পড়ার পরও চৈতন্য জীবিত ছিলেন। এ সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য "এটা বিশ্বাস করা শক্ত।" এর দ্বারা কি কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত খণ্ডিত হল? চৈতন্যের মৃত্যুকাহিনী রহস্যাবৃত বলেই রমাকান্তবাবুর কাছে একটা যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য প্রত্যাশিত ছিল।

বাংলার বৈষ্ণব সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল খেতুরি উৎসব। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচিত গ্রন্থাদি আনিয়ে, খেতুরির বৈষ্ণব সম্মেলনে শাস্ত্র হিসাবে স্বীকার করা হল। গোপাল ভট্ট গোস্বামীর



রচিত 'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থকে গ্রহণ করা হল বৈষ্ণবের স্মৃতিগ্রন্থ হিসাবে। তার ফলে বাংলার বৈষ্ণব আন্দোলনের মূল চরিত্রই বদলে গেল। এতকাল ভক্তি আন্দোলনে জাতিবিচার ছিল না। 'হরিভক্তিবিলাস'-এর অনুশাসন হল বৈষ্ণব সমাজকে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা মানতে হবে। ব্রাহ্মণকে বর্ণশ্রেষ্ঠ হিসাবে মানতে হবে। চণ্ডাল হরিভক্তিপরায়ণ হলেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ হতে পারবেন না। অর্থাৎ রঘুনন্দনের দ্বিজাতি তত্ত্বই বহাল হল। প্রতিবাদী দল বৈষ্ণবতাকে আশ্রয় করে আন্দোলনে নেমেছিলেন। এখন সেই রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যশক্তি প্রতিবাদীদের আশ্রয়চ্যুত করে, বৈষ্ণবতাকে গ্রাস করল। সংগ্রামে ব্রাহ্মণদেরই জয় হল। বৈষ্ণব ধর্মেও ব্রাহ্মণদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। গঠিত হল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ। বাংলার বৈষ্ণব সমাজের সকলে এই ব্যবস্থা মেনে নিলেন না। ফলে নানা দল উপদলের সৃষ্টি হল। ভক্তি আন্দোলনে পুরোহিতের ভূমিকা অস্বীকৃত হয়েছিল কিন্তু গুরুর ভূমিকা গৃহীত হয়েছিল। ভক্তের কাছে, শিষ্যের কাছে গুরুই সব—গুরুই ভগবান। ব্রাহ্মণ্য স্মৃতির সঙ্গে বৈষ্ণব স্মৃতির মৌল পার্থক্য আছে। বৈষ্ণব স্মৃতিতে শূদ্রের, নিম্নবর্গীয় শূদ্রের এবং স্ত্রীলোকেরও ধর্মীয় গুরু হবার অধিকার স্বীকৃত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংগঠন যেমন ধর্মপ্রচারে নামলেন, তেমনই ওই সব দল-উপদলও নিজ নিজ ক্ষমতামতো বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে নামলেন। নানা স্তরের গুরু ছড়িয়ে পড়লেন সমাজের তৃণমূল স্তর অবধি। তার ফলেই বৈষ্ণব ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংগঠন না থাকায় এবং যথেচ্ছ গুরুর সৃষ্টি হওয়ায়, বিকৃতি, বিভ্রান্তিও জমে উঠেছে।

গ্রন্থমধ্যে লেখক এই সমস্ত ঘটনাবলীর সুন্দর বিবরণ পরিবেশন করেছেন। রচনার গুণে সে বিবরণ জীবন্তপ্রায়। ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় লেখক ঘটনাপরম্পরাকে নিখুঁতভাবে সাজিয়েছেন। পাঠক পড়তে বসে এক আশ্চর্য জগতে প্রবেশ করবেন। লেখক হবেন তাঁর অন্তরঙ্গ সঙ্গী। চলে যাবেন বাংলার গ্রামে গঞ্জে নগরে, কত গুরু—কত বিচিত্র তাঁদের আচরণ। আখড়া-শিষ্য—কোথাও দুর্ধর্ষ ডাকাত সদাচারী হয়ে যাচ্ছে বৈষ্ণবতার আশ্রয় নিয়ে। আবার কোথাও নেমে যাচ্ছে মানুষ গুরুর কারণে। লালন, কর্তাভজার কথাও বলেছেন লেখক। ফলে বৈষ্ণবতার প্রভাব যে কতদূর—তা বোঝা যাবে। দল উপদল অনেক হয়েছিল। এখন তার অধিকাংশই আর নেই। কতরকম দল গজিয়েছিল তার তালিকা দিয়েছেন লেখক। এখন সেসব দলের অনেকের অস্তিত্ব না থাকার কিছু কারণ লেখক জানিয়েছেন তাঁর ধারণামতো। যে ধারণা অবশ্যই যুক্তিগ্রাহ্য।

"অধিকাংশ গৌণ-বৈষ্ণব, অর্ধবৈষ্ণব সম্প্রদায় সংগঠনের অভাবে, অর্থের অভাবে, সময়ের পরিবর্তনে এবং ব্রাহ্মণদের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিরন্তর সমালোচনার জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।" (পৃ. ১৪৮)

কিছু উপদল বা সম্প্রদায় আজও টিকে আছে। তাদের ভিতর একটি হচ্ছে জাত বৈষ্ণব সম্প্রদায়। এদের প্রসঙ্গ গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। আলোচনা থেকে এদের কথা ভালভাবেই জানা যাবে। এদের উদ্ভব, সমৃদ্ধি ও আচার বিচার সম্পর্কে বহু তথ্য হাজির করেছেন লেখক। তার ফলেই অনেক ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হবে। এরা বর্ণাশ্রম ও জাতপাত বিরোধী। এরা গৃহী। লেখক জানিয়েছেন, চৈতন্য পরিকর অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি পরিকর দ্বারা এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত। লেখক, শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিতমশাই' কাহিনীর জাত বৈষ্ণব নায়ক-নায়িকার আদর্শ চরিত্রকথা জানিয়েছেন। কিন্তু হিন্দু সমাজজীবনে এরা নিন্দিত, ধিক্কৃত। সমাজের বিশিষ্ট ভব্যজনের দৃষ্টিতে এরা " 'out caste Vaishnavas', অসভ্য, জারজ এবং অস্পৃশ্য।" (পৃ. ১৪৬)

এই নিন্দা সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন "যেখানে ব্রাহ্মণরা থাকবেন, ব্রাহ্মণ্য সদাচারের ও সাংস্কৃতিক বিদগ্ধতার আদর্শ থাকবে, সেখানে জাতবিচার থাকবে, থাকবে বিভিন্ন জাতির ও বর্গের মানুষের বিভিন্ন জীবনধারার তুলনামূলক বিশ্লেষণ। মনু থেকে শুরু করে রঘুনন্দন পর্যন্ত সমস্ত স্মার্তসংহিতা স্রষ্টাগণ তাই করে এসেছেন। এইরূপ তুলনামূলক বিচারই ছিল ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। জাত বৈষ্ণবদের ধর্মের ও জীবনাচরণের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমালোচনায় সেই বৈশিষ্ট্যই দেখা গেল।" (পৃ. ১৪৮)

অনেক সম্প্রদায় অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারেনি। জাত বৈষ্ণব সমাজ আজও টিকে আছে। জাত বৈষ্ণব সম্পর্কে লেখকের আরেকটি বক্তব্য থেকে এদের টিকে থাকার একটা কারণ অনুমান করা যায়। তাঁদের সমাজ ও ধর্মাচরণ উচ্চবর্ণের গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সমাজ ও ধর্মাচরণের সঙ্গে তুলনায় অনেক বেশি সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। তাঁরা উচ্চজাতীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তত্ত্বাবলী সম্বন্ধে কখনই ঔৎসুক্য দেখান নি।" (পৃ. ১৪৭)

এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হচ্ছে, এরা চৈতন্য পরিকরদের দ্বারা গঠিত সম্প্রদায়। চৈতন্য পরিকররা জাতি বিচার করতেন না ভক্তের, আর তখন প্রচার ছিল ধনে মানে কুলে বিদ্যায় চৈতন্যকে পাওয়া যায় না। হয়তো এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী বলেই এঁরা উচ্চজাতীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তত্ত্বাবলী সম্বন্ধে ঔৎসুক্য দেখাননি। লেখা হয়েছে, 'জাত বৈষ্ণবদের কোনও গোত্র থাকে না।' (পৃ. ১৪৩) কিন্তু তাঁরা একটি গোত্র ব্যবহার করেন। শৈব নাথ যোগী সম্প্রদায় যেমন 'শিবগোত্র' ব্যবহার করেন, তেমন জাত বৈষ্ণবরা ব্যবহার করেন 'অচ্যুতানন্দ' গোত্র।

'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম' বইখানি সম্পর্কে অকপটে বলতেই হয়, অতি সুলিখিত, গুরুত্বপূর্ণ এবং মহৎ সৃষ্টি। বিশেষ প্রশংসনীয় লেখকের পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গি। □

বিশেষ সমালোচনা নিবন্ধ

# প্রসঙ্গ : 'হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ভাল করার উপায়'

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

আনন্দ পুরস্কার-প্রাপ্ত "বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক" গ্রন্থের প্রণেতা ড: নজরুল ইসলামের এই ধারায় দ্বিতীয় গ্রন্থ "হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ভাল করার উপায়"।

এই দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক খারাপ হওয়ার কারণ হিসাবে তিনি জানিয়েছেন: (১) অভিজাত উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের উন্নাসিক মনোভাব; (২) সেকুলার ব্যাপারকে হিন্দু-ধর্মীয় করে তোলার প্রচেষ্টা; (৩) হিন্দুস্তান শুধু হিন্দুদের দেশ মনে করা; (৪) হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ধারণা; (৫) হিন্দুদের স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং অধিকাংশ হিন্দুর মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ। লক্ষণীয় যে এখানে তিনি শুধু হিন্দু অভিজাতদের দোষ দিচ্ছেন না; সাধারণ হিন্দুদের ঘৃণা ও বিদ্বেষের উৎস হিসাবে মনুসংহিতাকে দায়ী করছেন। অপরদিকে তিনি দায়ী করেছেন, (১) অভিজাত মুসলমানদের ইসলামকে সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম হিসাবে ধারণা; (২) সেকুলার অনুষ্ঠানে ধর্মের বাড়াবাড়ি; (৩) দেশের সঙ্গে একাত্মবোধ না করে অন্য দেশের গৌরবে গর্ব করার প্রবৃত্তি; (৪) হিন্দু-সাধারণের উপর আস্থা না রেখে তাদের প্রতিপক্ষ ভাবা; (৫) স্বাধীন ভারতে মুসলমানদিগকে সমস্ত রকম সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে ভাবা; (৬) পুলিশ ও প্রশাসন হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছে মনে করা; (৭) হিন্দুদের সম্পর্কে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা; (৮) ধর্মাচরণে ও খাদ্যাভ্যাসে বৈপরীত্য।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ভাল করার উপায় হিসাবে লেখক যে পথনির্দেশ করেছেন, তা বিরোধের উল্লিখিত কারণগুলিরই প্রতিষেধক। তবে বিশেষভাবে বলেছেন যে হিন্দুদের বুঝতে হবে যে মুসলমান হলেই যে সাম্প্রদায়িক বা গোঁড়া হবেন, পাকিস্তান বা বাংলাদেশের প্রতি অনুগত হবেন, এমন কোন কথা নেই; মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির হার বেশি হওয়ার কারণ ধর্ম নয়, দারিদ্র্য। আর মুসলমানদের বুঝতে হবে যে হিন্দু হলেই বিধর্মী হয় না, হয় অন্য ধর্মাবলম্বী; সব হিন্দুই হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায় না, মুসলমানরা যে চাকুরি ক্ষেত্রে উচ্চপদে বেশি সংখ্যায় আসীন নেই, তহর জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী আধুনিক শিক্ষাগ্রহণে মুসলমানদের নিজেদের উদ্যমহীনতা। হিন্দুরা পরিকল্পিতভাবে পুলিশ ও প্রশাসনকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন না, এ কথা বুঝতে হবে। উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর সুপারিশ— ধর্মাচরণে এবং খাদ্যাভ্যাসে বৈপরীত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।

লেখকের একটি প্রস্তাব বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনাবাহী। তিনি বলেছেন, "ভেদভাব-সূচক নাম বাদ দিয়ে এমন সাধারণ বাঙলা নাম রাখতে হবে, যাতে বোঝা যাবে না ব্যক্তিটি হিন্দু না মুসলমান, তথাকথিত উচ্চবর্ণ কিংবা নিম্নবর্ণভুক্ত।" "হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব বাঙালীর বাংলা ভাষায় একই রকম নাম রাখতে শুরু করলে.......হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক ভাল হবে।" লেখক বলেননি কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে ইন্দোনেশিয়ায় মুসলমান দেশনেতাদের নাম সুকর্ণ, সুহার্তো, সুব্রত। এ দৃষ্টান্ত তাঁর প্রস্তাবের সমর্থনে যায়।

অসঙ্কোচে বলা যায় যে লেখকের সব কয়টি সুপারিশই সততাপ্রসূত ও আন্তরিকতাপূর্ণ। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে

**হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ভাল করার উপায়** — ড: নজরুল ইসলাম / মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩ / ৯০ টাকা



তিনি একত্র যে সমস্ত সুপারিশের সমাবেশ হাজির করেছেন, বিচ্ছিন্নভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অন্যান্য লেখক সে কথা বলেছেন; তা সত্ত্বেও কাজের কাজ বিশেষ কিছুই হয়নি— উত্তরোত্তর সাম্প্রদায়িকতা বেড়েই চলেছে। তার মূল কারণ হচ্ছে এই যে বিশ্লেষণে কিছু ফাঁক থেকে যাচ্ছে। রোগের মূল কারণ ধরা না পড়লে তার নিদানের জন্য যে বিধান, তা অপ্রতুল হয়ে পড়ে। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের উৎস সন্ধান করতে হলে উভয় সম্প্রদায়ের মর্মপীড়া আপন-অন্তরে দহনজ্বালার মধ্য দিয়ে অনুভব করতে হয়, আপন সম্প্রদায়গত সত্তার গ্লানিস্মৃতি, অহমিকা, সংস্কার ও ভীতির ঊর্ধ্বে উঠে তুলাদণ্ডে সূক্ষ্মতম বিচার ও বিশ্লেষণ করতে হয়, আবার অভেদ বিশ্বজনীন প্রেমে জারিত হয়ে অকুতোভয়ে কঠোর সত্য উচ্চারণ করতে হয়। যাঁরা মননশীলতায় ও আবেগে সব সম্প্রদায়ের আপনজন হতে পারেন, শুধু তাঁরাই পারেন এই কঠিন সমস্যার যথোচিত বিশ্লেষণ দিতে ও সংশ্লেষণ উপস্থাপিত করতে। সেরূপ লোক আমাদের মধ্যে কম আছেন। যাঁরা আছেন, তাঁদের কণ্ঠস্বর আমাদের কাছে পৌঁছতে পারছে না।

ড: নজরুল ইসলামের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণপ্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই অতিকথন, একদেশদর্শিতা ও চট্‌জলদি সিদ্ধান্তের প্রবণতায় ক্লিষ্ট। তাঁর আলোচনা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন ওঠে: (১) স্বাধীনতার পূর্বযুগে অবিভক্ত ভারতে অন্য প্রদেশের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উথাল-পাথাল, ঘাতপ্রতিঘাত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে অবিভক্ত বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিশ্লেষণ কি সম্ভব? আবার দেশবিভাগের পরবর্তীযুগে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহ ও চিন্তাভাবনার ক্রমবিকাশ বা প্রত্যাগতির ঢেউ কি পশ্চিমবাংলার মুসলিম সমাজের চিন্তাভাবনাকে এবং সামগ্রিকভাবে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে প্রভাবিত করেনি? বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য অনেক সময় বাইরের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে হয়, কিন্তু আলোচ্য-গ্রন্থে যে ভাবে এ দিকটি উপেক্ষা করা হয়েছে, তার ফলে পশ্চিমবাংলার সম্প্রদায়গত পারস্পরিক সম্পর্কের সত্যনির্ভর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উপস্থাপিত করার কল্পনা কি আদৌ বাস্তব ছিল? (২) হিন্দু উচ্চবর্ণের উন্নাসিকতা তো ছিল প্রধানত তথাকথিত শূদ্রবর্ণের বিরুদ্ধে, তাহলে শূদ্রবর্ণের মধ্যে এ চরিত্রের বিচ্ছিন্নতাবাদ এল না কেন? আজ দলিতরা অতি ন্যায়সঙ্গতভাবেই সামাজিক পীড়নের শিকল ছিঁড়ে ফেলে আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন, কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদ-কে আত্মঘাতী স্তরে নিয়ে যাননি কখনও; কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা হতে পারল কেন? (৩) হিন্দু উচ্চবর্ণের উন্নাসিকতা হিন্দু-মুসলমান বিরোধের প্রাথমিক কারণ হিসাবে স্বীকৃত; কিন্তু সেই উন্নাসিকতা কি গত আটশত বৎসর ধরে একই প্রতাপে বিরাজ করেছে? তাই যদি হয়ে থাকবে, তাহলে হিন্দু সমাজের তলায় পড়ে থাকা নমঃশূদ্রদের সঙ্গে মুসলমানদের দাঙ্গার ইতিহাস গড়ে উঠল কী করে? (৪) হিন্দু উচ্চবর্ণ তো বখতিয়ার খিলজির জয়ের সময় থেকেই মুসলমানদের ম্লেচ্ছ বলত— এর মধ্যে ঘৃণার প্রকাশ ছিল আবার ধর্মান্তর রোধ করার একটা কৌশলও ছিল। নবাবদের শাসনকালে এই ম্লেচ্ছ উচ্চারণ নিম্নগ্রামেই আনতে হয়েছিল এবং বহু শতাব্দী ধরে এক সমন্বয়ের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। তাহলে সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এমন কী ঘটেছিল যাতে হিন্দু সমাজ আবার অন্য পথ নিল? এ সময়ে মুসলমান সমাজে ভারতে বা বাংলায় এমন কিছু ঘটেছিল কি যার বিষম প্রতিক্রিয়া সমগ্র হিন্দু সমাজের উপর পড়েছিল? (৫) কেরলে খ্রিস্টীয় সম্প্রদায় তো সেখানকার লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। হিন্দু উচ্চবর্ণের লোকেরা তো খ্রিস্টানদেরও 'যবন' বলত, ম্লেচ্ছ বলার ধরনেই। তা সত্ত্বেও খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ গড়ে ওঠেনি কেন এবং আজ সেখানে এই প্রকার অভিধা বিলীন হয়ে গেছে কীভাবে? (৬) পার্শি সম্প্রদায় সংখ্যাগতভাবে অতি-লঘু হলেও অর্থনৈতিকভাবে অতি-পরাক্রমী। তাদের সঙ্গে 'হিন্দু' বা খ্রিস্টানদের সম্পর্ক খারাপ হয়নি কেন?

হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কারণ বিশ্লেষণে এবং সমাধানের পথ সন্ধানে এই সকল প্রশ্নের গুরুত্ব অসীম। সে আলোচনার পূর্বে গ্রন্থকার সাধারণ গরীব হিন্দু-মুসলমান চাষির স্বার্থ ও হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যবহার সম্বন্ধে যে তথ্য দিয়েছেন, তার মধ্যে সত্যের পরিমাণ নিরূপণ করা দরকার। লেখক বলেছেন, হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায় সাধারণ চাষির পরিপন্থী ছিল; যেহেতু ফজলুল হক মন্ত্রিসভা সকল সম্প্রদায়ের গরীবদের পক্ষে কতকগুলি আইন পাশ করেছিলেন, সেহেতু হিন্দু জমিদার-মহাজন প্রভাবিত কংগ্রেস বারবার মন্ত্রিসভার পতনের চেষ্টা করছিল। 'হিন্দুস্বার্থ' মানে সে সময় ছিল হিন্দু অভিজাত স্বার্থ। এই অভিজাতরা শ্রেণী স্বার্থের দিক দিয়ে যেমন প্রতিক্রিয়াশীল ছিল, জাত-পাতের ভেদ বজায় রাখার ব্যাপারেও সেরূপ রক্ষণশীল ছিল। জাতীয় সংগ্রহশালায় ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র রাজনৈতিক ফাইল থেকে এক স্বল্প-পরিচিত অথচ অতি প্রয়োজনীয় তথ্য লেখক উদ্‌ঘাটন করেছেন: "১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে অস্পৃশ্যতা বিল পেশ হলে বাংলার সব ক'জন হিন্দু সদস্য এর তীব্র বিরোধিতা করেন। বাংলার বি. পি. সিংহরায় বিলটিকে 'হিন্দুদের ধর্মীয় অধিকারের উপর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ এবং হিন্দু সমাজের ভিত্তির অবমূল্যায়নের প্রচেষ্টা' বলে নিন্দিত করেন। এরূপ প্রতিক্রিয়া দেখে বিলটির প্রস্তাবক এম. সি. রাজী মন্তব্য করতে বাধ্য হন যে, বিলটির

বেশীর ভাগ বিরোধিতা হচ্ছে বাংলা প্রদেশ থেকে যেখানে তাঁরা বলেন যে বাংলায় অস্পৃশ্যতা নেই।"

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় **দশকে** যে কংগ্রেস জমিদারি স্বার্থের দ্বারা **বহুলাংশে** প্রভাবিত ছিল এবং অভিজাতরা যে বর্ণ ব্যাপারে রক্ষণশীল ছিল, এ কথা অবিসংবাদিত সত্য; কিন্তু লেখক যখন বলতে চান যে হিন্দু উচ্চবর্ণের শিক্ষিত সম্প্রদায় **বরাবর** জমিদারি স্বার্থের প্রতিভূ ছিল, তখন তিনি ইতিহাসের বহু পরিচিত ঘটনাগুলি ভুলে যান। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা জমিদারদের এবং নীল ও চা বাগানের মালিকদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করেছিল। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ব্রাহ্মনেতা অক্ষয়কুমার দত্ত জমিদার, ইজারাদার, পত্তনিদারদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে চলতেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে কৃষককের শোষণকারী সামন্ত স্বার্থের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র যেমন নীলবাগানী ইংরাজদের বিরুদ্ধে 'নীল দর্পণ' লিখেছিলেন, অনুরূপভাবে 'জমিদারদর্পণ' প্রকাশ করেছিল তদানীন্তন প্রভাবশালী হিন্দুরাই। Hindu Patriot (সে যুগেও লোকে এর অর্থ বুঝত Indian Patriot) সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জি সদর্পে শোষিত কৃষক সমাজের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ভারত সভার সদস্যরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচার করেছিলেন যে বৃটিশ প্রবর্তিত ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা (land tenure system) রায়তদেরকে আপন দেশেই ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছে এবং সেই জনাই এর সংস্কার অবিলম্বে প্রয়োজন। তাদের সেই প্রচার জমিদারদের মধ্যে দারুণ উষ্মার সৃষ্টি করেছিল। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে অভয়চরণ দাসের বই 'The Indian Ryot' কৃষক জাগরণে সাহায্য করেছিল। সুতরাং উচ্চবর্ণের শিক্ষিত হিন্দুরা কৃষকদের পাশে না দাঁড়িয়ে হিন্দু জমিদারদের পাশে বরাবর দাঁড়িয়েছিল, ড: নজরুল ইসলামের এই ধারণা ভ্রান্ত।

রাজবন্দি মুক্তির বিষয়কে অগ্রগণ্য না করে যে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদের পক্ষে হক মন্ত্রিসভায় যোগদান সম্ভব ছিল না, তাও লেখক বুঝতে চাননি। নিঃসন্দেহে বাংলায় প্রজাস্বত্ব সংশোধন ও মহাজনি আইন পাশ অতি জরুরি ছিল কিন্তু স্বাধীনতাসংগ্রামীদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির মূল্য দিয়ে সেই ব্যবস্থা করা উচিত ছিল কি না, সে সম্পর্কে স্পষ্ট রায় দেওয়া কঠিন। গ্রামের মহাজনরা এই দুইটি আইনের পাশ কাটিয়ে কীভাবে গরীব দায়বদ্ধ চাষিকে দিয়ে বিক্রয় দলিল লিখিয়ে নিয়ে **বহুক্ষেত্রেই** জমির হস্তান্তর ত্বরান্বিত করেছিল, তা যদি লেখক জানতেন! গরীবের শক্তিকে সংগঠিত না করে শুধু আইন পাশ করলে বহু ক্ষেত্রে বিপরীত ফল হয়। এ কথা-বোঝার সময় এসেছে।

গ্রন্থকার মহাত্মা গান্ধীকে-ও কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূ হিসাবে চিত্রিত করেছেন। তিনি বলেছেন, তিনের দশকে বসু ভ্রাতৃদ্বয় যখন বাংলায় হিন্দু-মুসলমান মিলনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন মহাত্মা গান্ধী তাতে বাধা দিলেন এবং "বাধা দেওয়ার কারণ এই মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের কলকাঠি নাড়া।" এইরূপ মন্তব্য করার আগে জানাতে হয়, বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের কোন্ ফরমুলার বিরোধিতা এসেছিল গান্ধীজির কাছ থেকে। সেই ফরমুলার কোন উল্লেখ না করেই শুধুমাত্র নীরদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের এক রায়কে পর সত্য বলে মেনে নিলেন। চৌধুরী মহাশয়ের যে কল্পিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর প্রবণতা আছে, তা তো সুবিদিত।

লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কট্টর সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও মুসলমানবিরোধী হিসাবে চিত্রিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিম-লিখিত "ভারতবর্ষ পরাধীন কেন" প্রবন্ধের এবং ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্র-লিখিত "বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা" প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন। ১৯৩২ সালের "The Bengal Hindu Manifesto" এবং ১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ব্রজেন্দ্র নাথ শীল, প্রফুল্ল চন্দ্র রায় স্বাক্ষরিত এক স্মারকলিপিরও উল্লেখ করেছেন। কোন্ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে, কোন্ হতাশার আঁধারে এই সব বিশ্বপ্রেমী ও সর্বজনীন মানবতার প্রবক্তারা কী বক্তব্য প্রকাশ করেছেন, সে বিচার করা একান্ত আবশ্যক। সেজন্য যেতে হয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।

লেখক প্রথমেই বলেছেন "মুসলমানরা এসে এদেশের লোকদের হিন্দু বলে অভিহিত করলেন"। তার আগে "এদেশের কোন লোকই হিন্দু বলে পরিচিত ছিলেন না"। বক্তব্যটিকে নিখুঁত করে নিতে গেলে বলতে হয় "প্রাচীন কাল থেকে মধ্যপ্রাচ্যের লোকেরা এদেশেরে লোকদের 'হিন্দু' বলে অভিহিত করত। হিন্দু বলে এদেশে উদ্ভূত কোন নাম-ই ছিল না।" উচিত ছিল এই সত্যকে তার যুক্তিসঙ্গত পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া। তাহলে লেখককে বলতে হত "হিন্দুধর্ম বলে কোন ধর্ম ছিল না এবং এখনও নেই— হিন্দু এক সংস্কৃতি ও বহু ধর্মের সহ-অবস্থান সম্ভবী দর্শন"। এই সত্য উচ্চারণ করতে পারলে দেখা যেত কীভাবে দুই দিক দিয়ে এই সত্যের মুণ্ডচ্ছেদ করা হচ্ছে। যাঁরা একদিন বাইরে থেকে এ'দেশীয় সমূহ লোককে 'হিন্দু' নাম দিয়েছিলেন, তাঁরাই যখন বিজয়ীর বেশে এসে ভারত অবস্থান করতে লাগলেন, তখন নিজেদেরকে এই নামের বহির্ভূত রেখে এক কল্পিত, সীমিত-অর্থবোধক (restrictive) 'হিন্দুধর্ম' আবিষ্কার করলেন এবং নিজেদের খাড়া করলেন এই কল্পিত হিন্দুধর্মী সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে। এদেশে বিভিন্ন ধর্মের সহ-অবস্থানের মধ্য দিয়ে যে সমন্বয় গড়ে উঠেছিল, সে সংস্কৃতির চেয়ে বিজয়ীদের আপন ধর্ম শ্রেষ্ঠ, এই ছিল





মুসলিম বিজয়ীদের প্রত্যয়। ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই অভিমান তাঁরা কোন দিন ছাড়েননি। এই উচ্চমন্যতার ঘাতপ্রতিঘাত বহু শতাব্দী ধরে চলতে থাকল; কিন্তু ষোড়শ দশক থেকে শুরু করে অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে 'বিশুদ্ধ ইসলামে প্রত্যাবর্তন' ও শরিয়তি শাসনবাদের নামে যে আন্দোলন চলতে থাকল তার কী গভীর প্রভাব পড়েছিল মুসলমান ও অ-মুসলমানদের উপর, তা না বুঝলে সমন্বয়ী প্রবাহ কীভাবে রুদ্ধ হল তা বোঝা যাবে না। ফলে না বোঝা যাবে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে অবনতির কারণ, না পাওয়া যাবে মৈত্রী ও সৌহার্দ্যের দিশা।

ইতিহাসের পরিহাস এই যে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ভারতে এক প্রত্যাঘাতপন্থী শক্তি জন্ম নিল। তাঁরা প্রাচীন ভারতের গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করেন কিন্তু সে গৌরবের প্রকাশ করেন বিদেশির দেওয়া এই 'হিন্দু' নামের মধ্য দিয়ে। একদা অস্তিত্বহীন এই 'হিন্দু' নামের মোহ তাঁদের আবিষ্ট করেছে কিন্তু যে প্রাচীন ভারতের গৌরব তাঁরা করেন, তার অন্তঃপ্রকৃতিকে তাঁরা অগ্রাহ্য করেন। ভারতের গৌরবের মূলে ছিল সমন্বয়ী জীবনাদর্শের অন্তঃপ্রবাহী স্রোতধারা। নিরন্তর সংশ্লেষণ ও নিয়ত মৈত্রীসৃষ্টির মুক্তধারাই ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি, যাকে বিদেশির ভাষায় বলা যেতে পারে যে যুগের হিন্দুত্ব। বর্তমান যুগে সকল বিরোধের ঊর্ধ্বে উঠে কীভাবে সকল সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামি-র বাঁধন টুটে সর্বজনের আত্মিক উন্নয়ন করা যায়, তারই সাধনা হতে পারত হিন্দুত্বের ঐতিহ্য। সে প্রকার হিন্দুত্ব আর বিংশ শতাব্দী শেষার্ধে আপন শ্রেষ্ঠত্বঘোষী আত্মসন্তুষ্ট উগ্রচরিত্রের হিন্দুত্ব— এই দুইয়ের মধ্যে আকাশপাতাল তফাত। এক হিন্দুত্ব ছিল সঞ্জীবনীশক্তি, অন্যটি মৃত হিন্দুত্বের খোলস এবং বিপরীতধর্মী। তবুও স্বীকার করতে হবে যে এটি ছিল ইসলামের বিকৃতিপর্বে ধর্মহীন ধর্মধ্বজী উগ্রতার প্রতিক্রিয়া। লেখক এ সত্য উদ্ঘাটন করতে পারেননি। 'হিন্দু' নামের কারণে গড়ে ওঠা ভ্রান্তি (semantic confusion) তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করেছে।

নিঃসন্দেহে বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্মের বিকৃতিপর্বে তথাকথিত নিম্নবর্ণের উপর পুঞ্জীভূত অবমাননার ভার চাপিয়ে যে নিপীড়ন ছিল, সে-ই ছিল 'আদি পাপ' (original sin)। নিপীড়িত নিম্নবর্ণ থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের ঐতিহাসিক স্মৃতিতে (historical memory) এই অপমান তুষের আগুনের মতো জ্বলছে। এই পাপের সমূল বিনাশ আজও হয়নি। যতদিন জাত হিসাবে উঁচু-নিচুর বাছ-বিচার থাকবে, ততদিন এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। শুধু তা-ই নয়, মুসলমানদের মনে 'হিন্দু' বিধান সম্বন্ধে অভিযোগ থেকে যাবে। লেখক যে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের স্বাতন্ত্র্যবাদকে প্রধান দোষী হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন, তার সত্যতা এইখানে, এইভাবে।

লেখক যখন সম্প্রতিকালেও অর্থাৎ ঊনবিংশ, বিংশ শতাব্দীতেও—সাম্প্রদায়িক ব্যবধান বৃদ্ধির জন্য হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদকে প্রাথমিকভাবে দায়ী করেন, তখন ইতিহাসের সাক্ষ্য তাঁর বিরুদ্ধে যায়। মুসলমান সুলতানদের আমলে বাংলাপ্রদেশেও হাজার হাজার মন্দির ধ্বংসের স্মৃতি ও বলপ্রয়োগে ধর্মান্তরিতকরণের বেশ কিছু স্মৃতি যে হিন্দুদেরও historical memory-তে অন্তর্দাহ সৃষ্টি করে, সেদিকের গুরুত্ব তিনি খুব কমই দিয়েছেন। নিপীড়িতের স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরগ্রহণ, সুফি প্রভাবে ও উচ্চ রাজপদের লোভে ধর্মান্তরগ্রহণ মুখ্য কারণ হলেও বলপ্রয়োগও যে গৌণ কারণ ছিল, তা লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন (পৃ. ১২)। তবে বলপূর্বক হিন্দু স্ত্রী গ্রহণ ও মন্দির ধ্বংস যে কী গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল ও হিন্দুদের মধ্যে কী পরিমাণ ঘৃণার উদ্রেক করেছিল, তা তাঁর বিশ্লেষণে স্থান পায়নি।

আরও বড় কথা, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ নামীয় 'ইসলামী ধর্মসংস্কারী' আন্দোলন ছিল ঘোরতর হিন্দুবিরোধী। হিন্দুদের দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙ্গলে আল্লার কাছ থেকে গাজী-র চেয়েও বেশি পুরস্কার পাওয়া যায়, এই ছিল এ আন্দোলনের ভাষ্য। এ আন্দোলনের মূল প্রভাব পড়েছিল উত্তর ভারতে এ কথা সত্য; কিন্তু বাংলাও সে প্রভাব থেকে মুক্ত থাকেনি। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে সৌদি আরবে ওয়াহ্বি আন্দোলনের আদলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে ওয়াহ্বি আন্দোলন শুরু হল 'বিশুদ্ধ ইসলামের' নামে; কিন্তু তার সংজ্ঞাতেই বলা হল মুসলমানদের হাতে রষ্ট্রব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে না পারলে বিশুদ্ধ ইসলাম অসম্ভব। এটি ব্রিটিশকে তাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অ-মুসলমানদের উপর শরিয়তি ব্যবস্থা চাপানোর আন্দোলন ছিল। এহেন ধর্মসংস্কারে কোরানের মর্মবাণী 'স্রষ্টার সৃষ্ট সকল মানুষের জন্য প্রেম, বিভেদকারীদের বিচ্ছিন্নকরণ এবং প্রেমের ভিত্তিতে স্থাপিত শান্তির' স্থান ছিল না। কয়েক শতাব্দী ধরে সুফি ও ভক্তি আন্দোলনের প্রভাবে যে সমন্বয় (cultural usion) গড়ে উঠেছিল, তাকে 'ইসলাম-বহির্ভূত ও মুসলিমশাস্ত্রবিরুদ্ধ' আচার-আচরণ ঘোষণা করে পরিত্যাগের আহ্বান চলতে থাকল। এ আন্দোলন যে কী মারাত্মক বিভেদসৃষ্টিকারী ছিল, মুসলমান সম্প্রদায়কে ধর্মান্ধতার কোন্ তুঙ্গে নিয়ে গিয়ে সুফিবাদকে কার্যত কবর দিতে পারল, তা গ্রন্থকারের কাছে অজানা থেকে গেছে। তাই তিনি বলতে পেরেছেন: এ ছিল ধর্মসংস্কারের আন্দোলন; "এ আন্দোলন হিন্দুদের বিরুদ্ধে ছিল না।" (পৃ: ১৬)

এই আন্দোলন সাম্প্রদায়িকতার কী বিষ ছড়িয়েছিল, তা পাওয়া যায় আবুল মনসুর আহ্মদ সাহেবের "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর" গ্রন্থে। তিনি বলেছেন, ঊনবিংশ

শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে মৈমনসিং-এর সুদূর গ্রামে তিনি তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে যে সব পয়ার আবৃত্তি করতেন, তার মধ্যে যে পয়ারটি তাঁর "কচি বুকে বিজলী ছুটাইত এবং আজো এই বুড়ো হাড়ে যার রেশ বাজে, তা এই:

আল্লা যদি করে ভাই লাহোরে যাইব
হুথায় শিখের সাথে জেহাদ করিব।
জিতিলে হইব গাজী মরিলে শহিদ
জান্নের বদলে জিন্দা রহিবে তৌহিদ।"

[শৈলেশকুমার বন্দোপাধ্যায় প্রণীত "দাঙ্গার ইতিহাস (পৃষ্ঠা ৩০৩-৩০৪)] এটি কী ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িক জঙ্গিপনা, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কাজী আব্দুল ওদুদ ১৯৩৫ সালে "হিন্দুমুসলমানের বিরোধ" সম্পর্কে বিশ্বভারতীতে প্রদত্ত বক্তৃতায় প্রথমে ইসলামের সাম্যনীতির প্রতি প্রণতি জানাবার পরই বলেছেন "ধর্মাদর্শের কোন রূপই তার চরম রূপ নয়...ধর্মাদর্শ যদি একবার কোন সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপ লাভ করে, তবে তারও রূপান্তর সহজসাধ্য হয় না। এর দৃষ্টান্ত— বিপক্ষের সঙ্গে মুসলমানের সম্বন্ধ। সেক্ষেত্রে একবার যে তলোয়ারের সম্বন্ধ বড় হয়েছিল, তারপরএঁসে তলোয়ারকে কোষবদ্ধ করা দুঃসাধ্য হচ্ছে, যদি-ও হজরত মোহম্মদের বহু র্মে ও কোরাণে বিপক্ষের সঙ্গে প্রীতি অগ্রণণ্য হয়েছে, মুসলমান সভ্যতায়-ও মাঝে মাঝে এর মনোজ্ঞ প্রকাশ হয়েছে।" (শৈলেশকুমার বন্দোপাধ্যায় প্রণীত "দাঙ্গার ইতিহাস") অন্য ধর্মীয়দের বিরুদ্ধে এই তলোয়ার আস্ফালনই ধর্মে জঙ্গিবাদের সূচনা ও গত কয়েক শতাব্দীকালে নবতর বিচ্ছিন্নতাবাদের উৎস।

১৯৫৮ সালে প্রকাশিত ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত "Studies in the Bengal Renaissance" গ্রন্থে ওদুদ সাহেবের "The Mussalmans of Bengal" শীর্ষক যে প্রবন্ধ আছে, তাতে তিনি বলেছেন, বাংলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে নবজাগরণের (renaissance) ঢেউ জেগেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আর হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের (revivalism) ডাক এসেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। অপরপক্ষে মুসলমান পুনরভ্যুত্থানের (revivalism) ঢেউ জেগেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই এবং সেই ঢেউ আজও চলেছে। বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় জাগরণের প্রবক্তা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী ইমদাদুল হক, লুৎফর রহমান এবং ঢাকার 'বুদ্ধির মুক্তি' দল এই মুসলিম পুনরভ্যুত্থানের তথা বিচ্ছিন্নতাবাদের ঢেউ রুখতে পারেননি।

পরিউক্ত সাক্ষ্যসমূহে এ কথা স্পষ্ট যে মুসলিম অভ্যুত্থানবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ ভারতে 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ' বা হিন্দু অভ্যুত্থানবাদের প্রতিক্রিয়া নয়, এর ইতিহাস আরও প্রাচীন।

মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিম লগ্নে ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে বাদশাহের গোলন্দাজ বাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে হিন্দুনিধন, উত্তর ভারতে মুসলমানপ্রধান বেরিলি, লখনউ ও অন্যান্য শহরে ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু দশক ধরে লাগাতার দাঙ্গা, ১৮৫৭ সালে বাংলার হুগলি জেলায় মুসলমান জমিদারের নেতৃত্বে প্রতিআভঙ্গজনিত দাঙ্গা— এ সবই মুজাদ্দিদী, ওয়াহ্‌বি ও ফারেজি সংস্কারের ফসল। এই পটভূমিকায় বিচার করতে হবে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা খোলা মনে পড়লে ড: ইসলাম যে অর্থ আরোপ করেছেন, তা করা যায় না।

শরৎচন্দ্রের ১৯২৬ সালে লেখা প্রবন্ধের পটভূমিকাও বিচার্য। ১৯২০-র দশকে খিলাফতের অবশাস্তাবী ব্যর্থতার পর যখন মুসলিম নেতৃবৃন্দ তীব্র হিন্দুবিরোধে নামলেন এবং বিলাতে শিক্ষিত, কংগ্রেসের তদানীন্তন সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলি গোঁড়া মুসলমানদের চাপে ঘোষণা করলেন "ইসলামের অনুগামী হিসাবে, কোন হীন চরিত্রের মুসলমানকে অধিকতর চরিত্রবান কোন অমুসলমানের চেয়ে তিনি উচ্চতর স্থান দিতে বাধ্য, তা তিনি মহাত্মা গান্ধী পর্য্যায়ের হলেও", তখন মুসলিম-মানসের এই দৃঢ়মূল গোঁড়ামির বীভৎস রূপ দেখে শরৎচন্দ্র সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে বহু দশক অপেক্ষা করলেও হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঘটবে না, বরং ব্রিটিশ রাজশক্তি উত্তরোত্তর এই বিরোধকে বাড়িয়েই চলবে।

১৯২৬ সালে অবাঙালি মুসলমানদের উগ্র আক্রমণে কলকাতায় দাঙ্গার অভিজ্ঞতাও নিশ্চয়ই তাঁর তিক্ততা বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপরই তিনি লিখেছিলেন, "হিন্দুস্তান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুর-ই।" কী গভীর হতাশার আঁধারে এই লেখা শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, তা বোঝা দরকার।

এখানে 'হিন্দু' অর্থে হিন্দু-নামধেয় ধর্মীয় সম্প্রদায় ও সেই সঙ্গে যাঁরা হিন্দুস্তানকে মাতৃভূমি ও আপনার প্রিয়ভূমি বলে মনে করেন, তাঁদের সকলকে বোঝানো সম্ভব। মনে রাখতে হবে, একদা হিন্দু মানেই বোঝাত ভারতীয়। কার্ল মার্কস তাঁর প্রবন্ধে ভারতীয় বনাম ইউরোপিয়ান অর্থে "Hindoos versus Europeans" লিখেছিলেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ প্রথম জীবনে নিজেকে 'হিন্দু' বলে আখ্যাত করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের যুগে, "যাঁরা নিজেদের ভারতীয় মনে করতেন" তাঁদের হিন্দু বলার রেওয়াজ ছিল। অস্বীকার করে লাভ নেই, কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত অধিকাংশ মুসলমান আরব দেশকেই তাঁদের 'আপন ভূমি' মনে করতেন। এই কারণেই



শরৎচন্দ্রের পাচক ব্রাহ্মণ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করার পর নাম, পোশাক, আকৃতি ও প্রকৃতি বদলাতে পেরেছিল।

লেখক ড: নজরুল ইসলাম দেশবিভাগ-উত্তর পশ্চিম বাংলার তথা ভারতের হিন্দু নামধেয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে যে সব বেদনাদায়ক উক্তির শিকার হয়েছেন, তা দিয়ে পূর্বসূরীদের বিচার করলে ভুল করবেন। যে রামকৃষ্ণ পরমহংস সনাতনী হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টীয় আচারে সাধনা করে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে সব ধর্মই ঈশ্বর উপলব্ধির পথ, সেই রামকৃষ্ণকেও হিন্দু সাম্প্রদায়িক পুনরভ্যুত্থানের যন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করতেও তাঁর বাধেনি।

বর্তমান ভারতে হিন্দুর পুনরভ্যুত্থানবাদ (revivalism) যে ক্রমশ বৃদ্ধির পথে চলেছে, তার জন্য মুসলিম পুনরভ্যুত্থানবাদের কতখানি অবদান, সত্যনিষ্ঠ গবেষকের উচিত সে গবেষণাও করা। সাম্প্রদায়িকতা কাজ করে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো— একদিকের দোলনের প্রতিক্রিয়ায় আসে বিপরীত দিকে দোলন। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আঘাতে ভারতে পুঞ্জিত হচ্ছে আত্ম-ধ্বংসী সাম্প্রদায়িকতাবাদ। ভারতের মুসলমানদের পক্ষে প্রয়োজন এই আত্মজিজ্ঞাসা: কেন হিন্দু সংস্কৃতি, যা বিশ্বের উদারতম এবং সর্বাধিক সহিষ্ণু জীবনধারা বলে বরাবর স্বীকৃত ছিল, আজ অসহিষ্ণুতার কবলে বেশ কিছুটা কবলিত হয়েছে? ধর্মান্ধতার বাঁধন ছিঁড়ে রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলাদেশে কেন আবার ধর্মান্ধতার শক্তি জেগে উঠছে? প্রচলিত ইসলামের মধ্যে কী প্রবণতা আছে যাতে এই সঙ্কীর্ণ বিচ্ছিন্নতাবাদ কাজ করছে? এই কি কোরান-অনুসারী ইসলাম— না অন্য কিছু?

আর সমস্ত বাঙালিকে আজ আত্ম-অনুসন্ধান করতে হবে: যে বাংলা সুফিবাদ ও চৈতন্যদেব-পন্থী বৈষ্ণববাদের সংমিশ্রণে এক অনন্য সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল, যে বাংলায় আলাউল, সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ মুর্তজা, আকবর শাহ প্রমুখ কবি-দার্শনিকরা ইসলাম ও বৈষ্ণববাদী 'মানবপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেমের' মিল দেখিয়েছিলেন, আর বাউল লালন ফকির আত্মার আত্মদর্শনী, মানুষ-রতন-প্রচারী বিশ্বজনীন মানবতাধর্মী সংস্কৃতির আবাহন করেছিলেন, সেই বাংলা কি আবার এক সমন্বয়ী সংস্কৃতির উর্ধ্বলোকে উঠে পথ দেখাতে পারে না?

'হিন্দু' সমাজের মধ্যে এখনও অ-সাম্প্রদায়িক শক্তির যে বিপুল সংখ্যাধিক্য আছে, তাতে সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, যদি মুসলমান সমাজে কোরানের মৌলিক মূল্যবোধ-অনুসারী সংস্কার শুরু হয়, যদি একেশ্বরবাদের মূল মর্ম "একই স্রষ্টার সৃষ্ট সকল জীবের জন্য এবং বিশেষ করে সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেম, এবং মিলনের মধ্য দিয়ে শান্তি" বার্তার মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামে পথযাত্রা শুরু হয়, তাহলে হিন্দু সমাজে মুসলমানদের প্রতি অনুরাগের আবেগ প্রবল হয়ে উঠবে।

কিন্তু সমস্যা যে এখানেই। যে কোন মুসলিম দেশেই ইসলামের প্রেমপন্থী ও সর্বমানবের ঐক্য-অভিমুখী সংস্কার অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের পুনরুদ্ধার অত্যন্ত কঠিন। ভারতে এ কাজটি আরও দুরূহ।

সংস্কারমুক্ত মনে যিনিই কোরান পড়বেন আর তার মর্মবাণী আয়ত্ত করতে চেষ্টা করবেন, তিনিই স্বীকার করবেন যে কোরানের বাণী সহস্রাধিক বৎসর ধরে চাপা পড়ে আছে উমায়েদ, আববাসিদ থেকে শুরু করে বহু সুলতানবংশ (dynasty) প্রবর্তিত আচরণবিধির তলায় এবং হজরত মহম্মদের মৃত্যুর বহু যুগ পরে সঙ্কলিত বিভিন্ন শাস্ত্রজ্ঞের বিভিন্ন ব্যাখ্যাভিত্তিক হাদিসের অনুশাসনে। কোরানের চেয়ে শরিয়া বড় হয়ে উঠেছে। তা-ও চার পন্থার শরিয়া'র মধ্যে বাদবিচার আছে। যিনিই প্রচলিত ব্যাখ্যা ও আচরণবিধির উর্দ্ধে উঠে কোরানের উদারপন্থী ব্যাখ্যা করে বিশ্বমানবতাবাদের সঙ্গে যুক্ত করতে গিয়েছেন, তিনিই অসীম নিগ্রহ ভোগ করেছেন এবং প্রতিটি ব্যর্থতার পর গোঁড়ামি আরও শক্ত হয়ে চেপে বসেছে। ইসলামে ধর্ম ও রাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের বিধান ছিল, যাতে রাজাশাসন ব্যাপারে কোন ব্যক্তিই অধার্মিকতার আশ্রয় নিতে না পারে। কালক্রমে মুল উদ্দেশ্যের বিপরীতটিই ঘটে যায়। ক্ষমতায় আসীন সুলতানদের সুবিধামতো ধর্মের ব্যাখ্যাই উল্টে গিয়েছে বারে বারে। ইসলামে সংস্কারের নামে সুফিবাদকে তলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সাধারণ মুসলমান ভুলেই গিয়েছেন যে ইসলাম মানে শান্তি। আজকাল "কাফির" শব্দের কদর্থ করে বলা হয় ইসলামের আচরণে অবিশ্বাসী; এর প্রকৃত অর্থ 'স্রষ্টার একীকত্বে অবিশ্বাসী'। যাঁরা অদ্বৈতে, বিশিষ্ট অদ্বৈতে বিশ্বাস করেন, তাঁরা কেউই কাফির নন। জেহাদের অর্থ ছিল ধার্মিকতার কারণে যুদ্ধ। অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষে নীতিক প্রতিবাদও ছিল জেহাদ। আজ তার অপব্যাখ্যা করে অন্য ধর্মবিশ্বাসীর বিরুদ্ধে লড়াইকে বলা হয় জেহাদ, তা তারা একেশ্বরবাদী হলেও। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের হৃদয়ের মিলনের পথে বাধা হিন্দুদের মূর্তিপূজা। এ পুজো যে সপ্তম শতাব্দীতে আরবের পৌত্তলিকতা থেকে ভিন্ন, সে কথা আল-বেরুণি স্বীকার করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে 'হিন্দুরা মানেন যে ঈশ্বর এক, তবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাঁর প্রকাশ (manifestation) আর সেই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকের ব্যবহার; এবং মূর্তি শুধু একাগ্রতা লাভের সহায়ক বলে হিন্দুদের ধারণা।' আরবদেশে বিভিন্ন মূর্তিপূজক গোষ্ঠীর মধ্যে ছিল নিরন্তর সংঘর্ষ; মূর্তি যে প্রতীক-মাত্র, স্রষ্টা যে অভিন্ন— এ প্রকার কোন ধারণাই আরবদেশে ছিল না। সে জন্যই হজরত মহম্মদ এই সব অনৈকবাহী মূর্তিপূজার বস্তুগুলিকে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন।

মুসলমান সমাজে বিশ্বব্যাপী উম্মার (umma) একীকত্বের যে ধারণা, তা-ও ইসলামের মূল আদর্শের বিরুদ্ধেই কাজ করছে। ইসলামের জন্মলগ্নে অবশ্যই এই ধারণার প্রয়োজন ছিল। কোন ধর্ম, মতবাদ বা জীবনাদর্শের জন্মকালে একই পন্থার পথিকদের মধ্যে সুদৃঢ় যোগাযোগ ও ঐক্য থাকা প্রয়োজন। তা না হলে শক্তিশালী বিপক্ষদলের বিরুদ্ধতায় নতুন সঙ্ঘ ও আদর্শ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ব্যাপক বিস্তারের যুগেও যদি উক্ত ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের এবং প্রতিবেশী অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর খাড়া করে রাখেন, তাতে প্রতিবেশীর সঙ্গে বিদ্বেষ ও বৈরিতার সম্পর্ক বাড়তে থাকে। ফলে ধর্মবিস্তারের যে মূল লক্ষ্য, মানবের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ও শান্তি (ইসলাম) স্থাপন, তা বিনষ্ট হয়ে যায়। বিশ্ব-ইসলামীদের একীকত্বের অছিলায় মুসলমানরা ভারতে অ-মসুলমানদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনে বিমুখ হয়েছেন (মৌলানা আজাদ প্রমুখ নেতাদের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও) ; তাঁদের এক প্রভাবশালী অংশ এক তত্ত্ব খাড়া করেছেন যে "ইসলামে বিশ্বপ্রেম আছে, দেশীয়তা বা জাতীয়তাবাদের অবকাশ নেই।" এ শুধু আত্মপ্রতারণা, কারণ স্বয়ং পয়গম্বরের একটি বাণী ছিল "স্বদেশপ্রেম ধর্মীয় বিশ্বাসের অঙ্গ" ("হুব্বুল ওয়াতাল মিনাল ঈমান")।

"আমরা পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান এক জাতি (nation), আমাদের অন্য কোন জাতীয়তা থাকতে নেই", এ কথা শুধু ভারতেই প্রচারিত হয়েছে এবং এখনও মৃদুস্বরে প্রচারিত হয়। ইরান, ইরাক, সিরিয়া, জর্ডন, তুর্কি প্রমুখ সকল মুসলিম দেশেই তাদের নিজস্ব জাতীয়তা আছে। যেখানে মুসলিম শাসকের/সম্প্রদায়ের হাতেই একচ্ছত্র আধিপত্য আছে, সেখানে জাতীয়তাবাদের বিধান আছে, এরূপ এক অসার যুক্তি খাড়া করে হয়তো এদেশের মুসলমান ভাইরা নিজেদের সান্ত্বনা দেন। এই ভুল ধারণার ফল সকলের পক্ষেই খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। বহু অ-মুসলমানের মাঝে বসবাস করেন যে মুসলমান পরিবারবর্গ, তাঁরা সেই এলাকায়—সে একটা ছোট গ্রাম হলেও—হয়ে যান এক পৃথক জাতির (nation) কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিবেশী অন্য ধর্মাবলম্বীদের তখন মনে হয় 'ভিন্‌জাতি' (separate nation)। ভারতে যে দ্বিজাতিতত্ত্বের (two-nation theory) উদ্ভব হয়েছিল, তার মূল এই বিশ্ব-উম্মা একীকত্বের ধারণার মধ্যেই। তাতে অবশ্য ইন্ধন জুগিয়েছিল উচ্চবর্ণ হিন্দুদের ঘৃণা / তাচ্ছিল্য। দেশবিভাগের পরও এই দ্বিজাতিতত্ত্ব কত অসার এবং কী মারাত্মক ক্ষতিকর, সে সম্বন্ধে পরিকল্পিতভাবে ব্যাপক শিক্ষামূলক প্রচার, বিতর্ক ও আলোচনার ব্যবস্থা হয়নি। নেহরু প্রমুখ দেশনেতাদের মনে হয়েছিল, দেশবিভাগের বিহ্বলতার পর হয়তো এই ধারণা আপনা-আপনি লোপ পেয়ে যাবে। বাস্তবে তা ঘটেনি—ঘটা সম্ভব ছিল না। চেতনার গভীরে যে বিষবৃক্ষের মূল, তা এত সহজে চলে যায় না। ফলে 'ধর্ম পৃথক হলে, জাতীয়তা পৃথক হলে হতে পারে, আনুগত্যের হেরফের হতেই পারে', এ ধারণা মুসলিম সমাজের এক বৃহৎ অংশের মনে অস্পষ্টভাবে রয়ে গেছে। তাই এই বৃহৎ অংশ মুসলিম সত্তা ঘোষণার জন্য যতটা ব্যগ্র, ভারতীয় সত্তা প্রকাশের জন্য ততটা উৎসাহী নন। বহু মুসলিম দেশভক্ত দেশবিভাগোত্তর ভারতের রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের এই আত্মদানের ফলে বৃহৎ অংশের এই দোদুল্যমানতা চাপা পড়ে আছে, এ সত্য অস্বীকার করে কোন লাভ নেই। হিন্দু-মুসলমানের হৃদয়ের মিলনের পথে এই অব্যক্ত, অস্পষ্ট ধারণা এক দুস্তর বাধা।

পূর্বেই বলা হয়েছে, হিন্দু সমাজে যে সব সংস্কার প্রয়োজন (যথা জাতিভেদের সম্পূর্ণ বিলোপ, পুরোহিতের উপর সমর্পিত উপাসনাবিধি) তা সম্পন্ন করার ক্ষমতা এই সমাজের ভিতরেই আছে। 'হিন্দু' সমাজে বার বার সংস্কারকের উদয় হয়েছে ; এ ধারা চলছে এবং চলবে ; কিন্তু মুসলিম সমাজে কতকগুলি সংস্কার না হলে, শুধু যে 'হিন্দু' নামীয় সমাজে উত্তপ্তমস্তিষ্ক গোষ্ঠীর সংখ্যাবৃদ্ধি হবে, তাই নয়, মুসলমান সমাজের সাধারণ মানুষেরও আত্মিক ক্ষতি, শিক্ষায় অনুন্নতি এবং অশান্তির সম্ভাবনা থেকেই যাবে। শুধু সেই কারণেই মুসলমান বিচারধারায় যে সংস্কার একান্ত আবশ্যক—যে সংস্কার মুসলমানের হিতের জন্য এবং সার্বজনিক শান্তির জন্য আবশ্যিক—সেই প্রসঙ্গগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এক্ষণে আলোচনা করার চেষ্টা করব। ডঃ নজরুল ইসলাম তাঁর পুস্তকে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্তর্ভুক্ত না করার ফলেই বর্তমান প্রবন্ধকারকেই এই কর্তব্য সম্পাদন করতে হচ্ছে।

কোরানের ৩:৮৫ সূরার ভুল ব্যাখ্যা চলছে। কোরানের বাণীতে বলা আছে, যে ইসলাম গ্রহণ না করবে, তার গতি নেই। ইসলাম অর্থ শান্তি। সুতরাং যদি এর অর্থ করা হয় যে শান্তির বাণী যে গ্রহণ না করবে, তার গতি নাই, সে ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ সঠিক। কিন্তু যদি ব্যাখ্যা করা হয় যে ইসলামী উপাসনাবিধি ও বাহ্য আচার-ব্যবহার (rituals) যে গ্রহণ না করবে, তার গতি নেই, সে ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভুল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, পরোক্ত ব্যাখ্যার-ই প্রচলন বেশি। এরূপ ধারণার ফলে মাদ্রাসায় শিক্ষিত মুসলমানরা প্রায়ই ধারণা করেন যে অতি উন্নত চরিত্রের অ-মুসলমানরাও মৃত্যুর পর নরকে দগ্ধ হতে থাকেন। এ ধরনের বক্তব্য যে অন্য সম্প্রদায়ের মনে কী তীব্র বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে, তা সহজেই অনুমেয়।

মুসলিম সাধারণের ধারণা, পয়গম্বর হজরত মহম্মদ ঈশ্বরের শেষ দূত ; আল্লাহ্ ভবিষ্যতে অন্য কোন দূত পাঠাবেন না, ইসলাম চূড়ান্ত ধর্ম। কোরানেই বলা হয়েছে, আল্লাহ্ যুগে যুগে, দেশে দেশে তাঁর দূত পাঠিয়েছেন। তাহলে কি তিনি





ভবিষ্যতে তাঁর দূত পাঠাবার অধিকার চিরদিনের জন্য খর্ব করে দিয়েছেন? হজরত মহম্মদ latest অর্থাৎ সাম্প্রতিকতম হিসাবে নিশ্চয়ই সর্বশেষ দূত ; কিন্তু চিরকালের জন্য সর্বশেষ পয়গম্বর, এ ব্যাখ্যা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। তথাপি বর্তমান প্রবন্ধকার এক হিসাবে এই গোঁড়ামির ব্যাখ্যাকেও মেনে নিতে প্রস্তুত। শান্তি অর্থে 'ইসলাম' চূড়ান্ত ধর্ম। শান্তির চেয়ে বড় ধর্ম নেই। আর হজরত মহম্মদের পর কোন পয়গম্বর আসবেন না, এক অর্থে এ কথাও সত্য, কারণ বিজ্ঞানের প্রাবল্যের যুগে পয়গম্বর মারফত ঈশ্বরের বাণী আসবে না—আসবে কবি-দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকের ভাষ্য দিয়ে।

সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয়, কোরানের ৭:১৭৯ সূরায় ইজতিহাদের (যুক্তিভিত্তিক বিচারের) উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে যারা দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না, হৃদয় দিয়ে বিচার করে না, তারা পশুরও অধম। ইসলামিক শাস্ত্রে ও ইতিহাসে সুপণ্ডিত অধ্যাপক মুজিব বলেছেন "ভারতে তুর্কদের শাসনকাল থেকে মূল কোরাণ অধ্যয়নে এবং বিচারবুদ্ধি ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।" এই সব শাসকরা সাধারণ মুসলমানকে অজ্ঞতার কোন্ স্তরে রাখতে চেয়েছেন এবং কেন, সেটিই বিচার্য।

উপরিউক্ত ভ্রান্ত ধারণাসমূহের জন্য আজ ইসলামি জগত এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে যে লোকে ভুলে যাচ্ছে যে ইসলাম মানে শান্তি। ইসলাম মানে এখন দাঁড়িয়েছে নিরন্তর বিরোধ—অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে অনন্ত বিরোধ (যথা সাইপ্রাস, ইথিওপিয়া, সুদান) ; শিয়া-সুন্নি অন্তর্দ্বন্দ্ব ; আহমেদিয়া নিপীড়ন ; বাহাই নিধন ; এক মুসলিম দেশের সঙ্গে অন্য মুসলিম দেশের লাগাতার বিরোধ। পাকিস্তান-পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে বাংলাদেশ) যুদ্ধ ; করাচিতে মুজাহিদদের উপর নির্যাতন ; ইরান-ইরাক যুদ্ধ ; ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ ; আফগানিস্তানে প্রতিটি বংশের (race) সঙ্গে প্রতিটি বংশের যুদ্ধ ; আলজিরিয়ায় ও মিশরে অন্তর্বিরোধ ; সোমালিয়ার মুসলিমদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংঘর্ষ ; আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলে সমূহ মুসলিম-অধ্যুষিত এবং মুসলিম-প্রধান দেশগুলিতে—চাদে, মরিটানিয়ায়, সেনেগালে, নাইজারে—বিভিন্ন কারণে দীর্ঘস্থায়ী অন্তর্বিরোধ ইসলামের বিপরীত পরিচয়ের সাক্ষ্য বহন করছে। বিশ্বব্যাপী উম্মার ধারণা ধুলোয় লুটিয়ে গেছে। ইসলামের চেয়ে (শান্তির চেয়ে) tradition-কে বড় করলে এই রকমই হয়।

ভারতের মুসলমানরা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করলে তাঁরা যে শুধু ভারতের চিত্র বদলে দিতে পারেন তাই নয়, সমগ্র বিশ্বের ইসলামি দেশের সমস্যা সমাধানের পথ দেখাতে পারেন। অধ্যাপক উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ বলেছিলেন: "মুসলমানরা অন্য দেশে হয় শাসন করেছেন নয় শাসিত হয়েছেন। একত্রমাত্র ভারতে তাঁরা ক্ষমতার অংশভাগিতার অধিকারী।" সেই কারণেই যদি ভারতের মুসলমান ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করে, অভিমান ও ধর্মীয় উচ্চমন্যতা দূরে রেখে প্রেমের ভিত্তিতে শান্তিময় সমাজ গড়ে তুলতে অগ্রণী হন, তাহলে অন্য দেশের ইসলামি সমাজ দেখবে কীভাবে অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি, এবং আপন ধর্মভুক্ত অন্য গোষ্ঠির প্রতি প্রেমবর্ষণে ন্যায় ও শান্তির পথে এগিয়ে চলা যায়। ভারতের মধ্যে আবার বাঙালি মুসলমান অগ্রগণ্য হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। বাঙালির-ই এক অংশ—প্রতিবেশী বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ—যে অগ্নিদহনের মধ্য দিয়ে ধর্মান্ধতার বীভৎস স্বরূপ চিনতে পেরেছিল এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শিক্ষা পেয়েছিল, সে শিক্ষা, সে অভিজ্ঞতা এই উপমহাদেশে (ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে) আর কেউ পায়নি।

তবুও গঠনমূলক এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের কোন লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তার কারণ, মুসলমান সমাজে এখনও সঙ্কীর্ণদৃষ্টি উলেমার প্রভাব প্রবল ; মুসলমান সমাজের প্রভাবশালী অংশের (elite) মন-প্রাণ 'পৃথক সত্তা' (separate identity) প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত। সর্বভারতীয় স্তরে একটিও রাজনৈতিক দল নেই যে সত্যই সর্বধর্মসমন্বয় ভাবাপন্ন। কেউ নিরীশ্বরবাদী বলে ধর্মে বিশ্বাস নেই, তাই ধর্মসমন্বয়ের ব্যাপারে মাথা ঘামাবার দরকার বোধ করেন না ; কেউ সংখ্যালঘু সমাজের 'একমাত্র পরিত্রাতা' সেজে দু'মুখো সাপের ধরনে দু'পক্ষেরই সাম্প্রদায়িকতা ও বিরোধ কার্যত বাড়িয়ে তোলেন ; কেউ হিন্দুত্বের মৌলিক মূল্যবোধ কী তা স্পষ্টভাবে না জানিয়েই হিন্দুত্বের জিগির তোলেন ; কেউ সেকুলার ও দলিত-উদ্ধারী সেজে শাহি ইমামের তোয়াজ করেন ও 'সেকুলার' ফতোয়া বার করিয়ে নেন ; আবার কেউ এমনই প্রগতিবাদী যে কট্টর মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ দেখেও না দেখার ভান করেন, পাছে কোন মৌলভি 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার' অভিযোগ খাড়া করে বসেন। কেউ কেউ আবার এমন-ই সাম্যবাদী যে ভারতীয় জনতা পার্টি ও R.S.S.-এর সম্পর্ক ঠিক দেখতে পান এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা করেন কিন্তু ক্ষুদ্র মুসলিম লিগের সঙ্গে অতি-বৃহৎ, অতি-সম্প্রসারণশালী ও কোরানের অপব্যাখ্যাকারী জমাত-এ-ইসলামীর সংযোগ দেখতে পান না এবং সৌদি আরবের ডলারে পুষ্ট সেকুলার ভেকধারীদের আঁতাতও দেখতে পান না। এই ছলবাজি হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথ নয়। হিন্দু-মুসলমান সব মানুষকে সত্যই ভালবাসলে কঠোর সত্য বলার সাহস থাকে—মা যেমন গভীর ভালবাসায় সন্তানের রক্ষার জন্য কঠোর হতে পারেন।

দেশবিভাগের পর মুসলমান সমাজ যখন সংখ্যায় লঘুতর হয়ে রিক্ততার বিষণ্ণতায় পাকিস্তান দাবির লাভ-ক্ষতির হিসাব

মেলাতে আত্মসমীক্ষা শুরু করেছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী নেহরু ভাসা-ভাসা উদারতায় বলে বসলেন, "সংখ্যালঘুদের সাম্প্রদায়িকতা ততটা ক্ষতিকর নয়"। এ বক্তব্যে কোন প্রাজ্ঞতার পরিচয় ছিল না। যে কোন সাম্প্রদায়িকতা অন্য সাম্প্রদায়িকতাকে পুষ্ট করে। সুতরাং এই আপাত-উদার অসার ভাষণ মুসলমানদের আত্মসমীক্ষা বন্ধ করে দিল ও ভুল পথে নিয়ে গেল। তাঁরা One-upmanship রাজনীতির পথে মানসিক তৃপ্তি (Psychological compensation) খুঁজে পেতে চাইলেন। "সংখ্যায় কম হলে কি হবে, আমাদের কথামত দেশ চলবে, আমরাই তো balancing factor'"— এই হল স্বল্পদৃষ্টি উলেমার সান্ত্বনা। ফলে অন্য দিকে জন্ম নিল ত্রিশূলধারীর দল। তার প্রতিক্রিয়ায় উলেমা-প্রভাবিত মুসলমানরা এখন পথ নিল minority aggressivism-এর, সংখ্যালঘু হয়েও আগ্রাসনের। এ পথে শেষ পর্যন্ত তাঁদের অনেক বেশি ক্ষয়ক্ষতি হতে লাগল। একটি কথা মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা ভুলে যান বা চেপে যান। তা হচ্ছে, দুই দশক পূর্বে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রবিভাগ এক তদন্ত বসিয়েছিলেন, বিভিন্ন দাঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে। তদন্ত করেছিলেন বি.এস.রাঘবন — অত্যন্ত সৎ ও অপক্ষপাত ব্যক্তি হিসাবে যাঁর সুনাম অবিসংবাদিত। তাতে তিনি দেখেছিলেন বেশির ভাগ দাঙ্গা শুধু হয়েছিল সংখ্যালঘু আগ্রাসন থেকে — আদেরে তাঁরা হত হয়েছেন অনেক বেশি।

এ পথ বাঁচার পথ নয়। ইসলাম-নির্দেশিত পথও নয়। বহু দেশে নবজাগরণ এনেছিল সংখ্যালঘুরা। এদেশেও তা হতে পারে সৃষ্টিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিলে।

পণ্ডিত নেহরু আরও একটি ভুলের পথে সারা দেশকে নিয়ে গিয়েছিলেন। যে সময় প্রয়োজন ছিল harmonism -এর (সমন্বয়ের ও হৃদয় মিলনের)। সেখানে বিলাতি ধরনে তিনি বললে রাষ্ট্রের আদর্শ হবে সেকুলারিজম। সেকুলারিজম তো মাত্র ধর্ম থেকে রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ এবং বিভিন্ন ধর্ম থেকে রাষ্ট্রের সমদূরত্ব। এ তো স্রেফ নেতিবাচক; কী করা চলবে না, শুধুমাত্র তার-ই ঘোষণা। এতে ইতিমূলক সারবত্তার অভাব। যেখানে ধর্মের বিরোধ মানুষের হৃদয়ে এত গভীর ভেদ সৃষ্টি করেছিল যে দেশকেই ভাগ করতে হল, সেখানে প্রয়োজন ছিল পারস্পরিক বিশ্বাস, মৈত্রী ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা। তার জন্য প্রয়োজন ছিল শাস্ত্রসমূহে সুপণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে মতবিনিময়; নূতন আলোক সন্ধানে গোঁড়ামি-মুক্ত মনে ধর্মের মূল গ্রন্থগুলির পর্যালোচনা; প্রতিটি ধর্মের উৎসবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর অংশগ্রহণ ও প্রীতি বিনিময়। বর্তমানে শুধু রমজান মাসের ইফতারে ও ঈদে অন্য ধর্মাবলম্বীর অংশগ্রহণ আছে, ক্রিস্টমাসে হিন্দুদের অংশগ্রহণ আছে — তা ছাড়া আর কিছু নেই।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক আলোচনায় দু'টি সমস্যার উল্লেখ করতেই হয়। একটি ধর্মীয় কারণে গো-হত্যার অধিকার; অন্যটি বাবরি মসজিদ। কোরানে যদি গো-হত্যা আবশ্যিক বলা থাকে, তবে নিশ্চয়ই তা করতে হবে। তাছাড়া, যারা গো-হত্যা বন্ধ করতে গিয়ে ভ্রাতৃহত্যা করতে উদ্যত হয়, তারা ধার্মিক কাজ করে না। তবে মুসলমান সমাজকেও বুঝতে হবে যে, যে সুপ্রাচীন ভারতে সম্মানিত অতিথিকে আপ্যায়ন করার জন্য গো-শিশু বধ করার প্রথা ছিল, সে ভারতে কৃষি-বিস্তারের যুগে গো-হত্যা অভিনিন্দিত হতে লাগল কেন। কোন দেশের প্রথা সেখানকার পরিবেশের উপর নির্ভর করে। আরব দেশ ছিল 'মরুভূমির দেশ'; তার সভ্যতা মেষপালন ও বাণিজ্যভিত্তিক ও শহরধর্মী। ভারতবর্ষ কৃষিভিত্তিক। এর সম্পদ নির্ভর করে মাটি, শস্য উৎপাদক উদ্ভিদ ও লাঙ্গলটানা পশুর পারস্পরিক সম্পর্কের উপর। এদেশে পুষ্টির জন্য জন্যসংখ্যার বৃহত্তম অংশ নির্ভর করে গরুর দুধের উপর। আরও বহুবিধ কারণে হিন্দু গরুকে কল্যাণময়ীর আসনে বসিয়েছে। এখন সেটি ধর্মাবেগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আবেগকে বাদ দিলেও এ কথা সত্য যে, বলবতী গরুর সংখ্যা কমে যেতে থাকলে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই কৃষকদের এবং কৃষিনির্ভর জীবনধারার সমূহ ক্ষতি হবে। খ্যাতনামা সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'গোগ্রাস' গল্প এই সত্যেরই স্বীকৃতি। আবার অন্য দিকটিও বুঝতে হবে যে খাদ্যাভাবে গরুকে 'জীয়ন্তে মরা' অবস্থায় রাখা আর গো-হত্যার বিশেষ তফাৎ নেই। এজন্য জিদ আগ করে আলোচনার ভিত্তিতে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

বাবরি মসজিদ নষ্ট করা ধর্মদ্রোহিতার কাজ। তুলসীদাস-রচিত রামায়ণে বলা আছে 'শিবদ্রোহী কখনও রামকে লাভ করতে পারবে না'। অনুরূপভাবে, আল্লাদ্রোহী কখনও রামের আশীর্বাদ পেতে পারে না। হিন্দু সমাজের বিপুলসংখ্যক লোক এ কাজের তীব্র নিন্দা করেছে; কিন্তু সত্যের খাতিরে বলতে হয়, এ ব্যাপারে গোঁড়া মুসলিমদের দোষ কোন অংশেই কম নয়। এই মসজিদ নিয়ে বিরোধ আড়াইশো বৎসর ধরে চলে আসছে। অনেক মুসলমান যুবক অনেক আগে থেকেই বলে আসছেন, যে মসজিদের স্তম্ভে নারীমূর্তি আছে, তা মসজিদ হিসাবে ব্যবহারের অযোগ্য। ইসলামের বিধানে অন্য ধর্মের উপাসনাস্থলে মসজিদ সৃষ্টি অধর্মের কাজ। সুতরাং ধর্মত এক্ষেত্রে কোন মন্দির ছিল কি না, নিরূপণ করা ছিল প্রথম কাজ। কিছু পক্ষপাতী প্রত্নতত্ত্ববিদের কথা বাদ-ই দিলাম। ইচ্ছা থাকলে, বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে সে নিরূপণ সম্ভব ছিল। সে পথে মুসলমান নেতৃত্ব একেবারেই গেলেন না। তারপর অখিল ভারত শিয়া সম্মেলনের পক্ষ থেকে মি. জভেদ হবিব ইরাক দেশের পবিত্র নাজাফ সহরে অবস্থিত শিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু



আকা-ই আবুল কাশিম, মার্জা-আল-খোলার কাছ থেকে নির্দেশ পেলেন মসজিদ স্থানান্তর করার জন্য। শিয়ারা প্রস্তুত ছিলেন সাহানাওয়া গ্রামে উক্ত মসজিদের নির্মাতা মীর বাকীর সমাধির পাশে এই মসজিদ স্থানান্তর করতে। বাবরি মসজিদের তত্ত্বাবধান বরাবর শিয়া-দের হাতে। সুতরাং কোন মুস্কিল ছিল না। রাজীব গান্ধী সরকারের আমলে এক Memorandum of Understanding তৈরি হয়েছিল শিয়া নেতৃত্ব ও বিশ্বহিন্দু পরিষদের বিবাদ ভঞ্জনের জন্য। সুন্নি মুসলমানরা শিয়াদের উপর প্রবল চাপ দিতে লাগল এই প্রস্তাব ফিরিয়ে নিতে। শিয়া ধর্মগুরুর ফতোয়া অকেজো হয়ে রইল। সুন্নি নেতৃত্ব আর হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী — দুই দলই ক্ষমতাপসারী। দু'পক্ষের ক্ষমতা-পসরায় দেশে সাম্প্রদায়িকতার তিক্ততা অভূতপূর্বরূপে বেড়ে গিয়েছে।

তবু-ও এ মেঘ কাটবে। সাধারণ মানুষের শুভবুদ্ধি জেগে উঠে এই ক্ষমতার খেলা আর ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির অবসান ঘটাবে। হিন্দু-মুসলমান চাষির ও ভূমিহীন শ্রমিকের লড়াই, উভয় সম্প্রদায়ের ফাক্টরি শ্রমিকের লড়াই, সব ধর্মের দলিতদের ও নারীর সমান অধিকারের লড়াই সাম্প্রদায়িকতার কবর দিয়ে সম্প্রীতি রচনা করবে। তার সঙ্গে আপন পরিবেশ-সম্বন্ধিত চেতনা বিকাশের ফলে নিজের দেশের মাটি, জল-হাওয়ার গুরুত্ব সকলের কাছে বাড়বে, যার সংরক্ষণ সকলের মিলিত চেষ্টা ছাড়া অসম্ভব। ধর্মীয় শাস্ত্রসমূহের আলো সেই সম্প্রীতিকে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবে। তবে তার জন্য দরকার, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের হিন্দু সমাজের বহু ধারার (School) শাস্ত্রজ্ঞদের সাথে বাংলাদেশ, মরক্কো, সিরিয়া-জর্ডন, মিশরের এবং বিশেষ করে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উদারপন্থী শাস্ত্রজ্ঞদের চিন্তা-বিনিময়। বিদেশ থেকে এই চিন্তার প্রভাব না এলে এদেশে কট্টর শরিয়তপন্থীদের ধ্যানধারণা বদলাবে না, আর উগ্র হিন্দুত্ববাদীরাও থামবে না। প্রতীক্ষা করব এই শুভ আয়োজনের। □

# বুদ্ধিচর্চার দুই মহল

সৌরীন ভট্টাচার্য

শিবনারায়ণ রায়ের সব লেখাতেই কিছু ভাবনার খোরাক থাকে। তাঁর সব মত বা ঝোঁকের সঙ্গে সবাই নিশ্চয়ই একমত হবেন না, তবে মন দিয়ে পড়লে তাঁর রচনায় জিজ্ঞাসা কিছু মিলবেই এবং যাঁরা তর্ক-বিতর্ক পছন্দ করেন তাঁরা সে-অবকাশ পাবেন। আমার বিচারে প্রবন্ধ-সাহিত্যের এ এক বড় সার্থকতা। অবিতর্কসম্ভব সিদ্ধান্তে কোন ব্যাপারে কে আর কবে পৌঁছতে পেরেছে। আর আজকের দিনে সে-রকম নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের খোঁজ কে-ই বা করে। তা ছাড়া আধুনিক তত্ত্ব-মন তো অনবরতই আমাদের এ কথা জপাচ্ছে যে ধ্রুবত্বের সন্ধানে মেতে থেকে খুব লাভ নেই, তাতে হয়তো প্রবঞ্চনাই বাড়ে। নদীর যে-সব ঘাট একদিন দূর থেকে মনে হয়েছিল স্থির আশ্রয় দেবে, দেয়নি। আবার তো সেই নদীতেই ভাসা, ঘাট থেকে ঘাটে ভেসে চলা। কোথাও কিছু স্থির আছে কিনা, নিশ্চয় আছে কিনা কে জানে। অনেকেই তো বলছেন সম্ভবত নেই। কোন শক্ত ভিতের উপর কোনও কিছু দাঁড় করানো যায় কিনা, এ-প্রশ্ন জোরালভাবে উঠছে। অনেক ভাবুক মানুষই আজ মাথা ঝাঁকিয়ে বলছেন, না, যায় না। দাঁড়াবার মতো শক্ত ভিত না পেলে যাঁদের গা ছম ছম করে, তাঁদের অস্বস্তি সত্যিই কাটানো যাচ্ছে না। অনেকেই আজ প্রশ্ন তুলছেন, ওপর, নিচ, ডান দিক, বাঁ দিক, সব দিকেই তুলছেন। উত্তর যে কোথাও খুব মিলছে, তা নয়। তবু প্রশ্ন উঠছে, প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। কথাবার্তা চলছে, সংলাপ এগোচ্ছে। অনেকের কাছে এই ব্যাপারগুলোই খুব বড় ব্যাপার। কথা যে এখনও একেবারে থেমে যায়নি, অনেকের কাছেই এটা খুব জরুরি। বিশেষত, 'কথা কম, কাজ বেশি'-র দাপটের দিনে কথাকে অনেকেই যত্নে বাঁচিয়ে রাখতে চান। দমকা হাওয়ায় কথা নিভে না যায়, হাতের আড়াল দিয়ে কথাকে তাই আগলে রাখতে হয়। কথাকে প্রায় কাজের বিপরীতে দাঁড় করাবার এই আহ্লাদ অনেকেরই প্রশ্রয় পাবে না। কারণ তাঁরা তো কাজকেই প্রায় কথার বিকল্প হিসেবে সাজিয়ে তুলেছেন। আর প্রযুক্তিতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের যোগসাজশে এতে করে যে সামাজিক বিপদ ঘনায়, তাতে যাঁরা ত্রস্ত বোধ করেন তাঁদের কথা বন্ধ করলে কিছুতেই চলে না। আলোচ্য বইকে উপলক্ষ করে তাই কথা তোলা যাক। সংলাপরচনার চেষ্টা করা যাক তিন পক্ষকে জড়িয়ে: আমি, এই বইয়ের গ্রন্থসমালোচক; লেখক, এই বইয়ের প্রণেতা আর আছেন এ-বইয়ের পাঠক। এই সংলাপে সম্ভাব্য চতুর্থপক্ষও একজন সম্ভব— এই গ্রন্থসমালোচনা নিবন্ধটি যিনি পড়ছেন, যদি তেমন কেউ থাকেন। আলাদা আলাদা করে এঁদের সবার পরিচয় নিতে হবে।

যে-উপলক্ষে এই সংলাপ সেই বইটির অন্তত বহিরঙ্গ পরিচয় আগে নেওয়া যাক। তেরোটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের এক সংকলন এই বই। বিচ্ছিন্ন বটে, তবে একেবারে বিশ্লিষ্ট তা নয়। অর্থাৎ, আলোচ্য বিষয়, ঝোঁক, মেজাজ, এ সবের দিক থেকে ভেতরের মিল খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত নয়। নানা সময়ে, নানা বিষয়ে, নানা প্রসঙ্গে লেখাগুলি হয়তো গড়ে উঠেছিল, তা সত্ত্বেও এদের মধ্যে একটা গোটা চেহারা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আজ আর এ ব্যাপারটা শুধু অস্বাভাবিক নয় রীতিমতো স্বীকৃত এক পদ্ধতি। অনেক ক্ষেত্রে মনে হয় বুঝি বা অনিবার্য। ঐ যে অতদিন আগেই এক কবির মনে হয়েছিল, মহাকাব্য সংরচনে নাববার কথা মনে থাকলেও নাবা হয়নি। শুধুই কি ব্যক্তি-ব্যর্থতা তার জন্য দায়ী? ক্ষমতার কোনও অপচয় কি তার একমাত্র কারণ? নাকি মহাকাব্য কোন অভাব্য দুর্ঘটনায় কণায় কণায় পায়ের কাছে ছড়িয়ে গেছে, তার হিসাব নেওয়া আজ জরুরি? গায়ে গতরে মোটাসোটা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ যাকে বলে, তার জন্য যে-সম্পূর্ণতার আয়োজন দরকার, তার সন্ধান আজ কে দেবে। আজ তাই অনেক ভাবুকের রচনাই খণ্ড টুকরো থেকে গেঁথে তোলা। আজ এখন এই সময়ের আবহটা ছুঁতে গেলে এই পদ্ধতির দিকে বাঁকা চোখে তাকালে চলে না। গ্রন্থ বা তার অন্তর্গত প্রকল্প পূর্ণাঙ্গ হতে গেলে নিশ্চয়ই তা গায়ে গতরে সত্যি সত্যি মোটাসোটা হবার দরকার করে না। কিন্তু পূর্ণতার প্রয়োজন পড়েই। আর ঐ পূর্ণতাকে পেতে গিয়ে, তাকে গড়ে তুলতে গিয়ে প্রান্তবর্তিতাকে বড় অবহেলা করা হয়ে গেছে। আজ তাই অনেকেরই নজর প্রান্তের দিকে। তাই প্রান্তে দাঁড়িয়ে বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সংকলনকে স্বাগত জানাতে দ্বিধা নেই। আর এ-সংকলনে মিলের সূত্র খুঁজে পাওয়া মোটেই শক্ত নয়।

মিলের সূত্র তো বইয়ের শিরোনামেই আছে। 'স্বদেশ সকাল স্বজন', এই স্ব-ত্বই তো সেই প্রধান মিলের সূত্র। সেই সুবাদে আমরা ধরেই নিতে পারি যে এই সব রচনার এক বড় অংশ হবে আত্মজৈবনিক। নিজের দেশ, নিজের সময় ও নিজের লোকদের চিনে নিতে চান লেখক। আত্মজিজ্ঞাসার পথে এই চেনা যে কত জরুরি আধুনিক সামাজিক মন তা জানে। উৎসের দিকে যাত্রা শুরু করতে হয়। জগদীশচন্দ্রের সেই যে সন্ধান, 'গঙ্গা, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?', সেই একই প্রশ্নাতুর



মন নিয়ে আত্মবোধের উৎসে পৌঁছবার চেষ্টা করতে হয়। তাই শুরুতেই আশা জাগে। 'সাহিত্যচর্চা: সূচনাপর্ব' এই নামের প্রথম প্রবন্ধের প্রথমেই পাই: "সাহিত্য শব্দটির সঙ্গে পরিচয় হবার অনেক আগেই সাহিত্য ব্যাপারটির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তখনো রাত্রির অবসান হয়নি, আকাশে গাঢ়নীল সোনালির ঈষৎ আভাস, আধা ঘুম আধা জাগরণের বিহ্বল অন্তিম প্রহরে বিছানায় শুয়ে কানে আসত উদাত্ত কণ্ঠের বেদমন্ত্রপাঠ।" লেখকের পিতা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রীর 'ছন্দনিবিড় উচ্চারণ' শুনে তাঁর 'চক্ষু এবং চেতনার উন্মীলন' ঘটেছিল। এই উৎস থেকে লেখককে দীর্ঘ যাত্রায় অনেক পথপরিক্রমা করতে হয়েছে। তাতে অনেক মানুষ তাঁর সহযাত্রী, তাঁদের চিনতে চিনতেই তিনি দেশকে চিনেছেন, বিশ্বকে চিনেছেন, বিশ্বের মাঝে নিজের দেশকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন, আবার কখনও দেশের ভৌগোলিক সংজ্ঞাও হয়তো লুপ্ত হয়ে গেছে। এই মানস-যাত্রায় খুঁজে পেয়েছেন স্বজন। খুঁজে পেয়েছেন মানে ছিলেনই? হারিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা? তাঁদেরই ফিরে পেলেন আবার? না, ব্যাপারটা বোধ হয় এত স্থানু নয়। তাঁর যাত্রার পর্বে পর্বে বিভিন্ন মানুষকে স্বজন-সম্বন্ধে গড়ে নিতে হয়েছে। এই গড়ে নেবার মধ্যে যে-আত্মোৎসরণ আছে তাতেই তাঁর হয়ে ওঠা। চলিষ্ণু মন চলিষ্ণু বিশ্বে পথ খুঁজে নিতে চেয়েছে স্বজন-সমবায়ে। এমনই এক ছবিই লেখক ফুটিয়ে তুলতে চান এই সংকলনের বিভিন্ন প্রবন্ধে। তাঁর এই স্বজন-তালিকায় যাঁরা আছেন, তাতে অনেক তীর্থঙ্করের ঈর্ষা-উদ্রেক স্বাভাবিক। আছেন মানবেন্দ্রনাথ রায়, এলেন রায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, এডিথ সিটওয়েল থেকে মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশ্র আদিবাসী ছাত্রছাত্রী পর্যন্ত অনেকেই। এঁরা সবাই লেখককে কিছু না কিছু খুঁজে পেতে সাহায্য করেছেন, তাই এঁরা সকলেই তাঁর স্বজন।

স্বদেশ-স্বকাল-স্বজনের বিন্দুতে দাঁড়িয়ে বিচিত্র বিষয়কে স্পর্শ করেছেন লেখক এই তেরোটি প্রবন্ধে। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা, বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষার স্বরূপ থেকে আরম্ভ করে শৈলবালা ঘোষজায়ার উপন্যাস 'শেখ আন্দু', অস্ট্রেলীয় আদিবাসী লেখক মাড্‌রুরু নারোজিন-এর কাব্যগ্রন্থ 'ডল্‌উররা', ক্যারিবীয় কবি ডেরেক ওয়ালকটের 'ওমেরস' এবং ঘানার প্রাবন্ধিক কোয়ামে অ্যান্টনি আপপিয়ার 'ইন্‌ মাই ফাদারস হাউস'-এর মতো নিবন্ধগ্রন্থ নিয়ে আলোচনার ব্যাপ্তি পাওয়া যায় এই বইয়ে। বিষয়বৈচিত্র্যে ধরা পড়ে নাস্তিকের মৃত্যুচিন্তা ও সাহিত্যিকের 'দায়বদ্ধতা' বা দায়িত্বের মতো প্রসঙ্গও। নির্দিষ্ট প্রবন্ধের উল্লেখ বাদ দিয়ে যদি প্রসঙ্গের দিকে তাকাই, তাহলে দুটি প্রসঙ্গকে আমি কেন্দ্রীয় বলে চিহ্নিত করতে চাই। যুক্তিবাদ, নাস্তিক্য, বুদ্ধির মুক্তি বা মুক্তবুদ্ধির চর্চা, ইতিহাসের ও সমাজের প্রগতি ও আনুষঙ্গিক ভাবনা এইসব নিয়ে লেখকের এক অতি প্রিয় প্রসঙ্গ। আর এই বইয়ে তাঁকে বেশ নতুন করে পাচ্ছি নারীচেতনায়। এ-দুটি গেল প্রধান উপস্থিত প্রসঙ্গ। এই সঙ্গে আমি একটি অনুপস্থিত প্রসঙ্গেরও উল্লেখ করতে চাই। এটা একটু অদ্ভুত মনে হতে পারে। প্রসঙ্গ হিসেবে অনুপস্থিত বলে আমি কোনও অভিযোগ তুলছি না, কেনই বা তুলব? কোন লেখকের কোনও দায় নেই যাবতীয় প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করার। তা সত্ত্বেও এ-বিষয় নিয়ে কথা তুলব এই জন্য যে, লেখকের চিন্তার বা মনের আদল পেতে গেলে কী নিয়ে তিনি কী-কথা বলেন তা যেমন দেখতে হয়, তেমনই কী নিয়ে তিনি কথা বলেন না তার দিকেও খেয়াল রাখতে হয়। আসলে কথা ও নীরবতা এ-দুইয়ের নক্সাতেই ধরা থাকে ব্যাপারটা। যে-অনালোচিত প্রসঙ্গের আমি উল্লেখ করতে চাই তা হল পরিবেশ। ভাবুক লেখককে ভাবনায় উস্কে দেবার জন্যই এভাবে কথা বলছি।

সংলাপের কুশীলবের কথায় আসা যাক এবারে। সম্ভাব্য চার পক্ষের এক পক্ষ এই গ্রন্থের সমালোচক, যিনি প্রশ্ন তুলছেন, অন্তত তোলবার জন্য ঘুঁটি সাজাচ্ছেন, তিনিই তো এই সংলাপের 'আমি'। শুধু এটুকু বললে তো কিছুই বোঝা গেল না, জানাও গেল না। বড়জোর বিতর্কসভার নিয়ন্ত্রকের নামটা ঘোষণা করা হল মাত্র। প্রশ্নই যদি সংলাপের সঞ্চালনা হয়, তাহলে জানতে হবে প্রশ্নগুলো কোন অবস্থান থেকে তোলা হচ্ছে, কোন উদ্বেগই বা কাজ করছে তার পেছনে। তা না হলে কিন্তু সেসব প্রশ্ন কোনও সামাজিক মাত্রা পাবে না। কুইজ-প্রতিযোগিতায় তো কত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করা হয়। ভাবলে দেখা যাবে যে সেসব প্রশ্নের চারপাশে এক সামাজিক শূন্যতা, কোন উদ্বেগের চাপ থেকে উঠে আসছে না ঐ সব প্রশ্ন। কোনও সংলাপের দায় নেই ঐ প্রশ্নমালায়। তাই সংলাপের 'আমি'-র আমিত্বের বিচার কিন্তু জরুরি। প্রায় অনুরূপ এক অবস্থায় লেখককেও একবার ছুঁয়ে যেতে হয়েছে এই 'আমি'-ত্বের কথা। "আমার জার্নাল থেকে অসমাপ্ত খসড়ার পূর্বোক্ত অংশটি একটি ত্রৈমাসিকে প্রকাশিত হবার পর আমার একজন দার্শনিক বন্ধু বললেন, আরে তুমি তো আসল প্রশ্নটাই দেখছি এড়িয়ে গেলে। তুমি যে 'আমি', 'আমার' লিখছ, এই আমিটাই কি 'আত্মা' নয়? না হলে তোমার আমিটা কী বস্তু? না, এ প্রশ্ন এড়াতে চাইনি।" (পৃ. ২২৭) এখান থেকে শুরু করে চারটি সংলগ্ন ধারণার বিশ্লেষণে পৌঁছে যান লেখক। ধারণা চারটি হল: সেল্‌ফ্‌, সৌল, ইন্‌ডিভিডিউয়্যাল আর পার্সন। মোটামুটিভাবে লেখক সৌলকে আত্মা বলছেন আর সেল্‌ফ-কে আমি। ইনডিভিডিউয়্যালিটির জন্য ব্যক্তিতা আর পার্সনালিটির জন্য অস্মিতা। আপাতত শব্দগুলির গুণাগুণ বিচারে যাচ্ছি

না। সেল্‌ফ-অর্থের আমি-কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখছেন: "সুতরাং আমার গদ্যরীতি বিষয়ে দুর্নামকে আপাতত অগ্রাহ্য করে পূর্ববর্ণিত সেল্‌ফ্ অর্থে একটি অপ্রচলিত (হয়তো বা আমারই উদ্ভাবিত) শব্দকে নির্বাচন করছি: শব্দটি 'প্রতিস্ব'।" (পৃ. ২২৯) প্রসঙ্গত, 'প্রতিস্ব' ঠিক কী অর্থে 'আমারই উদ্ভাবিত'? 'প্রাতিস্বিক'-এর মধ্যে তো 'প্রাতিস্ব' আছে, 'প্রতিস্ব'-ও কি নেই? তা সে যাই হোক। আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এই সংলাপের 'আমি'-পক্ষ নিশ্চিতভাবে সমাজশাসিত, সময়পীড়িত, বর্তমানে দৃঢ়মূল, কোনওরকম ঊর্ধ্বযাত্রার দাবি তার নেই। আছে শুধু ইতি উতি তাকাবার অবান্তর কৌতূহল, আর নিজের রুচি ঝোঁক প্রবণতা ইত্যাদি বিষয়ে কিছুটা খুঁটিয়ে দেখার আগ্রহ এবং সে-বিষয়ে ভান না করার বিনীত চেষ্টা। অর্থাৎ, যা-কিছু দেখাশোনা বলাকওয়া ঝগড়া-বিতর্ক তার পেছনে যে এইসব ঝোঁক-প্রবণতার প্ররোচনা সত্যিই থাকে বা থাকতে পারে এই সহজ কথাটা সরলভাবে মেনে নেওয়া। অনেক সময়ে আমরা যুক্তিসিদ্ধ, বৈজ্ঞানিক পন্থায় প্রমাণিত ইত্যাদির দোহাই পেড়ে যে-নিশ্চিতির সন্ধান করি তার পেছনেও হয়তো দুনিরীক্ষ্যভাবে এইসব 'অবৈজ্ঞানিক' মনোভঙ্গির ছায়াপাত ঘটে। অনেক সময়ে প্রাক্-বৈজ্ঞানিক এই স্তরটাকে মতাদর্শের এলাকা বলে আমরা চিহ্নিত করে থাকি এবং তাকে বৈজ্ঞানিকতার স্তর থেকে কিঞ্চিত নিচু স্তরে নির্বাসন দেবার কথা ভাবি। এই উঁচু-নিচুর স্তরভেদ মানতেই ঐ 'আমি'-পক্ষের যত আপত্তি। যদি এমন হয় যে 'অবৈজ্ঞানিকতা'য় আদল গড়ি আর 'বৈজ্ঞানিকতা'য় যুক্তি সাজিয়ে তার রূপ বানাই তাহলে তাই মেনে নিতে হবে, কী আর করা যাবে। অবয়বের ভেতরে যদি শক্ত কাঠামো নাই থাকে কিছু, তবে যা আছে তাই দিয়েই কাজ চালাতে হবে। উচিত-অনুচিত বা ভালমন্দের বোধ, জমি হিসেবে খুব শক্ত না হতে পারে, তবে খুব জরুরি। তত্ত্ব-অবয়ব অনেক সময়েই দাঁড়ায় তারই ওপর। এ কথাটা সহজভাবে মেনে নেবার সুবিধা এই যে, তাহলে কী দেখতে চাই, কী বলতে চাই আর কেন, তার নৈতিক জোর পাওয়া যায় আর তা স্পষ্ট থাকে। এর জন্য অপরাধবোধের কোনও কারণ নেই।

ঠিক এই জায়গায় পৌঁছে সংলাপের 'আমি'-র তরফে বুদ্ধিচর্চার দুই মহলের কথাটা তুলতে চাই। এই সংকলনের শেষ প্রবন্ধে লেখক সাহিত্য-প্রবাহে যে-দুই মোহানার কথা তুলেছেন আমাদের দুই মহল কিন্তু একেবারেই সে ধারণাভিত্তিক নয়। ঐ মোহানার একটিকে বলা যাক রসসাহিত্য, আর অন্যটিকে মনন-সাহিত্য। এরকম ভেদাভেদের কোন মানে আছে কিনা সেটা অন্য প্রশ্ন। আমাদের প্রস্তাবিত দুই মহলের ধারণা সাহিত্যের কোন বিভাগ-বিভাজন নয় আদৌ। সব বিভাগের সাহিত্যেই এই মহলচিন্তা প্রাসঙ্গিক হতে পারে। শুধু বুঝে নিতে চাই কোন রচনা মুখ্যত কোন মহলের। এই মহল-বিভাজন বস্তুত যাপনের বিভাজন। আমরা আমাদের যাপনের মধ্য দিয়ে মূলত এক এক মহলের বাসিন্দা হয়ে উঠি। আর যাপন বলতে শুধুমাত্র বস্তুগত অর্থে জীবনধারণের কথা ভাবছি না। ভাবনার জগৎ, বোধের জগৎ আর আগ্রহের জগৎ সমেত আমার সমস্ত জীবনকাহিনী আমার যাপনের অন্তর্গত। আর সেই যাপনে আমি কখনও এমনভাবে এক গণ্ডি টেনে নিতে পারি, যাতে গণ্ডির এপার-ওপার করা আর একেবারেই সহজ হয় না। আমি আস্তে আস্তে আটকে যাই এক মহলে। হতেই পারে সেই মহল যথেষ্ট ঋদ্ধ। সে-মহলের সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত দর্শন বিজ্ঞানের যা সমৃদ্ধি তাতে আমার সারা জীবনের পুষ্টির সঞ্চয়। কিন্তু মনে রাখা ভাল যে এমন ঋদ্ধ জীবনেও যাপনের শূন্যতা ছুঁয়ে যেতে পারে। শিল্প দর্শন বিজ্ঞানের ঐ সব মহৎ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তেমন করে তাকাতে শিখলে দেখতে পাব যে ঐ অন্য মহলের দিগন্ত সেখানে ঠিকই ধরা পড়ে। কিন্তু তেমন করে তাকাতে তো শিখতে হবে। এই শেখার জন্যই তো চাই তার উপযুক্ত যাপন। জীবনের কোন আকস্মিক হয়তো এই যাপনকে সাহায্য করতেই পারে। কিন্তু গণ্ডি পেরোতে হবে যাপনের মধ্য দিয়েই। জমিদারি-পরিদর্শন কিংবা পদ্মাবাস জীবনের সেই আকস্মিক। তারপর চাই যাপন, যা দিয়ে পৌঁছনো যায় সেই অনির্বচনীয় গল্পগুলির জীবনবৃত্তে। বুদ্ধিচর্চার এই দুই মহলে চর্চার স্বার্থেই জরুরি হতে পারে, কিন্তু কেন জরুরি তার উত্তর তো সেই 'অবৈজ্ঞানিকে'। সংলাপের 'আমি' প্রশ্ন তোলে দুই মহলেই।

এবার লেখকের কথা। লেখক মানে তো এই আলোচ্য বইয়ের লেখক, তবে শুধু সে-বইয়ের লেখকই নন তিনি। এই সংলাপের যিনি লেখক তিনি আরও অন্যান্য গ্রন্থের প্রণেতা, তাঁর চিন্তাভাবনার ধরনটা আমাদের পরিচিত, তাঁর রাজনৈতিক-সামাজিক বিশ্বাস-অবিশ্বাস আমাদের অগোচর নয়, তাঁর সাহিত্যরুচি, বিদ্যাপ্রবণতা, ধর্মেকর্মে অনাসক্তি, গদ্যরীতির বিশিষ্টতা সমেত সবকিছু নিয়েই তিনি আমাদের কাছে মূর্তিমান। বস্তুত, তা না হলে তো সংলাপে তিনি হবেন আগন্তুক, অপরিচয়ের আড়ষ্টতায় কথা তো তেমন করে জমবেই না তাহলে। আধুনিক তাত্ত্বিকের ভাষায় ঐ সবকিছু চেনাজানা নিয়ে তৈরি হয় এক লোককথা। এই লোককথার সত্যিমিথ্যে বলে কিছু নেই, আছে তার অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের কথা। লোককথার মধ্যেই লেখকের মূর্তি / মূর্তিটা গড়ে উঠছে লোককথার মধ্য দিয়ে, আর লোককথা রূপ নিচ্ছে মূর্তিকে ঘিরে। এই প্রক্রিয়াটা চলেছে। যত বড় মাপের লেখক, তত টগবগে এই প্রক্রিয়া, অথবা এই প্রক্রিয়া কত টগবগে তার মধ্য দিয়ে অন্তত অংশত



নির্ধারিত হয় একজন লেখকের মাপ। সব লেখকেরই আছে কোন এক মাপ আর তাঁকে ঘিরে থাকে লোককথার কোন এক বলয়। একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ হয় নতুন লেখক আর তাঁর প্রথম বই। সেই মুহূর্তে তাঁর মাপ ও তাঁর লোককথা দুই-ই আছে সুপ্ত অবস্থায়। অকস্মাৎ মৃত্যু হলেই যে এই মাপ ও লোককথার নির্মাণে ছেদ পড়ে তা কিন্তু নয়। বস্তুত ঐ প্রক্রিয়া চলতেই পারে, অনেকক্ষেত্রেই তা যথেষ্ট সচলভাবেই চলে। সুকান্ত-জীবনানন্দের উদাহরণ তো হাতের কাছেই রয়েছে। লেখক শুধু তাঁর লেখার মধ্যে নেই। জড়িয়ে আছেন সব কিছুতে, আবার ঐ সামগ্রিক যাপনে। খ্যাতি-অবহেলা কিংবা কলঙ্ক-নিন্দাপঙ্ক সবই ঐ সামগ্রিক যাপনের অঙ্গ। সংলাপের লেখক এমনি সবার পরিচিত।

তৃতীয় পক্ষ পাঠক। তাঁর চরিত্র নিয়ে বেশ মুশকিল আছে। তিনি কি লেখক বা গ্রন্থসমালোচকের থেকে মূলত আলাদা? তিনি কি কখনোই লেখক বা গ্রন্থসমালোচক নন? এই বইয়ের না হয় তিনি পাঠক, অন্য সময়ে অন্য বইয়ের তিনি লেখক কি? তা যদি হন, তাহলে তাঁরও তো আছে কোন মাপ ও লোককথার কোন বলয়। কিন্তু সেই মাপ তো লেখক হিসেবে, সেই লোককথা তো একজন লেখকের। তার মানে কি এই যে শুধুমাত্র পাঠক হিসেবে তাঁর কোনও স্বীকৃতি নেই? পাঠক হিসেবে কোন মাপ বা পাঠক হিসেবে কোনো লোককথার ভাবনা কি একেবারে অবান্তর? তা কেন হবে? আমাদের চেনাজানা অভিজ্ঞতায় শুধু পাঠক, মুখ্যত পাঠক, এ চরিত্র কি নেই? নিশ্চয়ই আছেন, অন্তত থাকা সম্ভব। এবং পাঠক হিসেবেই তাঁর অস্তিত্ব রীতিমতো সদর্থক। সেই স্বাধিকারেই তিনি প্রশ্ন তুলতে পারেন। এ-প্রশ্নের লক্ষ্য লেখক হিসেবে তাঁর কোন প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত হবে না। বস্তুত লেখক-না-হবার স্বাধীনতা তাঁর রইল। এবং শুধু পাঠক হিসেবেই তাঁর প্রকল্প-নির্মাণের স্বাধীনতাও স্বীকৃত হল। সেক্ষেত্রে তাঁর প্রশ্ন ঐ পাঠক-প্রকল্পের সঙ্গে অন্বিত। এরকম পাঠকের পাঠ-প্রকল্প লেখক বা সংলাপের আমি, যে-কোনও পক্ষেরই সঙ্গে কাছাকাছি থাকতে পারে, নাও পারে, অর্থাৎ পাঠের ক্ষেত্রেও তৃতীয় বিকল্প সম্ভব। হাতের কাছের একটা মোটা দাগের উদাহরণ হতে পারে কর্মকাণ্ডকে ঘিরে। ধরা যাক পাঠ কর্মযোগী, কর্মকাণ্ডের জগতের নিশ্চিত বাসিন্দা। তাঁর সেই কর্মকাণ্ডের জগতের ব্যাপ্তি হতে পারে ধর্মীয় সংঘ, রাজনৈতিক সংগঠন, সমাজসংস্কার, রাষ্ট্রীয় বিপ্লব বা ক্ষুদ্র সমাজসেবা ইত্যাদি অনেক কিছুকে জড়িয়ে। তাঁর এই কর্মকাণ্ড তাঁর যাপনের একটা অঙ্গ। তিনি প্রশ্ন তুলতেই পারেন এ বই তাঁর কর্মকাণ্ড কী কাজে লাগবে বা কোথায় কেমনভাবে লাগবে। প্রশ্নটা কিন্তু মোটেই অবান্তর নয়। বই লেখা যে-উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকুক, তার ব্যবহারও যে সে উদ্দেশ্যের অনুরূপ হবে তা মনে করার সব সময়ে কোন কারণ নেই। সখারাম গণেশ দেউসকরের 'দেশের কথা', বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' আর জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'-র উদাহরণ স্বতঃই মনে আসে। এরকম আরও কত উদাহরণ সম্ভব। ম্যাক্সিম গর্কির 'মা' ও রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' ও 'মুক্তধারা'-র কথাও নিতান্ত অবান্তর নয়। সমূহের কর্মোদ্যমে কোন বই কখন কীভাবে প্রেরণা জোগাবে, কীভাবেই বা কোন বই পড়া হবে সামূহিকতায় তা অনেকাংশে নির্ভর করে সময় ও সমাজ-মর্জির ওপর। আর এ সবের বাইরেও আছে বিশেষ বিশেষ বই ও ব্যক্তিবোধনের কথা। কত পাঠক কত কারণেই তো এক একটা বইয়ের দিকে ফিরে যান। সে তো প্রায় এক অনির্দেশ্য জগৎ। তাই বর্তমান বইও বা কোন্ পাঠক কোন্ দৃষ্টিতে কোন্ দিক থেকে কেমনভাবে পড়বেন কে জানে। আর সেরকম পাঠে যা যা প্রশ্ন উঠবে তা ঐ পাঠকদেরই তুলতে হবে। কত প্রশ্নই হয়তো উঠবে।

সংলাপের চতুর্থ পক্ষের কথা যে বলেছিলাম, সেও একজন পাঠকের কথা। তিনিও মূল বইয়ের পাঠক হবেন নিশ্চয়ই, আর তা না হলে তাঁকে আর এখানে ডাকা কেন। তবে তিনি তৃতীয় পক্ষের থেকে একটু বিশিষ্ট এই জন্য যে তিনি এই সমালোচনা-নিবন্ধেরও পাঠক। অর্থাৎ তাঁর মূল পাঠপ্রস্তুতিতে তিনি এই নিবন্ধে আসছেন, যদি আদৌ আসেন। তৃতীয় পক্ষের যিনি পাঠক তিনি সরাসরি তাঁর মতো প্রশ্ন তুলবেন বা তুলবেন না। কিন্তু চতুর্থ পক্ষের পাঠক যাই করুন, সেটা হবে একটু ঘুরপথে। কারণ তিনি ইতিমধ্যে সংলাপের অন্যতম এক পক্ষের কথা শুনে ফেলেছেন। এই ঘুরপথে যেতে গিয়ে তিনি বাড়তি অবকাশ পাচ্ছেন এই নিবন্ধটিকেও ছিন্নভিন্ন করবার। অর্থাৎ সংলাপের প্রথম পক্ষের সঙ্গে তর্ক জুড়েই তিনি আলোচ্য বইয়ের দিকে যেতে পারেন, আবার বই থেকে ফিরে প্রথম পক্ষের দিকে আক্রমণ শানাতে পারেন। আর দৈবে যদি তিনি প্রথম পক্ষের কাছ ঘেঁসে যান, তাহলে সেটা তো সংলাপের 'আমি'র উপরিপাওনা। কিন্তু বলার কথাটা এই যে, সব মিলিয়ে সংলাপটা চালু থাকতে পারে। নানা কণ্ঠস্বর যোগ করতে পারলে ক্রমে ক্রমে হয়তো নানা কথা বেরোবে। বিভিন্ন কণ্ঠের জন্য উন্মুখ এই সংলাপ।

এই বইয়ের এক প্রধান প্রবেশমুখ, আগেই বলেছি, আত্মজৈবনিক। এতে এমনিতে কিছুমাত্র আপত্তির নেই। বস্তুত তাতে বরঞ্চ এক ধরনের তীব্রতা ও আর্তির সন্ধান পাওয়া যায় অনেক সময়ে যা নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে প্রায় দুর্লভ। নিজের যাপিত অভিজ্ঞতার আলোতে সমাজ রাজনীতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি সব কিছু দেখে নেবার একটা সুফল তো থাকেই।

কিন্তু এই পদ্ধতিতে লেখকের জন্য বেশ একটা বিপদের ফাঁদও পাতা থাকে। বর্তমান লেখক, দেশবিদেশের সাহিত্য শিল্প মন্থন করা তাঁর ভূয়সী অভিজ্ঞতা নিয়েও সে-বিপদ সব জায়গায় ঠিক এড়াতে পেরেছেন বলে মনে হল না। বিপদ হল আত্মপ্রক্ষেপণের। নিজেকে নিয়েই তো কথা শুরু। সেই সুবাদেই আসছেন অন্য মানুষেরা, আসছে অন্য ঘটনা, অন্য কথা। তাই সূক্ষ্ম হাতে নিজেকে আড়াল করতে না জানলে লেখার সেই সংবেদন মার খায়। দুটো একটা লেখায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। বিশেষত এডিথ সিটওয়েলকে নিয়ে লেখাটিতে। অথচ শ্রীমতী সিটওয়েল-এর সঙ্গে কথোপকথনের বিরল অভিজ্ঞতার স্বাদু বর্ণনা তো আছে এই লেখাতে। এলিয়ট নিয়ে লেখকের সঙ্গে মতবিরোধ, তাই নিয়ে ঈষৎ তর্ক। সেই প্রসঙ্গে লেখকের উক্তি: "কিন্তু শেক্সপীয়ার মহৎ কবি বলে দান্তে কি মহৎ কবি নন?" তারপর: "ইংরেজি ছেলেটি চোখ টিপে আমাকে থেমে যাবার ইঙ্গিত করছিল। শ্রীমতী সিটওয়েল-এর কপালে রক্তাভা দেখা দিল। 'তুমি কার সঙ্গে কার তুলনা করছ? কেরামতি আর প্রাণৈশ্বর্য কি এক জিনিস? এলিয়ট-এ বিস্তর উপরচালাকি আছে, প্রাণ কোথায়? যে-সূর্য তাকে পুষ্ট করেছে তার কোন স্বাদ আছে তার কবিতায়? আর সে স্বাদ না থাকলে শব্দে কি সুর লাগে? শিব, তুমি এলিয়ট-এর পাশে আবার পাউণ্ড-এর কবিতা পড়ো। বুঝতে পারবে এলিয়ট প্লাস্টিকের গাছ, তাতে কুঁড়ি ধরে না, ফুল ফোটে না, ফল ফলে না। পাউণ্ড ভূমধ্যসাগরতীরের পাহাড়তলি—ফুলে উজ্জ্বল, ফলে নম্র, অপচয়ে উদার।" (পৃ. ১৫৬-৫৭) এ বিচার বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না করা নিয়ে জোরের প্রশ্ন ওঠে না। সেদিনের আলোচনাতেও যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা এসব কথা নিয়ে সিটওয়েলের সঙ্গে তর্ক করেছেনও, লেখক নিজেও তাঁর মতান্তরের কথা গোপন রাখেননি। আমরা এ-বর্ণনা উপভোগ করব, কবিতা বিষয়ে কিছু মর্মের কথা খুঁজে পাবারও চেষ্টা করব এ-লেখায়। কিন্তু সেই একই লেখায় হঠাৎ লেখককে লেখা এডিথ সিটওয়েলের এমন একটা চিঠির পূর্ণ বয়ান উদ্ধৃত হল যার মধ্যে কবিতা বিষয়ে অন্তরঙ্গ কথা আর বেশি কিছু নেই, আছে বরং একটু অপ্রাসঙ্গিকভাবেই লেখকের **Explorations**-নামে বইয়ের বিষয়ে কবি আগে যা লিখেছিলেন তার থেকে এক স্তবক উদ্ধৃতি। অথচ এই প্রশংসার বাণীর মধ্যে সিটওয়েলের অন্তত এমন একটি কথা ছিল যা লেখকের তত্ত্ববিশ্বে ঈষৎ অস্বস্তিরই কারণ হওয়া উচিত। " 'All absolute sensation', wrote Novalis, 'is religious', and is almost every sentence in this most remarkable book we are given absolute sensation." (পৃ. ১৬৭) লেখক তো ধার্মিক নন, আস্তিক নন, তাহলে সিটওয়েল কি তাঁকে ভুলভাবে প্রশংসা করছেন? এ-প্রশ্ন তো ওঠা উচিত, এবং অমন তর্কপ্রবণ মন নিয়ে মুক্তবুদ্ধির চর্চায় এ বিতণ্ডা তো এড়িয়ে যাবার কথা নয়। সে-প্রসঙ্গে আমরা কিছু পাই না।

আমাদের লেখকের মনটা শুধু তর্কপ্রবণ নয়, যৌক্তিকতাবাদীও বটে। পদ্ধতিগতভাবে সম্ভবত দৃষ্টবাদীও, এমপিরিসিস্ট যে, তা তো নিজের মুখেই স্বীকৃতি আছে। আসলে এইসব শব্দ নিয়ে একটু অসুবিধা হতে পারে, কোন শব্দের কী যে মানে আর সেই মানের পরিধি যে কতদূর বিস্তৃত তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। কাজেই কোনও আলোচনায় ঠিক লেবেল লাগিয়ে এগোনো ভালো না, তাও কাজ চালাবার জন্য কিছু একটা তো করতেই হয়। তাঁর তত্ত্ববিশ্বের ধরনটা সিটওয়েল-কথোপকথনেও বেশ বেরিয়ে পড়ে। বিজ্ঞান, বিশ্লিষ্ট জ্ঞান, বিমূর্ত কল্পনা ও প্রত্যক্ষ থেকে সরে আসার প্রসঙ্গে হিরোশিমা ও পরমাণু বোমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে আলোচনা। সিটওয়েলের উক্তি: "...জাপানের উপর আণবিক বোমা ফেলে মানুষের তৃতীয় এবং হয়তো চরম পতন ঘটল।" তার পর লেখকের প্রশ্ন: "কিন্তু সে কি বিজ্ঞানের দোষ? নীতিভ্রষ্ট ক্ষমতাই কি সে বর্বরতার জন্যে দায়ী নয়?" (পৃ. ১৬১) প্রশ্নটাকে এভাবে তুললে মনে হবেই যে লেখক মনে করেন বিজ্ঞান তার নিজের মতো এগোবে, এগোতে পারে আর তাকে ব্যবহার করার দায়িত্ব আমাদের। যেন বিজ্ঞান প্রায় সমাজ-নিরপেক্ষ খুব 'শুদ্ধ' যুক্তির পথে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে আবিষ্কৃত এক মহাসৌধ। যেন বিজ্ঞান পাওয়া গেল, এখন তাকে ব্যবহার করার, উচিত মতো প্রয়োগ করার দায়িত্ব আমাদের। ক্ষমতা, নীতিবোধ, সেইসূত্রে রাষ্ট্র ও তার অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেন সেই স্তরে তার প্রভাব ফেলে। যেন বিজ্ঞানের আবিষ্কার, তার সেই মহাসৌধ নির্মাণের সঙ্গে ক্ষমতার, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার, পুঁজির ক্ষমতার, সমাজ-নৈতিকতার সম্পর্ক খুব দুর্লক্ষ্য। বিশেষ করে আধুনিক ব্যয়বহুল জটিল সংগঠননির্ভর বিজ্ঞানের গবেষণায় রাষ্ট্র-পুঁজির ভূমিকা কি এড়িয়ে যাবার উপায় আছে? পারমাণবিক যুগের প্রথম পর্বে ম্যানহাটান প্রকল্পের ক্রিয়াকলাপ ও তার ধরনধারণ আজ তো আর একেবারে গোপন কথা কিছু নয়। আমাদেরই ঘরের কাছে বালিয়াপাল, পৃথ্বী প্রকল্প ইত্যাদি প্রসঙ্গে চোখ খুলে রাখলে বিজ্ঞান ও তার ব্যবহারের মধ্যে অমন অবচ্ছিন্নতার চিন্তায় কি আর আমরা খুব নিশ্চিন্ত থাকতে পারি?

যে-ধরনটাকে আমি যৌক্তিকতাবাদী বলছি, চিন্তায় ও মননে তারই সংলগ্ন ধরন হিসেবে এসে পড়ে ঐ দুই মহলের কথাটা। একেবারে অনিবার্য কার্যকারণ সম্পর্কে নিশ্চয়ই নয়, তবে খুব সহজ টানেই আসে। বুদ্ধিচর্চার এই মহলে যাঁরা আছেন, ওই মহলে তাঁদের নজর বড় একটা যায় না। এই ধরনটার বেশ



কিছুটা প্রকট প্রকাশ আছে 'স্বদেশ, স্বকাল, স্বজন' নামের নাম-প্রবন্ধে। বুদ্ধিচর্চার এক মহলের টানে লেখক তাঁর অল্পবয়সেই কীভাবে একটু একটু সরে যাচ্ছেন তাঁর জন্মসূত্র পাওয়া প্রতিবেশ থেকে তারই কথা পাই আমরা এ-লেখায়। এ-রকম সরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়তো অনেকের, আজকের বিশ্বায়নের যুগে নিশ্চয়ই আরও অনেক বেশি অনেকের। এখানে একটা ভীষণ জটিল দোটানার সমস্যা আছে। নিজের প্রতিবেশেই আমরা অনেকেই জন্মের মতো লগ্ন হয়ে থাকি না নিশ্চয়ই। আধুনিক বিশ্বে, অন্তত এক মহলের বাসিন্দাদের পক্ষে সেটা খুব স্বাভাবিকও নয়। নিজের ডালপালা মেলতে হয়, ডানা ছড়াতে হয়, উড়াল দিতে জানতে হয়, সবই ঠিক, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় হারিয়ে যাবারও যে বিপদ আছে তাও তো খেয়াল রাখতে হয়। "জন্মসূত্রে পাওয়া আত্মীয়গোষ্ঠী এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমার নিজের মনের খুব একটা মিল হয়নি; কিন্তু অল্প বয়সেই আভাস পাই এই সংকীর্ণ বৃত্তের বাইরেও বড় জগৎ আছে। মুক্ত দৃষ্টি এবং আগ্রহ নিয়ে খোঁজ করলে স্থানে-কালে বিস্তৃত সেই বিরাট জগতে মনের মতো স্বজন মেলে।" (পৃ. ৩৩) নিশ্চয়ই মেলে এবং যাতে মেলে সে চেষ্টা তো করাই উচিত। কিন্তু খুব সাবধানে সজাগ না থাকলে এক মহলের বাসিন্দা বিশ্বের মিলনক্ষেত্রে বেরিয়ে সেই মহলের বাসিন্দার সঙ্গেই হয়তো কেবল মিলতে পারব। সারা বিশ্বেই ছড়ানো আছে কিন্তু অন্য মহলের বাসিন্দাও, সেখানেও মিলতে না পারলে মেলাটাই খাটো হয়ে থাকবে।

> "কিন্তু সরকারের দেয়া ছাড়পত্রের বাইরে আমার ভারতীয়ত্বের আর কি নির্ণায়ক থাকতে পারে আমি ভেবে পাই না। আমি হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ বা শিখ নই; বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, বাইবেল, কোরান থেকে শুরু করে রাম, কৃষ্ণ, খৃস্ট, মহম্মদ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, গান্ধী, সুভাষ, নেহেরু কিছুই আমার কাছে বিচারোর্ধ্ব ঠেকে না। জাতপাতকে আমি ঘৃণা করি, গঙ্গাজলে পবিত্রতা আরোপ আমার অসাধ্য। বাংলা অথবা সংস্কৃতের চাইতে ইংরেজি ভাষাকে আমি কম ভালোবাসি না। ভাত, ডাল, ঝোল বা পায়েসের চাইতে রুটি, চীজ, বীফস্টেক, পার্সিমন এবং কিয়ান্তি আমার জিভে কম সুস্বাদু ঠেকে না। সংসারে জড়িয়ে না পড়লে আমি হয়তো প্যারিস কিংবা ফ্লরেন্স অথবা মেক্সিকোয় জীবনের বড় অংশ কাটাতাম।" (পৃ. ২৫)

একালে অবশ্য অনেকেই সংসারে জড়িয়ে পড়েও ওরকমই কোথাও কোথাও জীবনের বড় অংশ কাটাচ্ছেন। তা কাটান। কিন্তু এসব কি বড় বেশি বহিরঙ্গে নজর আটকে যাচ্ছে না? ঘর বাহির ও প্রবাসের সমস্যা কি এতটাই ওপরতলার সমস্যা?

এই লেখকের মনটা কি বড় বেশি ওপরতলায় আটকে থাকে? মাঝে মাঝে কেমন যেন সন্দেহ হয়। সকলেই জানেন বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে এই লেখকের সান্নিধ্যের কথা। বুদ্ধদেব যে কোন কোন ব্যাপারে তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন সে খবরও আমরা পাই। তবু সেই বুদ্ধদেবের এক সমালোচনায় লেখক খুবই আহত হয়েছিলেন একবার। ১৯৪৫-এ প্রকাশিত লেখকের প্রথম বই 'প্রেক্ষিত'-এ আলোচ্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন পাউন্ড, ডে লুইস, অডেন, স্পেন্ডার জয়েস ও বেনেদেত্তো ক্রোচে। এ বই ভাল লেগেছিল সরোজ আচার্যের, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে একে আক্রমণ করেছিলেন সজনীকান্ত দাস। "কিন্তু আমি আহত হই বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনাটি পড়ে। তিনি পরামর্শ দেন যে আমি যদি আমার বিদ্যাবুদ্ধি এবং লেখনী পশ্চিমী সাহিত্যের পরিবর্তে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় নিয়োজিত করি তবেই মাত্র তা সুফলপ্রসূ হতে পারে।" (পৃ. ২৬৩) এই লেখক তো বুদ্ধিমার্গের লোক। তিনি কি আত্মবীক্ষণে কখনও এ-পরামর্শের অন্তর স্পর্শ করার চেষ্টা করেছেন? তখন কিংবা পরে কখনও?

এই ওপরতলার সমস্যা ভাষার প্রশ্নেও যেন চোখে পড়ে। তাঁর নিজের বাংলা লেখা চর্চার ইতিবৃত্ত জানাতে গিয়ে লেখেন:

> "কিন্তু বাংলায় লিখতে গিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আমার মাতৃভাষায় কোনো জটিল বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সহজসাধ্য নয়। বাংলায় চমৎকার হাল্কা লেখা বিস্তর মেলে, কিন্তু মননশীল প্রবন্ধ দুর্লভ। প্রায় চারশো বছরের অনুশীলনের ফলে ইংরেজি গদ্য যেভাবে সম্পন্ন এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, বাংলা এখনো তার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারেনি। বস্তুত বলতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার প্রায় আদি এবং নিঃসন্দেহে এ তাবৎ শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে নানাভাবে পুষ্ট করেছেন, কিন্তু মননশীল প্রবন্ধের একটি উৎকৃষ্ট মডেল তিনি দিয়ে গেছেন বলে আমার মনে হয় না।" (পৃ.২৬১)

এ লেখাটার তারিখ দেখছি ৬ জুন, ১৯৯৪। তাঁর আরও মনে হয় যে, "ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষিতজনের সঙ্গে যোগাযোগ গড়বার এবং বজায় রাখবার অবিকল্প সূত্র ইংরেজি ভাষা।" (পৃ. ২৬৫) আর শিক্ষিতজনের সেই বৃত্তের বাইরে কোনও যোগাযোগের জন্য? কিছু কি ভাবেন তিনি?

বুদ্ধিচর্চার এক মহলের বাসিন্দাদের ভাবনায় এ কথাটা খুব আসে না। এই জায়গায় পৌঁছে সেই নীরবতার কথাটা তোলা যেতে পারে। এ কালের দুই প্রধান বিবাদী আন্দোলনের একটি হল নারীআন্দোলন আর অন্যটি পরিবেশ সংক্রান্ত। নারী আন্দোলনের বিষয়ে লেখকের মন বেশ সজাগ। এ বইয়ের বিভিন্ন লেখায় তার যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে। এই দুই আন্দোলনেরই

আছে বেশ পুরোনো ইতিহাস। আধুনিক পর্বে নানা সূত্রে দুই আন্দোলনই নানা ভঙ্গিতে বিকাশলাভ করেছে। এর মধ্যে নারীচেতনা বিষয়ে তাঁর মন উন্মুখ, একালের তসলিমা নাসরিনের আন্দোলনের তিনি প্রায় শরিক, মনের দিক থেকে তো বটেই। কিন্তু পরিবেশ বিষয়ে তাঁর মন কি তেমন সাড়া দেয় না? অথচ তাঁর মনের যে-যুক্তিবাদী গড়ন থেকে তিনি সামাজিক বিন্যাসের অনেক প্রচলকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন ও উল্টেপাল্টে দেখতে চান, পরিবেশ প্রসঙ্গ সেখানে তাঁর স্বাভাবিক অভিনিবেশের বিষয় হতে পারত। নারীবাদ অনেক আপ্ত বিশ্বাস প্রত্যয় ও প্রতিষ্ঠানে ধাক্কা দিচ্ছে, পরিবেশবাদও তাই দিচ্ছে। সেই কারণেই সে প্রসঙ্গে তাঁর নীরবতায় কিছু প্রশ্ন জাগে। এই অপ্রতিসাম্যের সম্ভাব্য কারণ নিয়ে জল্পনা করতে ইচ্ছে হয়, এবং মনে হয় এতে করে যদি লেখককে ঐ প্রসঙ্গেও কিছুটা উস্কে দেওয়া যায়। নারীবাদেরও একটা লক্ষ্য এক ধরনের মৌলবাদ। তসলিমা নাসরিনের বিদ্রোহের একটা মানে তো তাই, ধর্মীয় মৌলবাদ সেখানে আক্রমণের লক্ষ্য। লেখকের যুক্তিবাদিতায় সেখানে সহজে সাড়া মেলে। একটু ভাবলে দেখা যাবে যে, পরিবেশ আন্দোলনেরও কিন্তু আক্রমণের একটা লক্ষ্য এক ধরনের মৌলবাদ। সে মৌলবাদ আধুনিকতা-পুষ্ট শিল্পসমৃদ্ধ অর্থনীতির সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বিন্যাসে ন্যস্ত। পরিবেশ আন্দোলনের শরিক হতে গেলে ঐ আধুনিকতার প্রতিকল্পের সমালোচনের পথে যেতে হবেই। এমন কি হতে পারে যে লেখকের মনে হয়তো অগোচরে এখানেই একটা দ্বিধা জমে আছে? অথচ তাঁর নারীবাদী মনের কাছে পরিবেশ আন্দোলনের সহজাত প্রশ্রয় প্রাপ্য ছিল। কারণ এ দুই আন্দোলন তো একটা বিন্দুতে এসে মিলে যায়। পরিবেশ-বিনাশের প্রধান দায়ভাগ যেখানে মেয়েদের ওপরেই বর্তায় সেখানে তো দুই আন্দোলনকে মিলতেই হবে। আবার শিল্প-প্রযুক্তির বিকাশের ধাক্কা যেখানে মেয়েদের গায়েই বেশি করে লাগে, সেখানে এক আন্দোলন আর এক আন্দোলন থেকে খুব দূরে থাকা কি স্বাভাবিক? কিন্তু সেই মোহনায় পৌঁছতে গেলে তো আধুনিক-এর বৃত্ত থেকে একটু বাইরে দাঁড়াতে হবে। বুদ্ধিচর্চার এক মহলেই নির্বাসিত হলে চলবে কেন? গণ্ডি পেরোনোর দীক্ষা নিয়ে দুই মহলেই তাকাতে হবে। □

■ **স্বদেশ স্বকাল স্বজন** — শিবনারায়ণ রায় / প্যাপিরাস, কলকাতা / ১০০ টাকা

# মহাত্মা গান্ধী : ১২৫ বছর পরে প্রাসঙ্গিকতা বিচার

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্য কোন্‌খানে তার হদিশ দিতে গিয়ে তাঁর প্রিয় শিষ্য বিনোবা ভাবে বলেছেন যে জন্মসূত্রে গান্ধীজি ছিলেন একজন অত্যন্ত সাধারণ মানুষ, তাই তাঁকে পরিশ্রম করে মহাত্মা হতে হয় এবং তাঁর যদি কোনও সিদ্ধি থাকে তবে তা হল সত্যনিষ্ঠা। এই বলে বিনোবাজি বলেছেন যে আজ যখন আমরা তাঁকে স্মরণ করছি তখন আমাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে তাঁর চরিত্র ছিল অনুকরণীয়, নচেৎ তাঁকে অবতার জাতীয় কিছু করে তুললে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'সত্যের সন্ধানে' প্রবন্ধটিতে বিনোবাজির বক্তব্যের সার কথা এই যে গান্ধীজিকে পুজোর বেদিতে বসিয়ে না রেখে তাঁর জীবনকে নিজ নিজ জীবনে অনুকরণ তথা অনুশীলন করাই আমাদের উচিত। তিনি যদি সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে অনুকরণ করলে আমরাও অসাধারণ হতে পারব। বলা যেতে পারে যে অহিংসা ও সত্যনিষ্ঠাকে গান্ধীজি আপন জীবনের উদ্দেশ্য রূপে নির্ধারণ করেছিলেন এবং তারপর সমস্ত জীবন ধরে সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য উপায় অন্বেষণ করেছিলেন। গান্ধীবাদের তাৎপর্য বিশ্লেষণে প্রায়ই উদ্দেশ্য আর উপায়কে একই জীবন-প্রক্রিয়া বলে মনে করা হয়, কিন্তু উদ্দেশ্যই উপায় কিনা অথবা উপায়ই উদ্দেশ্য কিনা সেটা যেমন তর্কসাপেক্ষ তেমনই উদ্দেশ্য ও উপায় একই সত্তার দুটি রূপ না হয়ে থাকলে অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও উপায় যদি দুটি ভিন্ন সত্তা-বিশিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের চরিত্র কেমন সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে চিন্তার অভিনবত্বের জন্য গান্ধীবাদ যেমন আকর্ষণীয় তেমনই অন্তরঙ্গ পর্যবেক্ষণে গান্ধীবাদের ক্ষেত্রটি নানা প্রশ্নে বন্ধুর। মানুষের জীবনচর্যায় মহাত্মাজির চিন্তাধারার সত্যই কোনও যাথার্থ্য আছে কিনা তার বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই কি? তাঁর 'আত্মকথা'কে তিনি 'সত্যের সঙ্গে পরীক্ষা' বা সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের অনুবাদে 'সত্যের প্রয়োগ' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু কোনও এক ব্যক্তির জীবনে সত্যের সঙ্গে পরীক্ষা যেভাবে সম্ভব সমষ্টির জীবনে সেভাবে সত্যের সঙ্গে পরীক্ষা সম্ভব কি? এছাড়াও তো সত্য কাকে বলে, সত্যের চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য কী, দৃষ্টিকোণের ও পরিপ্রেক্ষিতের তারতম্যে সত্যের স্বরূপ বদলায় কিনা এসব বিচারকে কি গান্ধীবাদ থেকে বাদ দেওয়া যায়? সত্য কি আইনসম্মত হয়? আমরা প্রায়ই নেতাদের মুখে শুনি যে আইন তার নিজের পথে চলবে। তবে কি সত্যের পথ আর আইনের পথ দুটি পৃথক পথ? আদালতে, আইনসভায়, লোকসভায় যে সত্যের নামে শপথ হয় এবং যে-সত্য প্রমাণিত হয় সেই সত্যের সত্ত্বগুণই বা কেমন?



অহিংসার বিষয়েও এরকম নানা প্রশ্ন আছে। ইতিহাস থেকে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ইরান যখন জাতীয়তাবাদের নামে স্বদেশের তৈলস্বার্থকে রক্ষা করতে চেয়েছে তখন মার্কিন তৈলস্বার্থ অপারেশন অ্যাজাক্স্‌-এর মাধ্যমে অজস্র ডলার দিয়ে ইরানের যুব সম্প্রদায়ের এক উল্লেখযোগ্য অংশকে কিনে নিয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত ইরান তখনই ঐ স্বার্থকে রক্ষায় সফল হয়েছে যখন ধর্মের নামে যুব সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করেছে, কিন্তু তার ফলে ইরান হয়ে গেছে মৌলবাদী দেশ। যদি কোনও দুর্বৃত্ত গৃহে ঢুকে নারীর সম্ভ্রমহানির চেষ্টা করে তাহলে গান্ধীবাদী গৃহকর্তারও কর্তব্য হবে না কি রান্নাঘর থেকে বঁটি এনে দুর্বৃত্তটার পিঠে বসিয়ে দেওয়া? তখন সেটা কি হিংসার অপরাধ হবে না? তবে কি গান্ধীজির মনে সত্য ও অহিংসার এমন কোনও তাৎপর্য বা সংজ্ঞার্থ ছিল যার খোঁজ অধিকাংশ গান্ধীবাদীই পাননি? আলোচ্য গ্রন্থ 'গান্ধীজী'র সম্পাদক বা প্রকাশক প্রশ্ন করতেই পারেন যে এই গ্রন্থের আলোচনায় এসব প্রশ্ন কেন? তাঁরা বলতেই পারেন যে গ্রন্থটিতে শুধু যে প্রবন্ধগুলি আছে সেগুলিরই আলোচনা হোক। কিন্তু গান্ধীজি কি এমন কোনও একটা দ্বীপ যার চারপাশের জলরাশি হিংস্র হাঙরে অধ্যুষিত? দ্বীপের বাইরে পদার্পণ কি নিষিদ্ধ?

আসলে আমি গান্ধীজি নামক প্রসঙ্গটাকে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে যথার্থ ও স্বচ্ছ রূপে অনুধাবন করতে চাইছি। আর একটু খুলে অথবা আলোচ্য গ্রন্থে আর একটু সংলগ্ন হয়ে বলি। এই গ্রন্থেই 'গান্ধী অর্থনীতি'র ব্যাখ্যাকার রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে গান্ধীজি ছিলেন বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ প্রমুখের মতো 'অবতারস্বরূপ'। ভাবেজির বক্তব্য এবং শ্রী মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের মধ্যে অনুধাবনার দূরত্ব থেকে যাচ্ছে না কি? 'গান্ধীজীর রামরাজ্যবাদ' প্রবন্ধটিতে অন্নদাশঙ্কর রায় একটি প্রশ্ন করেছেন যে বাবরি মসজিদ ধ্বংসকালে গান্ধীবাদীদের উদাসীনতা গান্ধীজি সমর্থন করতেন কি? ঐ প্রবন্ধেই অন্নদাশঙ্কর আরও একটি প্রশ্ন করেছেন পার্লামেন্টারি স্বরাজের পরিবর্তে গান্ধীজির পঞ্চায়েতি স্বরাজ প্রসঙ্গে। 'কিন্তু প্রশ্ন করতে পারা যায়, দেশীয় রাজ্যগুলিতে কি বিকেন্দ্রীকরণের কোনও নমুনা বা নজির ছিল? কোথাও কি রাজামহারাজার ক্ষমতা ছিল সবচেয়ে কম আর গ্রামবাসীদের ক্ষমতা ছিল সবচেয়ে বেশি? কোথাও কি ক্ষমতা স্তরে স্তরে বিন্যস্ত ছিল?' আবার বিখ্যাত গান্ধী-শিষ্য জীবতরাম ভগবানদাস কৃপালনী চম্পারণ সত্যাগ্রহের সময়কার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন যে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে পালিয়ে না গিয়ে 'গ্রামবাসীরা যদি হিংস উপায়েও প্রতিরোধ করতেন তাহলে তা অধিকতর নীতিসম্মত হত। ভয়ে পালিয়ে গিয়ে তাঁরা সর্বাপেক্ষা খারাপ কাজ করেছেন।' তিনি বলেছেন, 'গান্ধীজীর অহিংসা ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছিল।' সবচেয়ে নিচের ধাপের অহিংস অবিচার ও অত্যাচারকে প্রতিরোধের চেষ্টাই করে না। এর অনেক উপরের ধাপে 'সৈনিক বা হিংস পন্থায় প্রতিরোধকারীর স্থান'। এবং সর্বোচ্চ কোটির অহিংস 'অপরের জীবন নেয় না, কিন্তু নিজ জীবন আহুতি দিতে প্রস্তুত।' তাহলেও প্রশ্ন থাকে যে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্পেন যখন ১৪৯২, ১৪৯৩, ১৪৯৮ এবং ১৫০২ সালে আমেরিকায় খ্রিস্টান নৌবাহিনী পাঠিয়েছিল তখন তারা তিন লক্ষ অখ্রিস্টান হত্যার গৌরব দাবি করেছিল এবং ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয় ঐতিহাসিক ফার্নান্দেজ ডে ওভিয়েদো লেখেন 'অবিশ্বাসীদের উপর বারুদ চালানো মানে সদা প্রভুর উদ্দেশে ধূপ পোড়ানো'। এইভাবে যে ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা অতলান্তিক মহাসাগরের পশ্চিম তীরবর্তী দেশের অধিবাসীদের ধর্মের নামে হত্যা করেছিল তাদের বংশধররাই আজও হিরোসিমা ও নাগাসাকির উপর আণবিক বোমাবর্ষণকে সমর্থন করে, তারাই ভিয়েতনামে গিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করে, তারাই ইরানের অধিবাসীদের ডলারের বিনিময়ে ক্রীতদাসে পরিণত করার চেষ্টা করে, তারাই কুয়েতের সহায়তায় পূর্ব এশিয়ার তৈল সম্পদের উপর অধিকার বিস্তারের চেষ্টার প্রতিক্রিয়ায় ইরাকের অভ্যুত্থানকে আকাশ পথে দমন করে। এই মুহূর্তে ভারতের আকাশ অধিকারের মার্কিন অভিযান চলেছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে। হিংসার এইসব অভিযানের বিবরণ ও তাৎপর্য সম্বন্ধে গান্ধীজি এবং গান্ধীশিষ্যবর্গ কতটা অবহিত ও তাঁদের সমাধান কী জানতে ইচ্ছা করি। ঠিক কথা যে গান্ধীজি ভিয়েতনাম বা ইরাকের যুদ্ধের কথা জানার সুযোগ পাননি, কিন্তু তিনি হিরোসিমা-নাগাসাকির কথা তো জানতেন। তাঁর সমাধান ছিল যে তিনি ঘটনাক্ষেত্রে থাকলে আকাশের নিচে এসে এমন ভাবে উপরের দিকে তাকাতেন যাতে বোমাবহনকারী প্লেনটার চালক তাঁর চোখের প্রেম দেখতে পায় ও বোমাবর্ষণ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু তাহলে কি প্লেন-চালকের কর্তব্যচ্যুতি হত না? পেশোয়ারে লবণ সত্যাগ্রহীদের উপরে গাড়োয়ালি সৈন্যরা গুলি চালাতে অস্বীকার করলে তাদের কোর্ট

মার্শাল হয় এবং তখন গান্ধীজিই কি তাদেরকে কর্তব্যচ্যুতির জন্য দোষী সাব্যস্ত করেননি? আর তাছাড়া আকাশের নিচে এসে উপরের দিকে তাকালে বোমাবহনকারী প্লেনের চালক যে ঐ উচ্চতা থেকে নিচের মহাত্মার চোখে তাঁর হৃদয়ের প্রেম দেখতে পাবে এটা একটা আদর্শের কথা হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে কি সম্পূর্ণ অবাস্তব ও শিশুসুলভ নয়? আবার অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধের থেকে বলি যে অনেক উত্তর অনেক সমাধান গান্ধীজির কল্পনায় ছিল এবং তাঁর সংগ্রাম ছিল তাঁর সাধনা ছিল সেগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা।

এরকমভাবে গান্ধীজির মত ও ব্রত-র বিশ্লেষণ করলে অনেকক্ষেত্রেই অবাস্তবতা, অসংগতি ও অস্বচ্ছতা পাওয়া যাবে বলে আমার ধারণা—বিশেষত সভ্যতার বিকাশ ও প্রযুক্তির বিস্তারের ক্ষেত্রে। বয়স বাড়ার সঙ্গে বালকের কোমল গালে কর্কশ শ্মশ্রুর আবির্ভাব নিয়ে বিলাপ শুধু অর্থহীন নয়, চিন্তার সংকটেরও লক্ষণ নয় কি? যে-বিশ্বাসের থেকে তিনি 'হিন্দ্ স্বরাজ'-এ যন্ত্রসভ্যতা বর্জনের উপদেশ দিয়েছিলেন এবং যন্ত্রায়ণ ও নগরায়ণের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁর সে-বিশ্বাসে কখনও সংশয় দেখা দিল না এটা বিস্ময়ের বিষয় নয় কি? মানুষ যে আধুনিক সভ্যতার পথ ধরে আপন বিনাশের অভিমুখে চলেছে এ বিষয়ে তাঁর আশঙ্কা যদি সত্যও হয় তবু কি মানুষ শৈশব কৈশোর যৌবন প্রৌঢ়ত্ব বার্ধক্য প্রভৃতি ধাপগুলি পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে বলে যৌবনের ধাপে অনন্তকাল অচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? তবে কি গান্ধীবাদ অচল? প্রশ্নটা আমরা নয়, অধ্যাপক অম্লান দত্তের। উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে লিখেছেন, 'অহিংস আন্দোলনের মূল কথা অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগ। শাসকের অন্যায় চেষ্টা যতই প্রচণ্ড হোক-না কেন, সম্পূর্ণ অসহযোগের সম্মুখে শাসক অসহায়। কোনো অন্যায় ব্যবস্থাই কার্যকরী হতে পারে না যদি আপামর জনসাধারণ মৃত্যুপণ করে সমস্ত সহযোগিতা থেকে অহিংসভাবে বিরত থাকেন। আদর্শ অহিংসা সর্বজয়ী।' তার মানে কি আপামর জনসাধারণের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আদর্শ মানুষ হতে হবে? অম্লানবাবু নিজেই দুটি বাক্যের পরে গান্ধীজির দোহাই দিয়ে বক্তব্যকে সংশোধন করে লিখেছেন, 'গান্ধী বলেছেন: অন্যায়ের বিরোধিতাই কর্তব্য; যদি অহিংস প্রতিরোধ সম্ভব না হয় তো অহিংসা থেকে বিচ্যুত হয়েও অন্যায়ের বিরোধিতা করা শ্রেয়।' আচার্য কৃপালনীও লিখেছেন যে ক্ষেত্রবিশেষে গান্ধীজি হিংসাকে মেনে নিজে রাজি ছিলেন। কিন্তু সত্যিই কি তিনি বাস্তবে মেনে নিতে রাজি ছিলেন? মেনে নেওয়ার কোনও দৃষ্টান্ত আছে? অনশন অস্ত্র প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত গান্ধীজি কি ৬৪ দিন অনশনে প্রাণদাতা যতীন দাসের প্রতি কোনও অনুমোদন জ্ঞাপন করেছেন? গান্ধী-আরউইন চুক্তির সময় গান্ধীজি শুধু সেইসব রাজবন্দীদেরই কারামুক্তির ব্যবস্থা করলেন যাঁরা অহিংস আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর অনুগামী শিষ্যবৃন্দের, কিন্তু তাঁর শিষ্য নয় এমন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মুক্তির চিন্তা তিনি করেননি। এমনকি যেসব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিনা বিচারে বন্দি রাখা হয়েছিল অথবা যাঁদের বন্দিদশাতেই মৃত্যু হয়েছিল তাঁদের জন্য রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ সিভিল লিবার্টিস ইউনিয়নের মাধ্যমে বিচার দাবি করেছিলেন, কিন্তু ঐ ব্যাপারে গান্ধীজির কোনও আগ্রহ ছিল কি? এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে যে যেসব গান্ধীশিষ্য ত্রিপুরি কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে সবচেয়ে সক্রিয় ছিলেন, গোবিন্দবল্লভ পন্থ প্রমুখের কথা বলছি, তাঁরাই গান্ধীজিকে 'হিন্দুস্তানের হিটলার' বলে সম্বর্ধিত করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যাবে যে গান্ধীজির শিষ্যবর্গের চরিত্র ও ধাবনা কী রকম ছিল। অম্লান দত্ত লিখেছেন, 'হিংসাত্মক প্রতিরোধের কতকগুলি কুফল আছে এবং শুধু উদ্দেশ্যের মহত্ত্বে এই কুফল থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। এটাই বাস্তব কথা।' কিন্তু এটাই কি বাস্তব কথা নয় যে সম্পূর্ণ অহিংস প্রতিরোধ আদর্শ হিসেবে যতই মহৎ হোক-না কেন তা প্রকৃতপক্ষে অবাস্তব? তাঁর দশ পৃষ্ঠার প্রবন্ধের বিশেষত শেষ দু-পৃষ্ঠায় তাঁকে গান্ধীবাদের চর্চায় ততটা আগ্রহী বলে মনে হয় না যতটা রুশ দেশ, মার্কস, লেনিন, স্তালিন প্রভৃতির চর্চায় আগ্রহী বলে মনে হয়। এই অংশেই তিনি বলেছেন, 'হিংসা সদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে এবং সাময়িক ভাবে সফলও হতে পারে।' কিন্তু এমন কোনও উপায় আছে কি যা স্থায়ীভাবে সফল হবে? নাকি কলম্বাস কর্তৃক আরব্ধ গণহত্যা ও হিংসার তাণ্ডবের পাঁচশো বছরের সাফল্যই স্থায়িত্বের পরাকাষ্ঠা? এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল যে আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদক শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'সত্যাগ্রহ প্রসঙ্গে' লিখেছেন, 'ভারতের ইংরেজ সরকার ও আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের সরকার মোটামুটি উদারনীতিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ মানতেন বলেই গান্ধীজি অথবা মার্টিন লুথার কিং-এর পক্ষে অহিংস আন্দোলন করা সম্ভবপর হয়েছিল।' কিন্তু কিং-এর জীবনে অনেক অস্বচ্ছতা ও গোপনতা ছিল। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিল্ অব্ রাইট্স-এর মূলে মার্টিন লুথার কিং-এর অহিংস সত্যাগ্রহই ছিল একথা বলা ভুল, ঐ বিল-এর মূলে ছিল কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিনদের একশো বছরের সংগ্রাম। ম্যালকম এক্স্-এর মতো কৃষ্ণাঙ্গ নেতারাও এই সংগ্রামের সামিল ছিলেন। মার্টিন লুথার কিং-এর জয়গানে শ্বেতাঙ্গ ও খ্রিস্টান সমাজ যতটা উৎসাহী কৃষ্ণাঙ্গরা ততটা নন। চলচ্চিত্র নির্মাতা স্পাইক লী, সংগীত শিল্পী মাইকেল জ্যাকসন প্রমুখ বহু কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিন মনে করেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিন নেতা রূপে ম্যালকম এক্স্-ই সবচেয়ে বিস্ময়কর, শ্রদ্ধেয় ও স্বচ্ছ





ব্যক্তিত্ব। বিনোবাজি একজন সাধারণ মানুষ থেকে মোহনদাস গান্ধীর মহাত্মা গান্ধী রূপে উত্তরণকে যেমন অনুকরণীয় বা অনুশীলনীয় বলেছেন তেমনই একজন জেলখাটা অপরাধী থেকে বহু সৃষ্টিশীল কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিনদের আদর্শ চরিত্র রূপে ম্যালকম এক্স্-এর উত্তরণও মানুষের মধ্যে নিহিত অসীম সম্ভাবনার এক গৌরবদীপ্ত প্রমাণ। এছাড়া যারা জাপানে আণবিক বোমাবর্ষণকে ১৯৯৫-এর অগস্ট মাসেও উচিত কাজ বলে সমর্থন করে তারা (৮৫% আমেরিকান) কী করে শৈলেশবাবুর মতো গান্ধীবাদীর কাছে 'গণতান্ত্রিক ও সভ্য সমাজের বিধি-বিধান' মেনে চলার জন্য ক্যারেকটার সার্টিফিকেট পায়?

অতঃপর প্রশ্ন করা যায়, আলোচ্য 'গান্ধীজী' গ্রন্থটি প্রকাশের আদৌ কোনও সার্থকতা ছিল কিনা। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে সাম্প্রতিক বিশ্ব যেভাবে অপরাধ, আগ্রাসন, ভোগমত্ততা, ভ্রষ্টাচারিতা, ধনগৃধ্নুতা, মাদকাসক্তি ইত্যাদির কক্ষপথে উদ্‌ভ্রান্ত অন্ধের মত ধাবমান তাতে প্রত্যেক নাগরিকের জীবন বিপন্ন—ক্ষমতাবানের জীবন বেশি আর ক্ষমতাহীনের জীবন কম বিপন্ন। আমার মনে হয় যে প্রশ্নটা এখানে ততটা সুখ-শান্তির অভাব সংক্রান্ত নয় যতটা নিরাপত্তার অভাব সংক্রান্ত। একই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বর্ধমান। অহিংসা ও সত্যাগ্রহের বিষয়টা প্রধানত নৈতিক তথা দার্শনিক এবং প্রধানত উচ্চস্তরের বুদ্ধিজীবীদের বিবেচ্য বিষয়, কিন্তু অন্নসমস্যা ও ধনবৈষম্য সংক্রান্ত সমস্যা সামাজিক বিন্যাসে একেবারে নিম্নস্তরের মানুষেরও জ্বলন্ত সমস্যা। এই সমস্যা নিয়ে প্রবন্ধগুলির মধ্যে শীতাংশু চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীরত্নমণি চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য তাঁদের প্রবন্ধও বহুলাংশে আদর্শবাদে আপ্লুত হওয়ার জন্য মূল প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে অস্বচ্ছ এবং বিমূর্ত। কিন্তু বড় কথা এই যে সর্বোদয় বা সর্বশেষ মানুষটির সমস্যা সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন। আমার মনে হয় যে গান্ধীজির ও গান্ধীবাদীদের বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে মূল ভূমিকা হল মানব পরিবারের মৌল প্রশ্নগুলি ও মৌল সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সচেতনা জাগানো ও সেগুলির উত্তর ও সমাধান সন্ধানে মানব পরিবারের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করা। দুঃখের কথা যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নামক একটি ক্ষমতালিপ্সু গোষ্ঠীর সঙ্গে গান্ধীজিকে এবং ঐ গোষ্ঠীর মতবাদকে গান্ধীবাদের সঙ্গে সনাক্ত করা হয়। এটাও বিস্ময়কর যে অনেক গান্ধীবাদী বুদ্ধিজীবীও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে গান্ধীবাদের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং সাম্যবাদী ব্যবস্থার মধ্যে গান্ধীবাদের বিরোধিতা দেখতে পান। অথচ গান্ধীজির বিবর্তনশীল মতবাদ ছিল ধনতান্ত্রিক মতবাদগুলিরই প্রতিবাদ। টলস্টয়-এর 'কিংডম অব গড উইদিন ইউ', রাসকিন-এর 'আন্টু দ্য লাস্ট', থোরোর 'ওয়াল্‌ডেন্' এবং গান্ধীর 'হিন্দ্ স্বরাজ'—প্রত্যেকটাই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ায় রচিত। রবীন্দ্রনাথও 'রক্তকরবী' লিখেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আর 'রাশিয়ার চিঠি' লিখেছিলেন সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণের সূত্রে। ঠিক কথা যে সমাজবাদের পরীক্ষা কোনও দেশে সফল হয়নি, কিন্তু তেমনই যে-দেশে গান্ধীবাদের পরীক্ষা হয়েছে সেই ভারতেও ঐ পরীক্ষার বিফলতার প্রমাণ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বিনাশ ও তার পরে পশ্চিম ভারতের মহারাষ্ট্র-গুজরাটে সংখ্যালঘু হত্যার তাণ্ডব। গান্ধীবাদের এই ধ্বংসস্তূপ থেকে কি গান্ধীজিকে উদ্ধার করা সম্ভব? 'সত্যের সন্ধানে' প্রবন্ধটির শেষের দিকে বিনোবাজি লিখেছেন, 'স্বরাজ প্রাপ্তির সময় গান্ধী-জীবনের শেষ লগ্নে যেসব ঘটনা ঘটে তার কারণ (সে সবের কারণে) গান্ধীজীকে অত্যন্ত মনোকষ্টে (মনঃকষ্টে) দিনাতিপাত করতে হয়। তাঁর কথা লোকে তখন শুনত না। শেষ অবধি তাঁর সেই শব্দশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল।'

গভীর মনোবেদনার সঙ্গে কিছুটা সঙ্গতিহীন ভাবে প্রবন্ধটির শেষ তিনটি বাক্যে সত্যপন্থীদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন, 'বড় বেশী হলে এই পন্থাশ্রয়ী মানুষকে এই পৃথিবীতে মার খেতে হবে। প্রহার যদি পড়েই তবে নিজ শরীরকে কিছুটা মজবুত করতে হবে—আর কি? প্রহার খেলে মনে করতে হবে নিজের ব্যায়াম হচ্ছে।' এটা কোনও সমাধান হল কি? রাষ্ট্রীয় শক্তি, কায়েমি স্বার্থ ও মাফিয়া চক্র শুধু কয়েক ঘা মেরে সত্যপন্থীকে ছেড়ে দেয় না, সারা খানদান খতম করে দেয়। তবে কি গান্ধীচর্চার কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই? আমি আবার বলব যে গান্ধীচর্চার সার্থকতা এই যে আমাদের অস্তিত্বের অসহায়তা ও বিপন্নতাকে অনুধাবনে গান্ধীজি বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন এবং তার থেকে এমন এক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ জাগ্রত করেন যে-মুক্তি একই সঙ্গে প্রাতিস্বিক ও সামাজিক, তিনি আমাদেরকে অভ্যস্ত প্রথাসিদ্ধ পথ ছেড়ে এমন এক পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ার জন্য প্রেরণা দেন যে পথে চলার সময় মনে কোনও ভয় বা শঙ্কা জাগে না এবং এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখার জন্য উৎসাহিত করেন যে-সমাজে সর্বশেষ মানুষটিও সুবিচার পাবে, যেখানে কোনও শিকারির কেউ শিকার হবে না। আলোচ্য 'গান্ধীজী' গ্রন্থটির সবচেয়ে বড় সার্থকতা এই যে এর পাতা ওলটাতে ওলটাতে অবসাদগ্রস্ত আর অভ্যাসে আচ্ছন্ন মন বিতর্কে প্রতিবাদে সমালোচনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। আর বারবার এই কথা ভেবে বিস্মিত হতে হয় যে কেমন মানুষ ছিলেন গান্ধীজি যিনি সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে এক অসম্ভব স্বপ্নের দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে পড়ে বিনা প্রতিরোধে মৃত্যুর মোকাবিলা করে প্রমাণ করলেন যে তিনি মৃত্যুর চেয়ে বড়। কী ছিল তাঁর শক্তির রহস্য যার জন্য সেই অস্ত্রহীন বর্মহীন প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধকে ষড়যন্ত্র

করে হত্যা করল এক মহারাষ্ট্রীয় শিবাজিভক্ত হিন্দু যুবক? কোন্ কারণে গান্ধীকে হত্যা করতে হল? বিনোবাজি ভুল বলেছেন। না, মহাত্মাজীর শক্তি নিঃশেষ হয়নি। তিনি প্রচণ্ড শক্তিমান ছিলেন বলেই তাঁকে হত্যা করতে হল। কিন্তু কে কবে প্রেমকে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছে? মহাত্মা গান্ধী এক ব্যক্তির এক অদৃশ্য অপ্রধৃষ্য সৈন্যবাহিনী। তাঁর অনিঃশেষ শক্তিরহস্যকে অনুধাবনের সমস্ত প্রয়াসই প্রত্যেকই সমাজ-জিজ্ঞাসুর গভীর আগ্রহের বিষয়।

■ **গান্ধীজী** ১২৫ — সম্পাদনা শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা-৭৩ / ৬০ টাকা

# "গেজেটেড সত্যাগ্রহী"

## অশোকেন্দু সেনগুপ্ত

"সুধীন দত্তের কথার উত্তরে আমি বললাম, 'আমি পড়তে পারি, লিখতে পারি না।' সুধীন দত্ত বললেন, 'পড়া! সেত একটা dissipation', আমি উত্তরে বললাম, 'আর লেখা? সে যে একটা discipline, তাই ওটা হয়ে ওঠে না'। এ কথা এখনও আমার সম্পর্কে খাটে, অর্থাৎ নেহাৎ দায়ে না পড়লে কোন একটা বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ খাড়া করা আমার ধাতে নেই।"

(পৃ: ২০)

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লেখার জন্য চাপ দিয়েছিলেন শৈবালকুমার গুপ্তকে, কিন্তু কেন? অশোক মিত্রের লেখায় পাই: তখনকার দিনে ইংরেজি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেলে বাংলা লেখার জন্যও সাহিত্যিক মহলে খাতির পাওয়া যেত (তিন কুড়ি দশ—১ম খণ্ড)। শৈবাল গুপ্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের নামী ছাত্র, ইকনমিক্স অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, ইশান বৃত্তি পেয়েছেন। অনুমান করা যায়, ভাল ছাত্রদের সাহিত্যিক মহলে খাতির ছিল। কিন্তু শুধু মেধা নয়, শুধু অভিজ্ঞতা নয়, লেখার জন্য চাই আরও কিছু। হয়তো, ব্যাখ্যার অযোগ্য ঐ অতিরিক্ত কিছুর অভাব ছিল শৈবালবাবুর, তাই তিনি লেখক ন'ন, হবার চেষ্টাও করলেন না। কিন্তু দায় এড়াতে পারেননি। আত্মজীবনী লেখার কোনও বাসনা থেকে নয়— বর্তমান, চতুরঙ্গ, কম্পাস প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকদের তাড়ায় তিনি নানা সময় কলম ধরেছেন। সেই লেখা ও কিছু ব্যক্তিগত চিঠিপত্র দুই মলাটের ফাঁকে পরিবেশন করেছেন সম্পাদক শ্রী দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়। শৈবালকুমারের মৃত্যু (জুন, ১৯৮৯) ঠিক পাঁচ বছর পরে প্রকাশিত হয় এই স্মৃতিকথা: কিছু স্মৃতি কিছু কথা।

আত্মজীবনী লেখায় লেখকের স্বাধীনতা অবাধ হলেও অসুবিধা বড় কম নয়। আত্মকথার ফাঁকে এসে পড়ে নানা জনের কথা, উঁকি মারে সেই সময়, সেই স্থান। স্মৃতিকথা তাই ইতিহাসের মূল্যবান উপাদানও, একই সঙ্গে তা সাহিত্যের এক বেগবান স্রোত।

'কিছু স্মৃতি কিছু কথা' কেবল স্মৃতিচারণ নয়, এখানে নানা প্রসঙ্গে শৈবালবাবু তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন, যথা: দক্ষকারণ্য, আই. সি. এসের রূপান্তর ইত্যাদি। তাঁর লেখায় সাহিত্যমূল্য যদি বা কম, ঐতিহাসিক মূল্য কিছু কম নয়। স্বাধীনতার কিছু আগে ও কিছু পরে বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে থেকে তিনি বহু কিছু দেখেছেন কাছ থেকে, মনে রাখার মতো কাজও তিনি করেছেন কিছু, গর্ব করার মতো ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর।

"সালটা ১৯২৮। ব্রাউয়েজ আর দু'একটা কথার পরেই বলে উঠল—পুলিশ আর দা গভর্নমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট আর দা পুলিশ। আমি উঠে দাঁড়িয়ে এই বলে চলে এলাম—এই যদি তোমার মনোভাব হয়, তোমার সঙ্গে কথা বলা একেবারেই আমার সময়ের অপব্যয়। পুলিশ আর নট দা গভর্নমেণ্ট, গভর্নমেণ্ট আর নট দা পুলিশ।"

(পৃ: ৫১-৫২)

এমন একজন মেরুদণ্ডী প্রাণীকে চিনতে ভুল হয় না সরকার বাহাদুরের। দ্রুত তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় অন্যত্র। একবার নয় বারবার। সাহেব কর্তারা খোঁচা মারেন:

"ডিস্ট্রিক্ট জাজ জ্যাকসন নাক সিটকে বললে, you are a gazetted Satyagrahi" (পৃ: ৬৪)।

এমন এক দৃঢ়চেতা গেজেটেড সত্যাগ্রহীর জীবনের গল্পে পাঠকের আগ্রহ স্বাভাবিক। নিজ আতীয়-স্বজনের পরিচয় দু-চার কথায় সেরে লেখক তাঁর হোস্টেল জীবনের গল্প শুনিয়েছেন। সময়ের সাথে কত কী বদল হয়, আবার কিছু জিনিস বদলায়ও না। ইডেন হিন্দু হোস্টেলের মেস কমিটির গল্প পড়ে বর্তমান আলোচক বিস্মিত। নিজ হোস্টেল জীবনের স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে



দেখে অনায়াসে বলতে পারি— সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে! আবার খুব রাগও হয় লেখকের ওপর। গল্প বেশ জমে ওঠার আগেই তিনি গল্প দ্রুত টানে শেষ করে ফেলেন। প্রথমেই লেখক জানিয়ে দেন: 'হিন্দু হোস্টেলের কথা বললে পুঁথি বেড়ে যাবে, সুতরাং এখানেই দাঁড়ি টানব' (পৃ: ২৫)। পুঁথি বেড়ে যাবার ভয়টা যেন লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক সকলকেই তাড়া করেছে। প্রায় চল্লিশ বছর (১৯২৫-৬৪) যে মানুষটা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন নানা সামাজিক ও জনহিতকর সংস্থার সঙ্গে তাঁর স্মৃতিকথার দৈর্ঘ্য মাত্র শ'দুয়েক পাতা! Brevity is soul of wit মেনেও কোনও পাঠক অতি সংক্ষিপ্ত এই গ্রন্থপাঠে তৃপ্ত হতে পারেন না। বহু ক্ষেত্রে লেখক সংক্ষেপে সারতে গিয়ে মূল বিষয়কে অবহেলা করেছেন, মিতভাষণের ফলে বহু সত্য রয়ে গেল অন্ধকারেই। তবু বলি, যা পেয়েছি তার মূল্যও কিছু কম নয়।

১৯৩০-এ লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের এক প্রধান কেন্দ্র কাঁথি মহকুমা। মহকুমা শাসক— শৈবালকুমার গুপ্ত, জেলা কালেক্টার জেমস্ পেডি। অহিংস আন্দোলন দমনে বেআইনি পথ নিতে চান না মহকুমা শাসক। তিনি পেডিকে বলছেন যে, তোমরা যে পথে যাচ্ছ তাতে you will be provoking them into violence , পেডি বললে, That's what I want. As long as they remain non-violent it is very difficult for us. It they become violent, we can crush it in a day.

(পৃ: ৬১)

শৈবালবাবু তখন চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভেবেছেন। দেশপ্রেম ও মানবিকতায় আর্দ্রহৃদয় তরুণ আই.সি.এস. পরামর্শের জন্য অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের কাছে গেলেন। তিনি বললেন, অন্নদারা (অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, প: বঙ্গের প্রথম অর্থমন্ত্রী) যে তোমাকে ছাড়তে বলেছে সেটা তো ওদের পক্ষে স্বাভাবিক, কারণ তাতে সাময়িকভাবে ওদের আন্দোলন জোরদার হবে, কিন্তু আমি শুধু আন্দোলনের কথাটাই ভাবছি না। তোমার দিকটাও ভাবছি। (পৃ: ৬৩)

চাকরি আর ছাড়া হল না। কেবল বাইরে থেকে নয়, ভেতর থেকেও লড়াই হয়, তারও মূল্য আছে। সুরেন বাঁড়ুজ্জে, বি. এল. গুপ্ত, রমেশচন্দ্র দত্তের উল্লেখও এ বইতে আছে। তাঁরা সকলেই ধাক্কা খেয়েছেন কিন্তু লড়াই-এর ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাননি। শৈবালবাবু মহাত্মজীর পথ অনুসরণ করেছেন, লড়েছেন তাঁর সাধ্যমতো। তাঁর আমলে সহিংস ও অহিংস দুটো আন্দোলনেরই প্রবল রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। বহু বিপ্লবী, বহু সমাজবাদী নেতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাঁদের অনেককেই তিনি সাহায্য করেছেন। অশোক মিত্র তাঁর 'তিন কুড়ি দশ' গ্রন্থে লিখেছেন, শৈবাল গুপ্ত বাড়িতে খদ্দর পরতেন। এমন একজন অফিসারকে রাজশক্তি যে বিদায় করে দেয়নি তাই তো যথেষ্ট!

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক ইংরেজ অফিসারদের নির্লজ্জ অহঙ্কার আর ঔদ্ধত্যের পাশাপাশি দিশি সাহেবদের চাটুকারিতারও কিছু নমুনা পেশ করেছেন। যেমন:

কয়েক মাস দমননীতি চালাবার পর ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মি: পেডি যখন বললেন, 'যথেষ্ট দমননীতি চালিয়েছি, এবার conciliation-এর পথ অনুসরণ করে দেখি কী হয়', তখন তাঁর সহকর্মী একজন বাঙালী সিভিলিয়ান বলে, No Peddie, we shall then be undoing all the good work we have done so far.' (পৃ: ১৬৫)

অত্যাচারী পেডি এর এক বছর পরেই বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ হারান। কিন্তু তাঁর সহযোগী দিশি সাহেবদের কপালে কী পুরস্কার জুটেছিল তা জানার সুযোগ দেননি শৈবালবাবু।

বিদেশি সাহেবদের নিন্দের পাশাপাশি তাঁদের চরিত্রের ভাল দিকেরও উল্লেখ আছে শৈবাল গুপ্তের এই গ্রন্থে। যথেচ্ছ স্তালাতন করার পরও পেডি শৈবালবাবু সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, I have the greatest respect for that man (পৃ: ৬৪)। লেখক ঐ মন্তব্যটি জীবনসায়াহ্নে এসেও মনে রেখেছেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাস বিচার করলে কারও মনে সংশয় থাকে না যে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকুক এমনটা চায় না কোনও কোনও ব্যক্তি ও গোষ্ঠী। এই গ্রন্থে দাঙ্গার যে ক'টি ঘটনার উল্লেখ আছে তা থেকেও আমরা ঐ একই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। ধর্ম কোনও সমস্যা নয়, বিভেদের বৈষম্যের জনক নয়— সমস্যা ধর্মব্যবসায়ীর দল। তারা নানা সাজে নানান রাজনৈতিক, ধর্মীয় সংগঠনে মিশে আছে, আছে প্রশাসনিক পদেও। দাঙ্গা বাধতে পারত কিন্তু বাধেনি এমন একটা গল্পের সারাংশ উল্লেখ না করলেই নয়।—

একদিন এক বয়স্ক মহিলা এসে নালিশ করলেন যে তাঁর অবিবাহিতা মেয়েকে একজন মুসলমান জোর করে নিয়ে গেছে।...মামলাটা যখন উঠল তখন বোঝা গেল মহিলাটি মেয়েকে নিয়ে ব্যবসা চালাতেন....কন্যাটির তথাকথিত অপহরণকারী তাকে 'বহু পরিচর্যা' বৃত্তির লজ্জা থেকে মুক্তি দিয়ে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছে বলে কন্যার উপার্জনে বঞ্চিত মায়ের তরফে মিথ্যা নালিশ রুজু হয়েছে (পৃ: ৪৩)।

শৈবাল গুপ্তের তখন বয়স মাত্র পঁচিশ বছর। ধর্মের নামে তাঁকে ঠকানো যায়নি। ৪০-৪১ সালে একই রকম অন্য এক ঘটনা প্রায় ঠকিয়ে দিয়েছিল তখনকার হিন্দু মহাসভার প্রধান নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। শৈবালবাবু লিখেছেন—

আমার স্ত্রী কলকাতায় গিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে বলেন যে ...এটি প্রকৃত 'নারী হরণ'

নয়। এদের 'উদ্ধার' করতে গেলে এদের ওপর অন্যায় ও অবিচার করা হবে। এদের নিজেদের জীবন নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করবার সুযোগ দেওয়াই ভালো। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সব কথা শুনে এ বিষয়ে আর কিছু বলতে বললেন না (পৃ: ৭১)।

শ্যামাপ্রসাদ সাম্প্রদায়িক দলের নেতৃত্ব দিলেও নিজে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন না এমন বিশ্বাস করার কিছু কারণ আছে। 'নারীঘটিত ঘটনাকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যে দেখা যেতে পারে এ ভাবনা প্রগতিশীল ব্যক্তিদের মধ্যেও বিরল ছিল' (পৃ: ৭২)—এ মন্তব্য আজও সত্য। সে কালে তাঁর চোখে তবু কিছু ব্যতিক্রম ধরা পড়েছে। এ কালে পূর্ণ দাশ, ফজলুল হক, শ্যামাপ্রসাদরা হারিয়ে গেছেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মুসলমান সম্প্রদায়ের সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্রও লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। লেখক যে নিরপেক্ষ প্রশাসক ছিলেন তা অনুমানে কষ্ট হয় না।

স্বাধীনতার পর নতুন দেশ গড়ায় আই. সি. এস-দের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করেছেন শৈবালবাবু।

"এতদিন পরে আমাদের সুযোগ এসেছে আমাদের দেশটা সুন্দর করে গড়ে তোলবার" (পৃ: ১৬৬)।—সার্ভিসের অনেক অফিসারের এ ছিল মনের কথা। তার পরেও স্টিল ফ্রেম কেমন করে গলে গেল, কেন দেখা দিল নৈতিক সাহসের অভাব, সত্যভাষণের চেয়ে প্রিয়ভাষণে কর্তাদের তুষ্ট করার চেষ্টা কেন তার কারণ খুঁজেছেন লেখক। দু'টি কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন: 'আমলাবর্গের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অথবা কেরিয়ারপ্রীতি' এবং 'মন্ত্রীবর্গের নিজেদের অভিপ্রায় সিদ্ধিতে অতিরিক্ত আগ্রহ ও পরমত-অসহিষ্ণুতা।' তাছাড়াও আছে 'কোন কোন মন্ত্রীর অযোগ্যতা'। প্রতিদিনই অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে দেশ, দুর্নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে একটা জাতি, শৈবালবাবুর মন্তব্য মনে রাখার মতো মানুষ কোথায়!

স্বাধীনতার পরও দীর্ঘদিন শৈবাল গুপ্ত সরকারি চাকরিতে ছিলেন। এই পর্বে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ সি. আই.টি-র চেয়ারম্যান হয়ে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম নির্মাণ। এই পর্বের অন্যতম নায়ক ডা: বিধানচন্দ্র রায়। তাঁদের মতান্তর মনান্তরের অনেক গল্প শুনিয়েছেন লেখক। ডা: রায় সম্পর্কে শৈবালবাবুর মন্তব্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য: আমাদের দেশে বিগত কয়েক দশকের ইতিহাসে পণ্ডিত নেহরু যদি হ'ন হ্যামলেট আর সর্দার হ'ন বিসমার্ক তবে ড. বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন নিঃসন্দেহে অলিভার ক্রমওয়েল। (পৃ: ১০৭)

অবসর গ্রহণের পর শৈবাল গুপ্ত দণ্ডকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। তাঁর কাজে বিভাগীয় মন্ত্রী পদে পদে বাধা দিয়েছেন, তাই ক্ষোভে দুঃখে কাজ ছেড়ে চলে এসেছেন তিনি। তাঁর দীর্ঘ পদত্যাগপত্রটি এই গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এখন আর উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে কোনও ভাবনা-চিন্তার প্রকাশ নজরে আসে না। যেন সে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। ভুলে যাওয়াও একটা সমাধান বটে। তবে, যাঁরা ভোলেননি, ভোলার উপায় নেই, তাঁরা শৈবালবাবুর লেখা পড়ে উপকৃত হবেন আশা করা যায়। যদিও বর্তমান আলোচকের ধারণা, দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের যে ছবি এ লেখা থেকে পাওয়া যায়, বর্তমানে ছবিটি হয়তো ততটা হতাশার নয়। মরিচঝাঁপি আমাদের কলঙ্ক। এ কলঙ্কের বোঝা বইতে হত না যদি হৃদয় দিয়ে সমস্যা সমাধানে সরকার পক্ষ এগোতেন, যদি সঠিক তথ্য ও যুক্তি দিয়ে সরকার বোঝাতে পারতেন যে দণ্ডকারণ্যের চেয়ে মরিচঝাঁপির জীবন সুখের হবার নয়।

■ **কিছু স্মৃতি কিছু কথা**—শৈবালকুমার গুপ্ত/এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা/৪৫ টাকা

# অন্য পাকিস্তানের কণ্ঠস্বর

## শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যার দেশে সুখে শান্তিতে থাকবে বলে ভারত ও পাকিস্তান ঠাঁই ঠাঁই হয়েছিল। কিন্তু তার পর প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল কেটে গেলেও দেশ দুটি ভাই ভাই হয়নি। ১৯৪৭ খ্রি. পূর্বের বিবাদের জের এখনও চলছে। যা ছিল গৃহবিবাদ, হয়ে দাঁড়িয়েছে আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ। আর পিঠের ভাগ নিয়ে বিড়ালদের লড়াই-এ মধ্যস্থতা করার জন্য চিরকালই 'নিরপেক্ষ' বানরেরা জুটে যায়। উভয় রাষ্ট্রই স্বদেশবাসীর অর্ধেককে ক্ষুধার্ত, বিবস্ত্র, অশিক্ষিত ও অচিকিৎসিত রেখে অস্ত্রসজ্জার পিছনে সীমিত সম্পদের বড় একটা অংশ ব্যয় করছে। আর মজার কথা, দুই দেশের সেই গরীবের বুকের রক্ত জল করা সম্পদে ধনী হচ্ছে বানরের ভূমিকা পালনকারীদের দেশের মারণাস্ত্র উৎপাদকবর্গ ও তাদের প্রসাদপুষ্ট ভারত-পাকিস্তানের অস্ত্র আমদানীকারী ব্যবসায়ী, আমলা ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গ।

পঞ্চাশ বছর কাটতে চললেও কোন দেশেরই জনমত সৃষ্টিকারী বুদ্ধিজীবী ও নেতৃবর্গ নিজ নিজ দেশকে এই মরণফেলা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়নি। এর বড় একটি কারণ হল



এই যে দুই দেশই পরস্পরের বিরুদ্ধে চীনের প্রাচীর খাড়া করে দিয়েছে। এক দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নর-নারীদের অভিমত অপর দেশবাসীর জানার উপায় নেই। সব দেশেই বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রগুলি সাধারণত শাসকদের পোঁ-ধরা হয়। কখনও জাতীয় অহমিকার (রবীন্দ্রনাথের 'ন্যাশনালিজম' সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী এ রোগের চিকিৎসার জন্য বার বার পড়া উচিত, যা তাঁর "আত্মশক্তি ও সমূহ", "রাজা প্রজা," "পরিচয়" ও "কালান্তর" পর্যায়ে পাওয়া যাবে) মতো 'উচ্চতর আদর্শ', কখনও বা সস্তা নিউজপ্রিন্টের কোটা বা সরকারি বিজ্ঞাপনের টোপের মতো নেহাৎই স্থূল আবেদন অধিকাংশ সংবাদপত্রকে "বাবু যত বলে / পারিষদ দলে / বলে তার শতগুণ" ভূমিকা পালনে অনুপ্রাণিত করে। এই পরিস্থিতিতে উভয় দেশেরই যুক্তিবাদী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নর-নারীদের অভিমত যেসব পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় সেগুলি বহুল প্রচারিত নয়। তাছাড়া সেগুলি দু-দেশে অবাধে যাবার উপায়ও নেই সরকারি বিধিনিষেধের কৃপায়। আর প্রায়ই এ নিয়ন্ত্রণ হয় প্রচ্ছন্ন ধরনের। এক অঘোষিত নিষেধাজ্ঞার কারণে দুই দেশের ডাকবিভাগই একটি ক্ষেত্রে খুবই দক্ষ হয়ে ওঠে—যাতে পত্র-পত্রিকাগুলি নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে না পৌঁছায়। চিঠির মাধ্যমে মানুষে-মানুষে যোগাযোগ করবেন? সে গুড়েও বালি। ভারত থেকে পাকিস্তানে সাধারণ ডাকে চিঠি পাঠানোর খরচ বহু সহস্র মাইল দূরের ইংল্যান্ড বা আমেরিকার ডাক-ব্যয়েরও বেশি।

উভয় দেশের সরকারই যখন এই ভাবে ভারতবাসী ও পাকিস্তানিদের প্রায় প্রেমরোগীদের মতো বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেষ্টায় রত, তখন দু দেশেই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নর-নারীদের কয়েকটি ছোটখাট গোষ্ঠী পরস্পরকে জানার ও চেনার মহৎ এবং দুষ্কর কর্তব্যে রত। এর মধ্যে একটি হল দুই বৎসর যাবৎ কর্মরত "পাকিস্তান-ইন্ডিয়া পিপলস ফোরাম ফর পিস অ্যান্ড ডেমোক্রেসি।" ভারতের ভূতপূর্ব ক্যাবিনেট সচিব নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায় এবং পাকিস্তানের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং একদা জুলফিকার আলি ভুট্টোর মন্ত্রিসভার সদস্য ড. মুবাসির হাসানের নেতৃত্বে শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, চিত্রকলা, অভিনয়কলা, সমাজসেবা ও শ্রমিক সংগঠন প্রমুখ প্রধানত রাজনীতিবিহির্ভূত ক্ষেত্রের কয়েক শত বিশিষ্ট ব্যক্তি চেষ্টা শুরু করেছেন নিজ নিজ দেশে উভয় দেশের অধিবাসীদের মধ্যে প্রতিবেশীসুলভ সদ্ভাব সৃষ্টি করার জন্য। দুই দেশের মধ্যে গড়ে ওঠা চীনের প্রাচীর ভাঙ্গার প্রথম পদক্ষেপ হল পরস্পরকে জানা। কারণ রাজনীতির স্বার্থে দুই দেশেই পরস্পর সম্বন্ধে একটা ছককাটা ধারণা গড়ে তোলা হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধে এই ছককাটা ধারণার জন্যই প্রধানত ভারতবিভাজন ঘটেছিল। কিন্তু সত্য হল এই যে যেমন সব ভারতবাসীই সরকারের সব নীতির সমর্থক নয় অথবা অধিকাংশ ভারতীয় হিন্দুই যেমন সরকারি ক্ষমতালোভে ব্যগ্র একটি বিশেষ দলের রাজনৈতিক হিন্দুত্বের ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী নয়, তেমনই সব পাকিস্তানিই বেনজির সরকারের পারমাণবিক বোমা বানাবার প্রয়াস অথবা কাশ্মীরে গণ্ডগোল পাকানোর প্রয়াসকে সমর্থন করেন না। পাকিস্তানের এই প্রতিবেদী কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে এদেশবাসীকে অবহিত করার জন্য পাকিস্তান ইন্ডিয়া পিপলস ফোরাম এদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের প্রবন্ধ, কবিতা ও কাহিনীর এক সঙ্কলন ইংরাজিতে প্রকাশিত করেছিলেন এক বৎসর পূর্বে "Other Voices from Pakistan" নামে। পশ্চিমবঙ্গে ফোরামের কর্মীদের উদ্যোগে এত নীচু এমন এক মূল্যবান ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থের (ঈষৎ সংক্ষেপিত) সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এ অত্যন্ত সুখের কথা।

সঙ্কলনের প্রত্যেকটি রচনাই উচ্চাঙ্গের। প্রতিটিই পাকিস্তানের ছককাটা মূর্তির বদলে তার আসল স্বরূপ বোঝার সহায়ক। ওদেশের নর-নারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার (কেরামত আলি ও বি. এম কুট্টি), মানবাধিকার (আই. এ. রেহমান)—বিশেষ করে নারীর অধিকার (ফরিদা শহীদ ও গওয়ার মমতাজ) প্রতিষ্ঠার কঠিন সংগ্রামের বিবরণ, প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ববন্ধন গড়ে তোলার ইচ্ছার প্রতিফলনও (মুবাসির হাসান) মেলে একাধিক রচনায়। পাকিস্তানের সমরসজ্জা ও পরমাণু-শক্তি চর্চার অযৌক্তিকতাও কেউ কেউ (তরুণ বিজ্ঞানী জিয়া মিঞা ও পরভেজ হুদভা) তুলে ধরেছেন অতীব বিশ্বাসযোগ্য ভাবে। পাকিস্তানে নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা, সংবাদমাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে যেসব লড়াই চলছে (জামিল নিয়াজি) তার বিবরণ ছাড়াও আইনের মাধ্যমে যেসব নির্যাতন চলছে (রশিদ এ. রিজভি) তার বিবরণ এদেশের মানবাধিকারের জন্য সংগ্রামরত কর্মী ও গোষ্ঠীগুলিকে অনুপ্রাণিত করবে। পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট থেকে দুটি উদ্ধৃতিতে ঐ বিষয় ছাড়াও বিশেষ করে ধর্মোপাসনার স্বাধীনতা কী ভাবে কুণ্ঠিত করা হচ্ছে তার বিবরণ পাওয়া যায়। এ-ও জানা যায় যে তার বিরুদ্ধে ওদেশের মানবাধিকারের কর্মীরা কী কঠিন লড়াই লড়ছেন। হামজা আলভির 'জাতিবোধের সামাজিক ভিত্তিগুলি' নামক সুলিখিত প্রবন্ধটি ওদেশের নূতন যুগের সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষকরা কী ভাবে দ্বিজাতি তত্ত্ব বাতিল করে আধুনিক বিজ্ঞাননিষ্ঠ ধ্যানধারণার প্রচার করছেন, তার একটি বলিষ্ঠ উদাহরণ। চাকুরিজীবী শ্রেণীর (salariat) স্বার্থ কীভাবে স্যার সৈয়দ থেকে শুরু করে মুসলিম লিগ নেতৃবৃন্দকে পরিচালিত করে হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে বাড়াতে বাড়াতে শেষ অবধি

ভারত বিভাজন করে তার অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ও তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ পেশ করেছেন লেখক। প্রবন্ধটি সংকলনের অমূল্য সম্পদ।

ওদেশের কিছু নির্বাচিত কবিতা ও কাহিনী পরিবেশন করায় সঙ্কলনটি প্রতিনিধিধর্মী হয়েছে। বলা বাহুল্য, সঙ্গতভাবেই এতে অগ্রাধিকার পেয়েছেন ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ, যাঁর প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব বার বার নিগ্রহ বরণের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ। অপরাপর কবিদের মধ্যে আছেন কিশওয়ার নাহীদ, ফহমিদা রিয়াজ, আহমদ ফরাকা ও আফজল আহমদ সৈয়দ প্রমুখ। বঙ্গানুবাদ যথাসম্ভব ভাল হলেও অনুবাদের অনুবাদের (উর্দু থেকে ইংরাজি ও তারপর বাংলা) একটা অপূর্ণতা রয়েই যায়, যার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। তবে একই ভাবে ইংরাজি থেকে অনুবাদ হলেও গল্পের রসাস্বাদনে তেমন কোন বাধার সৃষ্টি হয় না। তাই ফকরে জমাঁ, ইন্তেজার হুসেন, অমর জলীল ও আহমদ নাদীম কাশমি-এর মতো আধুনিক পাকিস্তানি কথাসাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বাঙালি পাঠক খুশি হবেন সন্দেহ নেই।

সুদূর আমেরিকা, পেরু, বলিভিয়া বা রাশিয়া, জাপান, কোরিয়ার মানুষদের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আমাদের আছে। কিন্তু সে তুলনায় আমাদের ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী এবং মাত্র অর্ধশতাব্দীকাল পূর্বে যাঁরা আমাদের আত্মার আত্মীয় ছিলেন এবং যাঁদের বিচ্ছেদে সঙ্গত কারণেই দুই দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের হৃৎপিণ্ড থেকে রক্তমোক্ষণ হচ্ছে, তাঁদের ধ্যান-ধারণা, আনন্দ-বেদনা, হাসি-অশ্রু সম্বন্ধে জানার সুযোগ অত্যন্ত সঙ্কুচিত। রাজনৈতিক স্বার্থচালিত এই ভেদনীতির নিষেধের বেড়াজাল ভেঙ্গে যাঁরা আমাদের কাছে পাকিস্তানের একট ছোট্ট ঝরোকা খুলে দিয়ে ওদেশের হৃদয়পুরে উঁকি মারার সুযোগ করে দিলেন, তাঁরা সবার ধন্যবাদার্হ। এ-গ্রন্থ দু দেশের কল্যাণকামী বাঙালির হাতে হাতে ফিরবে। এমনই আরও সঙ্কলন 'ফোরাম' প্রকাশ করার ব্যবস্থা করবেন এবং তাঁদের পাকিস্তানি বন্ধুরাও ভারত সম্বন্ধে এমনই সঙ্কলন প্রকাশ করবেন— আমরা এই আশা পোষণ করব।

■ **অন্য পাকিস্তান** — সম্পাদনা রণবীর সমাদ্দার / ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ, ৭৬ মহারাজা টেগোর রোড, কলকাতা-৩১ / *পরিবেশক*, পুনশ্চ; ৯ এ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯ / ৮০ টাকা

# যৌবনের কবি

## ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অরুণকুমার সরকার নিষ্পাপ সরল যৌবনের কবি।

সাধারণত বড় মাপের সৃজনশীল মানুষদের মধ্যে এক ধরণের সরলতা লক্ষ করা যায়। মনে হয়, যে চোখে তাঁরা সংসারের দিকে তাকান সে যেন আমাদের চোখ নয়, যে আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তাঁরা ধরায় এসেছেন, সে আলো হয়তো আপনার আমার মতো সাংসারিক লোকের চোখেও, যতই ক্ষীণ আভায় হোক, কোনও এক সুদূর শৈশবের দিনে, জ্বলত, কিন্তু আমাদের সাংসারিক বুদ্ধি, যাকে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস বলতেন পাটোয়ারি বুদ্ধি, দেখতে দেখতে এত প্রবল হয়ে উঠেছে, গোঁফ পাকবার আগেই বুদ্ধি এত পেকে উঠেছে যে সে বেচারি তাড়াতাড়ি পালিয়ে বেঁচেছে। অরুণকুমার সরকারের গোঁফ থাকলে হয়তো তাতে পাক ধরত, কিন্তু বুদ্ধি কোনও দিন পাকেনি। তাই পরিণত বয়সে তিনি নিজের ছেলেকে বলতে পেরেছেন,

তুমি ফল পাবে বলে
এই বৃক্ষ রোপণ করছি
যখন সবুজ পাতা
ঝিকমিক করে উঠবে
শীতশেষে নরম রোদ্দুরে
তখন থাকব না আমি
তুমি থাকবে, বাতাসও থাকবে,
ক্ষণিক অচেনা পাখি
ডালে বসে ফের উড়ে যাবে।
রোজ একটু জল দিও গাছে
জল দিও।

(আমার ছেলেকে : ১)

অতি ক্ষুদ্র কবিতা, তাই সবটাই দিলাম। তা ছাড়া, এত ছোট একটা আশা, একটা স্বপ্ন, একটা বিশ্বাস, এর কোথায় কাটব, কী বাদ দেব?

একটা গভীর বিষাদে সারা মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এই একজন ছিল, ভালবেসেছিল, স্বপ্ন দেখেছিল, চশমাজোড়া আর কলমটা নামিয়ে রেখে চলে গেল। আর আমরা? নাকের ডগায় চশমা, কানে গোঁজা কলম, সামনে খেরোবাঁধানো খাতা খোলা আছে। স্বপ্নও নেই, ভালবাসাও নেই। "নবীন যুবক," বড় ব্যগ্র হয়ে কবি জিজ্ঞাসা করছেন, "বিদেশী তোমার ভাষা," কোন জগতের লোক তুমি, আমি জানি না, আমার ভাষা হয়তো তুমি বুঝবে না, তবু এইটুকু শুধু তোমার পাশে দাঁড়ানো যুবতীকে জিজ্ঞেস করি, "যুবতী, হৃদয়ে রেখেছ তো ভালবাসা?"

আবার এই কবিই কোণ-ঠাসা বিড়ালের মতো ফুঁসে উঠেছেন :

শুধু প্রেম নয়, কিছু ঘৃণা রেখো মনে,
যেমন অনেক বৃক্ষ কোমলাঙ্গ কাঁটা দিয়ে ঢাকে।
আছে লালসার দাঁত, লোভের বিকট জিহ্বা,
প্রভুত্বের লোমশ লাঙুল
ব্যঙ্গের কুঠার, ঈর্ষা, অন্যায়ের সহসা ছোবল
সইবে কেমনে?
শুধু প্রেম নয় তাই যুগপৎ ঘৃণা রেখো মনে।

(শুধু প্রেম নয়)

যেমন প্রেম তেমনই ঘৃণাও তীব্র নিশাদে ঝংকার দেয় অরুণকুমারের কবিতায়। যে তারে প্রেম অধীর হয়ে বাজে, সেই একই তারে ঘৃণা থরথর করে কাঁপতে থাকে অসহ্য আক্রোশে। যেমন,

তোমাকে চাই আমি, তোমাকে চাই
তোমাকে ছাড়া নেই, শান্তি নেই;
রক্তকিংশুকে জ্বালিয়ে দাও
আমার বৈশাখী রাত্রিদিন।

(বৈশাখী)

তেমনই আবার :

পালিয়ে আয়। কামড়ে দেবে। দাঁতমুখ-খিঁচোনো দলভারী
খেঁকি কবন্ধেরা বড় সাংঘাতিক, বিষাক্ত একজোট।

(হিতকথা)

স্পষ্ট শুনি, একই কণ্ঠস্বর, সেতারের তারে একই আঙুল। ছন্দের হেরফেরে অন্য সুর বেজে উঠল। রক্তকিংশুকের আগুন দীর্ঘবিসর্পিত হয়ে গ্রাস করতে চাইল

উটার জঞ্জাল নোংরা, অক্ষমের বিকৃত আক্রোশ

বইয়ের শুরুতে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অরুণকুমার সরকারের ছন্দের অসামান্য শক্তির কথা বলেছেন। সত্যিই, অরুণকুমারের ছন্দে দেখতে পাই সেই অসামান্য শক্তি ছত্রে ছত্রে সংহত আছে। সর্বত্র রাশ টেনে ধরা, সর্বত্র শুনতে পাই টগবগ করছে অস্থির ঘোড়ার খুরের আওয়াজ, একটু আলগা দিলেই সে ঘোড়া ছুটতে পারে পাথুরে জমিতে আগুনের ফুলকি ছুটিয়ে। "Out of the strength came forth sweetness," বলেছেন স্বনামধন্য ইংরেজ সমালোচক ওয়াল্টার পেটার। কবিতা মানে ভাবালুতা নয় কবিতার প্রেম অক্ষমের ভাবোচ্ছ্বাস নয়, কবিতায় ঘৃণা, সেও ব্রেকের সেই বিখ্যাত কবিতার বাঘের মতো, তার শক্তিমান পেশী যার হাতে গড়া তার স্কন্ধে অপরিসীম বল।

অথচ অরুণকুমার সরকার প্রেমের কবি। যদিও তাঁর এই কবিতাসমগ্রে শ'দুই কবিতার মধ্যে প্রেমের কিংবা প্রেমবিষয়ক কবিতার সংখ্যা বড় জোর চৌত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ, তবু, বৃক্ষতে ভুল হয় না, প্রেমেরই প্রাধান্য তাঁর কবিসত্ত্বায়। এবং সে প্রেম যে রোম্যান্টিক প্রেম তাতেও কোনও ভুল নেই।

সিন্দুক নেই; স্বর্ণ আনিনি,
এনেছি ভিক্ষালব্ধ ধানা।
ও-দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের
পাব কি পরশ যৎসামান্য?

এর পরেও যদি সন্দেহ থাকে, তবে আর এক পা এগিয়ে যাই :

দূরাশা আমার সীমাহীন বটে
তবুও কি জানি দৈবে কী ঘটে।

(জন্মদিনে)

তবে সে রোমান্টিকতা তো সোজাসুজি আসেনি তাঁর মধ্যে দিয়ে, কিংবা তাঁর কাছে, খানিকটা refracted, প্রতিসৃত হয়ে এসেছে। আলো যখন এক মাধ্যম থেকে আরেকটা মাধ্যমের মধ্যে প্রবেশ করে, তার কম-বেশি প্রতিসরণ হতে বাধ্য, এই যুগে, এই দেশে রোমান্টিক প্রেম খানিকটা বাঁকা পথ নেবে, তাতে আর আশ্চর্য কী। অরুণকুমারের প্রেমে এসে মিশেছে নানাবিধ সচেতনতা, কখনও তাঁকে কুণ্ঠিত করেছে, কখনও বেপরোয়া করেছে, কখনও তিক্ত কষায় স্বাদ দিয়েছে। কখনও তিনি বলেছেন,

এসো নাকো আমার শয্যায়
এসো নাকো প্রাত্যহিকতায়
ভারী হয়ে উঠেছে মন,
এইখানে বিষণ্ণ এ ঘরে
প্রেম আশা স্বপ্ন যায় ঝরে

(অন্য কোনো মেয়েকে)

আবার তিনি তখনকার জন্যে সব দ্বিধা-সন্দেহ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলছেন :

তোমাকে ভালবেসেছি, কুন্তলা,
স্বপ্ন যেন আমার পথ-চলা,
নৃত্য যেন আমার রাত্রিদিন
হৃদয় লঘু বাতাসে উড্ডীন।
তোমার প্রেম হোক না শুধু ছলা,
তোমাকে ভালবেসেছি কুন্তলা!

(কুন্তলার জন্যে)

আবার যখন দেখেন, আশপাশ থেকে 'কদাকার এই পৃথিবী'

বড় কঠিন বাস্তব হয়ে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ছে, তখনও :

মালবিকা হালদারকে মনে পড়ে বর্ষার সন্ধ্যায়
ব্রিস্টলে টেম্পেলে মস্টিকার্লোর প্রেক্ষিতে।
তার চোখ তার মুখ অভিনব আশ্চর্য গোধূলি
মেঘাকীর্ণ সময়ের মনোলীন মন্থরতায়
মালবিকা হালদারের মুখ মনে পড়ে।

(মালবিকা হালদার)

এই কবিতার ক্লান্ত টেনে টেনে চলা, ভারাক্রান্ত ছন্দ সেই নারীকে যেন এক দুর্বহ জীবনের মাঝখানে এক লোকোত্তর অস্তিত্বের স্বপ্নের মতো স্থাপন করেছে।

যখন সত্যি সত্যি দুর্বহ হয়ে ওঠে অস্তিত্বের ভার, হঠাৎ কোনও এক অপ্রত্যাশিত মিলের ঝলকে মনে হয় মনের বোঝা নেমে গেল, মনে হয় ভারসাম্য ফিরে এল, বুঝলাম এ-সব তেমন কোনও ব্যাপার নয়, কবিতাও আসলে একটা খেলা, মিল নিয়ে, ছন্দ নিয়ে, উপমা, উৎপ্রেক্ষা নিয়ে দু-দণ্ড ভুলে থাকার খেলা।

লিংলুম বিচিত্রা দাশকে
বহুদিন দেখিনি আকাশকে
উষ্ণ তোমার স্মৃতি তবুও
আমার এ হৃদয়ের ফ্লাস্কে। (বিচিত্রা দাস)

অপ্রত্যাশিত মিল আর চমক লাগানো উপমা, এ-সব সত্যিই মনে রাখবার মতো। মনে থেকে যায়। কবিতার নানা সংজ্ঞা নানা জনে দিয়েছেন, তার মধ্যে একটি হল অডেন-এর, Poetry is memorable speech. এই সংজ্ঞা পুরোপুরি ঠিক হোক বা না হোক (অনেক সময়ে অসাধারণ কাব্যগুণ ছাড়াও অন্য কারণে অনেক লাইন মনে থেকে যায়) অরুণকুমারের যে-সব লাইন অনেক পাঠকের মনে অক্ষয় হয়ে আছে তার অনেকগুলিই আশ্চর্যজনক, অবিস্মরণীয় উপমার জন্যে, আবার কোনও কোনটি এই কারণে যে, সংহত সূত্রের মতো তার মধ্যে ধরা আছে অনেকের অনেক চিন্তা-ভাবনা-অভিজ্ঞতা।

কিন্তু সমগ্রভাবে অরুণকুমার সরকার এমন যৌবনসুলভ সরলতায় আমাদের জটিল অস্তিত্বের দিকে তাকিয়েছিলেন এবং এমন অমোঘ শক্তিতে তার মর্মভেদ করেছিলেন যে, যতদিন যাবে, আমরা তত বুঝতে পারব, তাঁকে ভুলবার জো নেই। □

■ **কবিতাসমগ্র** — অরুণকুমার সরকার / আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯ / ৪০ টাকা

# কবি হরপ্রসাদ প্রসঙ্গে কিছু কথা

কান্তি গুপ্ত

'ফুলের ফলের তরু লতায় নদী গিরির রূপ
ছয় ঋতুর ছলা কলার বিবিধ নাচ গান
তারি মধ্যে মানব মনে মিল আর গরমিল,
এমন ছিল আগেও আর এখনো আছে তাই
সময় বটে বদলে গেছে ভাষাও বদলায়,
শান্ত হওয়া কঠিন যদি স্বভাবে থাকে বাঁক।'

(অকেজো দূরবীন)

১৯৮৮'র জুন মাসের কিছুদিন আগে দেখা করতে গিয়েছিলাম। নানা কথা : দেশ সময় কাল, পরস্পরের পারিবারিক প্রসঙ্গ, কয়েকটি বই-টই ও নতুন লেখা-টেখার খবর ইত্যাদি অন্তে আমার অনুরোধেই কবিতার খাতাটি খুললেন। কয়েকটি কবিতার সঙ্গে সেদিন পাঠ করেছিলেন 'অকেজো দূরবীন' শীর্ষক উল্লিখিত কবিতাটি। তখনও কবিতাটি মুদ্রিতাকারে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ পায়নি।

এরকম প্রায়ই ঘটেছে। নানা অছিলায় ওঁর কাছে গতায়াত ছিল অবাধ। নানা কেজো-অকেজো কথার ফাঁকে, কিংবা উঠে আসার প্রাক্কালে ওর নিজের কণ্ঠে নতুন কবিতার পাঠ শোনার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। তখন 'আশ্বিনের ফেরিওয়ালা' (১৯৬৩) কবিতাগ্রন্থ বেরিয়ে গেছে। কবিতার হাটে, ওর প্রতিষ্ঠায় রুপোলি ঝলক। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'য় সংকলিত ওঁর কবিতার সেই স্নিগ্ধ অনুরণন আমার অনুভবের অন্তর্গত :

'কী ঝর্ঝর নামালো মনে— আর এক ছায়ায় নদীর ঘাট,
আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, বালির চরে পাখির হাট।
সবুজ শাড়ির ভঙ্গিমা সে কী আশ্চর্য অনুপ্রাস
অনেক যোজন বালির পরে পাহাড়ি জল, চিকন ঘাস।'

(নিকট বালি, দূর জল)

কথার মালা গাঁথা শুরু হলে থামা কি যায়। 'অকেজো দূরবীন' কবিতাটি নিয়ে শুরু করেছিলাম। সেদিন সেই কবিতাটি শুনে আমার মনে হয়েছিল, ভাষা যে বদলে গেছে, এমন মনে হয় না। তবে শান্ত কবির হৃদয়ে এখন অপ্রশান্তির ভিড়। সেটাই স্বাভাবিক। কবিতো স্বয়ং কবুল করেছেন, 'সময় বটে বদলে গেছে'।

অতঃপর সেই সময়ের ওঁর অনেক কবিতায় সময় বদলাবার পালা লক্ষ করেছেন পরিচিত পাঠকেরা। ওঁর মনের উত্তাপ সঞ্চার হয়েছে ইতস্তত।

'কেবলই উত্তাপ বাড়ছে—
জনশ্রুতি, বিভেদ যন্ত্রণা।
গণ্ডার দেখার জন্যে তাই
অভয়ারণ্যেই পরিক্রমা।'

সেদিন, কবি-চিত্তে নদী খোঁজা চলছে। তরঙ্গগতি প্রাণ চায় নিজেকেই। কিন্তু অরাজকতার ছবিটি যে হৃদয় ক্যানভাসে ফাঁকা থেকে যায়! সুতরাং কবি আঁচড় কাটেন। দৃষ্টি একটু বাঁকা।

মেটিয়াবুরুজে প্রায়ই পিটিয়ে খুনের দৃশ্য থেকে
বিদ্যেবুদ্ধি বৃথা পুঁজি ছুঁড়ে ফেলে
তাই সরে যাওয়া
জলদাপাড়াতে।'

(জলদাপাড়াতে)

১৯৮৮'র পর থেকে ওঁর সঙ্গে দেখা করার কর্তব্যে ঢিলেমি পড়েছে। মাসিক মাইনের বাইরে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা না করে মিছিমিছি পড়াশোনা, লেখালেখি, বই প্রকাশ করা, নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে জড়িয়ে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর লেজে-গোবরে হয়ে ওঠাই এই ঢিলেমির মূল কারণ। (উনি অপেক্ষা করতেন। হঠাৎ হঠাৎ ওঁর কাছে উপস্থিত হয়ে ওঁর অন্তরের এই অপেক্ষা অনুভব করেছি।)

নানা কথায় সময় কেটেছে, গীতার ভাষ্য রচনা করে চলেছেন, (ক্যাসেটে কিছু ধ'রে রেখেছেন), কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন সম্পাদকদের তাগিদে, এছাড়া গবেষণার তদারকির কাজ তো রয়েছেই ইত্যাদি ইত্যাদি। নানা কথার ভিড়ে ওঁর কবিতা লেখা যে অব্যাহত, সে কথা কিন্তু উঁকিঝুঁকি দিতে ভুল হয়নি। আমার অনুরোধে দু একটা কবিতা পাঠ করে শোনাতেন। কিন্তু আপন গরজে কবিতা পাঠ করে শোনানোর সেই আগেকার প্রসন্নতা আর খুঁজে পাইনি। হয়তো (ওঁর কবিতার পঙ্‌ক্তিতেই বলি), 'বিক্ষত সে। কেবল বোঝা। শুকতা আর রুক্ষতা।'

কখনও কখনও একটা বিষণ্ণতা ওঁকে গ্রাস করত। অভাব

অনটনে বিপর্যস্ত সংসারী মানুষের বিষণ্ণতা নয়, কবির কাব্যের সমাদর প্রাপ্তির বিশুষ্ক প্রান্তরের জন্যে। না, কোনও ক্ষোভ নয়, শুধু বিক্ষেপ: 'কিছু অর্থ প্রাপ্তি ঘটলে, জানো ...মনের মতো করে একটা কবিতার সংকলন বার করা যেত।' ওঁর এই কথাগুলো অনেকটা স্বগতোক্তির মতো। কিন্তু দীর্ঘশ্বাস আমার বেরিয়ে এসেছে। আসত। এই দীর্ঘশ্বাস এখনও পড়ে মাঝে মধ্যে।

বস্তুত এই শতকের ত্রিশ দশকের শেষ থেকে যিনি একটানা এই শতকের শেষ দশকের প্রারম্ভ কাল পর্যন্ত কবিতা রচনা করে চলেছেন, প্রখ্যাত-খ্যাত-অখ্যাত কাগজের পাঠককুলের কাছে যাঁর কবিতার সুস্মিত সমাদরের অভাব ঘটেনি, স্বাদশটির অধিক কবিতাগ্রন্থ যাঁর প্রকাশ পেয়েছে, তিনি রয়েছেন প্রকাশকের অপেক্ষায় হত-হৃদয়!

ওঁর বিষণ্ণতা কিন্তু সৃষ্টিকে মরুপথে নির্দেশিত করেনি। বরং কবিআত্মাকে সজাগ রেখেছেন কবিতার বহতা ধারাকে আরও সান্দিত করে তোলার জন্যে।

ঐ ঘর থেকে ও-ঘরে তাই চলেই পায়চারি।
বেদান্তের একের ধ্যানও কখনো মন চায়,
ইন্দ্রিয়ের আঘাতগুলো তাও কি ভোলা যায়—

যেমন আজ টাকার দামে উৎরাইয়ের ঢল
খুঁজে মেলে না বালিয়াড়িতে আশাকুসুম বীজ।

কবিতা নেই, কবিতা নেই মিছে পলাশচাষে।
না যদি ফোটে আশাকুসুম কেন বা তবে প্রাণ?'
(আশাকুসুমের জন্যে, ১৯৯২)

ওঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা পায়নি। তবে, আমাদের আক্ষেপ কিঞ্চিৎ প্রশমন করার প্রয়াস করেছেন ওঁর প্রাক্তন ছাত্র, ড: সনৎকুমার মিত্র একটি কবিতাসংকলন প্রকাশ করে। পুস্তিকা নিতান্তই। তবুও 'আমার কথায়' কবি (উক্ত পুস্তিকার) লিখেছেন, 'তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।'

কবিতা-পুস্তিকাটি প্রকাশ পেয়েছে ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৯২। আমি ওঁর কাছে গিয়ে পৌঁছেছিলাম, ১ জানুয়ারি, ১৯৯৩। ওঁর জন্মদিন। প্রণাম জানাতে।

হাতে তুলে দিলেন সহাস্যে। উক্ত পুস্তিকাটির প্রচ্ছদের ওপর নামকরণ চোখে পড়তেই বললুম, 'স্যার, আবার 'সাঁকো থেকে দেখা'র তাগিদ?' হাসির ঝলক খেলে গেল। বললেন, 'কবিতাটি মনে পড়ে?' বললুম, 'আপনার কবিতা পুস্তক, যে কটি আমার সংগ্রহে আছে সবই রেখেছি সযত্নে। ওই কবিতা পুস্তিকাটি আরো সযত্নে।'

কবি হরপ্রসাদ মিত্রের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ সঞ্চার, (অনুভূত হয়) 'সাঁকো থেকে দেখা' গ্রন্থের কবিতায়। 'সাঁকো থেকে দেখা' কবিতাবইটি প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৬৮-তে। অতঃপর বেরিয়েছে 'ঝাউয়ের শব্দ' (১৯৭৩), 'হৃদয় চকিত কে সে' (১৯৭৪), 'ইদানিং আমি' (১৯৮০)। এই বছরগুলোর মধ্যে তিনি এসেছেন সস্ত্রীক আমাদের বাড়িতে। আমরা দুজনে মেয়েকে-ছেলেকে নিয়ে ওঁর সামনে বসেছি, ওঁদের বাড়িতে। কী যে খুশির আকাশ! কবিতার পর কবিতা পাঠ করে গেছেন তিনি। আবার থামার ফাঁকে ফাঁকে অনুরোধক্রমে ব্যাখ্যাও করেছেন কিছু কিছু কবিতা, অকুণ্ঠিত হৃদয়ে। সেদিন এক ভিন্ন প্রহর! গ্রীষ্মের প্রখর দাহনেও 'মাধবী বনের মধুগন্ধে মোদিত মোহিত মত্ত বেলা।' সে সব কবিতার বৈঠকে দেখা যেত তিনি বেছে নিতেন 'সাঁকো থেকে দেখা'র কবিতাগুলো বিশেষ করে। খসড়া খাতা থেকে নতুন কবিতার পাঠ তো ছিলই।

ওঁকে জিজ্ঞেস করিনি এমন নয়। কোন্‌টি ওঁর শ্রেষ্ঠতম কবিতাগ্রন্থ? স্পষ্ট উত্তর পাইনি। শুধু স্মিতহাস্যে মৃদু গুঞ্জন। অনেকটা এরকম, শ্রেষ্ঠত্বের বিচার রইল সহৃদয়-তোমাদের হাতে।

১৯৯২-এর সংকলিত পুস্তিকাটির নামকরণ করা হয়েছিল 'সাঁকো থেকে দেখা'র অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় সংখ্যক 'প্রেমকে মৃত্যুকে চিনে' কবিতাটির নামে। সংকলিত পুস্তিকাটি হাতে তুলে দিয়ে আমার কথার শেষে তিনি পাঠ করে শোনালেন, সেই কবিতাটি:

'প্রেমকে, মৃত্যুকে চিনে
কে ফিরবে দিনে দিনে
আলোতে আলোতে?'

সাঁকোতে সূর্যাস্ত হবে। নদী বন গ্রাম সব ঢাকা পড়বে অন্ধকারে। তখন, যেতে যেতে
'তারার আলোতে
হঠাৎ হবেই হবে এ জন্মের অন্ধকার দেখা।'

এর আগে বহুদিন বহু কবিতা (প্রকাশিত, অপ্রকাশিত) ওঁর কণ্ঠে শুনেছি। কিন্তু সেদিন কী যে সুর মেশানো ছিল ওঁর কণ্ঠে। এখনও সেই সুর বেজে ওঠে। সমস্ত মনটাকে মুচড়ে দেয়।

আমার 'উনিশ শতকের শেষার্ধবর্তী বাংলা গদ্যের রূপরীতি' গবেষণা গ্রন্থের 'নিবেদনে' কবি অমিয় চক্রবর্তী ও কবি হরপ্রসাদ মিত্রের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন প্রসঙ্গে লিখেছিলাম, 'রবীন্দ্র ভাবনার সন্নিহিত এবং রবীন্দ্র প্রশংসাধন্য এমন দুই কবির দুর্লভ সান্নিধ্য জীবনের পরম সম্পদ।' 'রবীন্দ্র প্রশংসাধন্য' বাক্যাংশ ব্যবহার করেছিলাম হরপ্রসাদ সম্পর্কে। এখন মনে হয়, 'রবীন্দ্র ভাবনার সন্নিহিত কবি' বাক্যাংশটি কবি অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে হরপ্রসাদ সম্পর্কেও তো ব্যবহার করা যেত। 'প্রেমকে মৃত্যুকে চিনে' কবিতায় তো তারই স্বাক্ষর রয়েছে,



'নয় লাভ, নয় ক্ষতি,
নয় জয় পরাজয়।
শুধু এক কেন্দ্র থেকে
অসীম পরিধি খুঁজে ফেরা।'

কবি হরপ্রসাদের কবিতা নিয়ে বিশেষ কোনও আলোচনা আমার চোখে পড়েনি। কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসু তাঁর 'আধুনিক কবিতা' শীর্ষক ছাত্রপাঠ্য বইয়েতে কবি হরপ্রসাদের মূল্যায়ন করেছেন। লিখেছেন, 'হরপ্রসাদ রোমান্টিক পদ্ধতির কবি।' উল্লেখ করেছেন, হরপ্রসাদের রোমান্টিক রূপমুগ্ধতার কথা। শুদ্ধসত্ত্ব বসু শুধু সমালোচক নন, একালের সমাদরণীয় কবিও বটেন। তাঁর কথাতো উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই রোমান্টিক শব্দটি আমার কাছে কেমন গোলমেলে ঠেকে। কবি মাত্রেই তো রোমান্টিক! এই রোমান্টিকতায় নানারূপ: বিষাদের, আনন্দের, গ্লানির, স্বপ্নবিভোরতার, আদর্শবাদের, বাস্তবতার স্বীকার্যে, বাস্তবতার বিরোধিতার। সকল কবিকে এই রোমান্টিকতার ছকে ফেলে মূল্যায়ন করায় আমাদের রসাস্বাদন কেমন যেন বিস্বস্ত হয়ে পড়ে।

হরপ্রসাদের রোমান্টিকতা বুঝে নিতে 'অন্তর্ধ্বনি' কবিতাটি একটু দেখে নেওয়া যেতে পারে। শুরুতেই প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি

'তিরিশ হাজার ভিখিরি এখানে—
শুনেছো?'

অতঃপর হালকা ডানা মেলে কবির পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি সাজানো চলেছে নীল আকাশ, শরতের স্থল পদ্ম, সুখী প্রজাপতিদের নিয়ে। কিন্তু সমাপ্তিতে যখন তিনি থামেন তখন দেখি তিনি ডুব দিয়েছেন তাঁর কবিসত্তার অবিচ্ছেদ্য রহস্যময় উপলব্ধিতে।

'প্রজাপতি, চাঁপা, ভিখিরি, আকাশ নীল।
যে মিলে এসব মেলাই
সেটাই প্রচণ্ড গরমিল।
বুদ্ধি বড়োই স্বার্থান্বেষী
এবং বুদ্ধি ক্লীব।'

ওঁর কবিতা থেকে এরকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া চলে। এ কোন্ রোমান্টিক রূপমুগ্ধতা? আসলে, কোন দুর্নিবার প্রেরণায়, কবির কোন্ ভাব কখন যে শতদলের মতো পাপড়ি উন্মিলীত করে, তাকে খুঁজতে গেলে রবীন্দ্রনাথের সেই 'আমি'র প্রসঙ্গ এসে যায়। এই 'আমি'র নিয়ন্ত্রণেই ফুটে ওঠে রূপ, জেগে ওঠে রস।

অনুশাসনের বাধা মেনে নিয়েও মনে হয়, কবিকে জেনে নিলে হয়তো কিঞ্চিৎ কবিতার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়ে ওঠে। হরপ্রসাদকে দেখেছি খুব কাছে থেকে। সুখে-দুঃখে ওঁর অনেক কবিতার হয়ে-ওঠার আনন্দ অনুভব করার সুযোগও ঘটেছে। ওঁর দূরযাত্রী মন কোন বন্ধনই মেনে নেয়নি কোনদিন। বারবার ভাঙতে চেয়েছেন নিজের গণ্ডি। আপন শিল্পাদর্শের প্রবুদ্ধ শাসনেই তিনি কবিতা রচনা করেছেন আজীবন।

কবিতার বহিঃরূপে তিমির দৃষ্টির একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত রয়েছে 'উকুন' কবিতায়। ব্যঙ্গচাতুর্যের লক্ষণও প্রধান।

'আপনি বলেন—
রামকৃষ্ণের ছবির সামনে ঘণ্টা দুয়েক
প্রতি সন্ধ্যায় নাই যদি হয়, প্রতি শনিবার
বসুন, বসুন।
আমি তা বসছি অধুনা —এবং বাতের জন্য
সকালে খাচ্ছি রসুন। রসুন।
(উকুন— ঝাউয়ের শব্দ, ১৯৭৩)

এই কবিতাটির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়, স্রষ্টাকে কোনও ভূষণে আখ্যা দেওয়ার নানাবিধ আয়োজন বৃথা।

হরপ্রসাদের ভাষাতেই বলি,

'সৃষ্টির মানে খুঁজে কাজ নেই,
ধৈর্য ধরুন।'

হরপ্রসাদ নিজেই লিখেছেন, 'কবিতা আমাদের বস্তু পরিবেশের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক নয়।' কিন্তু কবিতা তো সংবাদ জ্ঞাপনের নয়, বিশ্বাস করানোর কাজেও কবিতার ব্যবহার নিরর্থক। কিংবা আপন দুর্গে অবস্থান করে স্বীয় বৈভবের উদ্গমে পাঠককুল এড়িয়ে মত্ত থাকাটাও কবির সাজে না। কবিতা সর্বকালের দেশ-দেশান্তরের আনন্দসামগ্রী। হরপ্রসাদের কবিতায় কবিতাকে আনন্দের সামগ্রী করে তোলার আয়োজন তাঁর যাত্রা পথ থেকেই দেখা গেছে।

১৯৪৪-এ 'ভ্রমণ' কবিতাগ্রন্থের একটি কবিতা উদাহরণ-স্বরূপ দেখে নেওয়া যেতে পারে। কবিতাটির নাম 'পলাতক'। সমস্ত কবিতাটির উৎস যুদ্ধ-মহামারী-স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। কিন্তু বস্তু যখন কবি-হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শেষপর্যন্ত কবিতায় রূপ নেয় তখন কী বোঝার উপায় আছে, কী গভীর যন্ত্রণায় শুক্তির গর্ভে মুক্তোর মুক্তি। 'পলাতক' কবিতাটির পাঁচটি স্তবকের পর কবি ষষ্ঠ স্তবকে এসে অকস্মাৎ বলে ওঠেন—

'কোন দূর বন / খুঁজছি এখন, / প্রার্থিত নয় নির্বাণ। / কোনো নির্মল / প্রস্রবণের / প্রবাহ নবীন / দিক প্রাণ। / শ্যামলিমা থাক্ অঞ্জন চোখে, / নীল প্রশান্তি শিয়রে/ নীল প্রশান্তি,.../ নীল বিস্তার শিয়রে'

কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত, যা মনের বুকে ঝড় তোলে, তা যখন থেমে যায় তখন? কবিকে আবার ফিরে আসতে হয় রূঢ় বাস্তবে। নিরানন্দ ভূমিতে দাঁড়িয়ে কবির বুকে জিজ্ঞাসাচিহ্ন বড় হয়ে দাঁড়ায়—

'স্মৃতি নিষ্প্রভ,
দেখি বুভুক্ষু আকাশে হিংস্রদীপ্তি।

চুপি চুপি বলি পরস্পরকে
এখন কে দেবে তৃপ্তি?'

কবি হরপ্রসাদ, রূঢ় নিরানন্দ প্রাত্যহিক বৈচিত্র্যহীন অভিজ্ঞতাকে এড়িয়ে যাননি। কিন্তু তিনি লক্ষ্য স্থির রেখেছেন, কবিতার মধ্য দিয়ে বিশেষ চিত্তাবস্থার সাক্ষাৎ সঞ্চারে যেন ব্যাঘাত না ঘটে। দুঃখ-সুখ-বেদনা হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে যা উদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে: কবিতায় যেন তা উচ্চাঙ্গের রসস্বরূপ প্রকাশ পায়। আর সেইখানেই তো সার্থকতা। কবি ভাষার মধ্যে ভাবের তরঙ্গ সঞ্চার করে পাঠকের মনে গভীর স্বাদ জাগাতে পারেন। কোনও বিশেষ বোধের ব্যাকুল দৃঢ় বিশদ বিস্তারিত প্রকাশের অভিপ্রায়ে কবির কাব্যে অনেক অতিরিক্ত কিছুর ব্যবহার হয়ে থাকে। এই অভিপ্রায়টি প্রধানভাবে লক্ষণীয় বটে। কিন্তু এই অভিপ্রায় যেন রসসৃষ্টির ব্যঞ্জনা ও ধ্বনিমাধুর্যকে ব্যাহত না করে। কবি হরপ্রসাদ, এরকম ভাবনার সুস্থিতি কখনও হারিয়ে ফেলেননি। 'ইদানিং আমি' কবিতাপুস্তকটি প্রকাশ পেয়েছে ১৯৮০-তে। 'ইদানিং আমি' কবিতাটিকে নিয়েই কবিতাপুস্তকের নামকরণ। এই নামাঙ্কিত কবিতাটিতে এমন কটি পঙ্‌ক্তি রয়েছে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্তবকে, যা, ১৯৭৭-এর বিষয় এবং কবির বাস্তব অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যখন কবি এই অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত বিষয়টি কবিতায় স্থান দিয়েছেন তখন দেখা যায় যে, কবিহৃদয়ের ধ্যানমগ্নতা বিশেষ চিত্তাবস্থার সাক্ষাৎ সঞ্চারের দিকেই ঝুঁকে পড়েছে। ফলে বিশেষ অভিজ্ঞতাটি হয়ে ওঠে একটি নিটোল কবিতা:

'ইদানিং আমার সূর্যের রঙ গোলাপী হয়ে আসছে। গাছেদের
ছায়ারা পূর্বদিকে লম্বা হচ্ছে ক্রমশ। ......
সমস্তই পাখি এখন। ছোটো ছোটো ভবঘুরের দল আমার
ইচ্ছেরা
ফাল্গুনের কোনো আবীরের হল্লা নেই,— অথচ বাসন্তীতে,
গেরুয়াতে, ফিকে কিংবা প্রগাঢ় সবুজে কোনো একটা নিষ্কলুষ
অশেষের দিকেই শুড়শুড়ি দিচ্ছে হাওয়া।'

কবি চৈতন্যে বিষয়, উপাদান, উপকরণ যে কীভাবে আশ্রয় নেয়। শব্দে ছন্দে সে সবের যে শোভিত নিকুঞ্জ, সে তো কবির একান্ত ব্যক্তিগত। যে উপাদান তিনি গ্রহণ করেছেন তা আমার চেনা, কিন্তু উপাদানকে অতিক্রম করে যখন তিনি বলেন 'সমস্তই পাখি এখন' তখন তো তিনি আমার' চেনা পরিমণ্ডলের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

কবি হরপ্রসাদের মনে চিত্রময়তার আকর্ষণ বেশি, শব্দের সঙ্গে শব্দের এক অপরূপ সমাবেশ ঘটাতে তিনি সিদ্ধহস্ত, তাঁর কাব্য পঙক্তিতে কী পদ্যে, কী গদ্যে, ছন্দের অনাহত তরঙ্গলীলা। অন্ত্যানুপ্রাসে তাঁর কাব্যে রয়েছে শ্রুতিসুখ। আঙ্গিক-কলাবৈচিত্র্য নিয়ে কবিকে ভাবতেই হয়। হরপ্রসাদকেও নৈপুণ্যে পৌঁছুতে ভাবতে হয়েছে বৈকি। তবে প্রথমাবধি ওঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল আবেগের সহজ স্ফূর্তি এবং সহজাত লাবণ্যের পরিপূর্ণতা। গদ্যপদ্যের মসৃণ বেগ-মাধুর্য, স্মিত হাসির উজ্জ্বলতায় ব্যঙ্গচাতুর্য— সকলই তাঁর কবিজনোচিত সংগতিবোধের ফসল।

১৯৪০ থেকে ১৯৯৩, দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর অধিক কবিতা রচনার এই কালে এসেছেন অনেক কবি, প্রসিদ্ধ এবং মাঝারি। এঁদের মধ্যে হরপ্রসাদের স্থান কোথায়? এরকম প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যাওয়ার প্রয়াস কৈশোরিক। উল্টো পথে ভাবা চলে, হরপ্রসাদের কবিতায় সাধারর পাঠকের তৃপ্তির প্রাপ্তি কতখানি।

হরপ্রসাদের কবিতা রচনার দীর্ঘ পথে কত কবি, কত বিচিত্র স্বভাব, কত পালাবদল। কিন্তু কবি হরপ্রসাদ, তাঁর আপন সৃষ্টির আনন্দসীমাতেই আবদ্ধ থেকেছেন। কোন এক সময়ে আমার কোনও একটি লেখায়, এক কবির (আমার ভাললাগা প্রখ্যাত) সঙ্গে ওঁর কিছু মিল আমি দেখাতে সচেষ্ট হয়েছিলাম। উনি স্মিত হাস্যে শুধু বলেছিলেন, 'এরকম কোনো না কোনো ভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো কবি পরস্পর তুলনীয় হয়ে ওঠে বৈকি, কিন্তু সেটা বড় নয়। দেখতে হয়— সাধ সাধ্য ও ধ্যানের দিক থেকে তাদের পার্থক্যটি।' কেননা 'প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক ধারণাধর।'

স্রষ্টার শক্তি দেখা দেয় কল্পনার প্রসারে, রচনার নৈপুণ্যে। আবার, কবিতাপাঠকের সামর্থ্যও তো বিচার্য। রসবোধের গভীর সম্প্রীতির অভাব যদি পাঠকের থেকে যায়, তবে সেই পাঠক কবিতার হাটে পরিচিত কয়েকজনের নামই শুধু আঙ্গুলে গুণে রাখবে। হৃদয়ের রসাস্বাদনের ভাণ্ডার ফাঁকা রেখে ঢাকের বাদ্যিতেই নাচানাচিতে কসরৎ দেখাবে।

আমাদের দেশে ক'জন কবিতা পড়েন? আর যাঁরা পড়েন, তাঁদের মধ্যে আঙ্গুলে গোনার বাইরে ক'জন বাড়তি কবিকে স্থান দেন? ক'জন ধ্যানমগ্ন হয়ে কবি চিত্তকে স্পর্শ করতে চান? ক'জন 'সহৃদয়হৃদয়সংবাদী'?

হরপ্রসাদের কাব্যোদ্যান নির্জনপ্রায়। এই নির্জন প্রান্তে দাঁড়িয়ে কবির ভাষাতেই সান্ত্বনা খুঁজি এখন

'বাড়িবদল ঘট্‌লো আমার সারাজীবন।
আজ যেখানে বইটা রাখি,
কাল নজরে দুর্লভ।
আজকের ধ্যান আজই বাতিল,
কালকের প্ল্যান নেই।
চিরকালের জন্যে কোনো হাপিত্যেশই নেই।' □



## বলাইকৃষ্ণ রায়

জন্ম ৮ অক্টোবর ১৯১৭
মৃত্যু ৩০ জুন ১৯৯৬

বলাইবাবু বলতেন, 'কোনরকম প্রতিদানের আশা না রেখেই জনগণকে ভালবাস। প্রতিদান আসবে তার স্বাভাবিক নিয়মেই।'' এটা শুধু তাঁর কথায় কথা ছিল না। তিনি এই বাণীর রূপায়ন ঘটিয়েছিলেন তাঁর নিজের জীবনে। তাই বিশেষ করে আরামবাগে এবং অন্যান্য জায়গায় তাঁর কর্মক্ষেত্রে এবং পরিচিত মহলে তিনি পেয়েছিলেন মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা। তাই তাঁর প্রয়াণে বেদনাহত মানুষের সংখ্যার কোন হিসেবনিকেশ নেই। অশ্রুভারাক্রান্ত অনেকের হৃদয়েই যে বোধ সবচেয়ে প্রবল, তা হল— তাঁরা আজ অভিভাবকহীন, মাথার উপর থেকে সরে গেছে বিশাল বটবৃক্ষ।

বাস্তবিক, বলাইকৃষ্ণ রায় সত্যিই ছিলেন বটবৃক্ষসদৃশ। বহু প্রতিষ্ঠানের অভিভাবকই শুধু নয়, তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাণপুরুষ। আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড, আরামবাগ সলভেন্ট এক্সট্রাকসান (প্রা:) লিমিটেড, বীরভূম কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্টিলাইজার্স লিমিটেড, এভারগুড রাবার লিমিটেড ইত্যাদি শিল্পপ্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তুলেছিলেন নিজের হাতে। যেসব প্রতিষ্ঠান আজ বাঙালির গর্ব। অন্তত দু হাজার মানুষের রুটিরুজির সংস্থান হয়েছে এইসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।

কিন্তু সফল শিল্পপতি হয়ে ওঠাই বলাইকৃষ্ণ রায়ের বর্ণাঢ্য জীবনের একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি ছিলেন কৃতী ছাত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই এস সি পাশ করেছিলেন প্রথম বিভাগে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওকালতি পাশ করেন ১৯৪০-এ। পিতা বিনোবিহারী রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরামবাগ আদালতে ওকালতি করার সময়েই তিনি ঝাপিয়ে পড়েন ১৯৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলনে। তারও আগে থেকে তিনি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন শ্রীসংঘের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৪৬-এ প্রফুল্ল সেন মহাশয় জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তাঁর কর্মযজ্ঞে সাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন বলাইবাবু। তারপরই আরামবাগ জুড়ে শুরু হয় গান্ধীবাদী আন্দোলন। গড়ে ওঠে স্থানীয় গান্ধীবাদী প্রতিষ্ঠানগুলি। প্রফুল্ল সেনের পাশাপাশি যেসব প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলিরই মূল সংগঠক ছিলেন বলাইকৃষ্ণ রায়। মেয়েদের জন্য স্কুল এবং কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর ছিল প্রবল উৎসাহ। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম নেতৃস্থানীয় দুটি বিদ্যায়তন আরামবাগ বয়েজ স্কুল এবং আরামবাগ গার্লস স্কুলের তিনি ছিলেন যথাক্রমে সম্পাদক এবং প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। তাছাড়া কামারপুকুরের রামকৃষ্ণ মিশন এবং জয়রামবাটির মাতৃ-মন্দিরের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হিসাবেও তাঁর ভূমিকা ছিল সক্রিয় সমাজসেবীর।

বস্তুত, প্রফুল্ল সেনের দেওয়া 'দলহীন গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সক্রিয় রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে, তিনি আরও প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন সমাজসেবার কাজেই। ১৯৯০-এ প্রফুল্ল সেনের মৃত্যুর পর এধরনের সাংগঠনিক কাজে নেতৃত্বের শূন্যতা অনেকখানি দূর হয়েছিল বলাইবাবুর অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতায়। তাঁর উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল বহু সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। মাখনলাল রায় চ্যারিটেবল ট্রাস্ট সেগুলির মধ্যে ছিল অন্যতম অগ্রণী প্রতিষ্ঠান।

মানুষ হিসাবে বলাইকৃষ্ণ রায়কে এককথায় বলা যায় মহৎপ্রাণ। কারও ভাল করতে না পারলেও কাউকেই কোন কারণেই দুঃখ দেওয়া ছিল তাঁর নীতিবিরুদ্ধ। দৈহিক মৃত্যু ঘটলেও তাঁর আদর্শ জীবন তাঁর সুযোগ্য বংশধরদের মধ্যে এবং অনুরাগীদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে বহুকাল। □

**আবদুর রউফ**